একাত্তরের ঘাতক
জামাতে ইসলামীর
অতীত ও বর্তমান

একাত্তরের ঘাতক জামাতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমান

সম্পাদনা
শাহরিয়ার কবির

মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯৫/ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯
মুদ্রণ সংখ্যা—৩০০০

স্বত্ব
মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র

প্রচ্ছদ
রফিকুন নবীর স্কেচ অবলম্বনে
সৈয়দ লুৎফুল হক

প্রকাশক
মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র
১২৪/৩ শান্তিনগর (৫ তলা)
ঢাকা—১০০০

পরিবেশক
ডানা পাবলিশার্স
৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

মুদ্রক
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা—১২১২

মূল্য
সুলভ ৪০ টাকা
শোভন ১০০ টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
৪

বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরুত্থান
ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
৯

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা ও মওদুদীর চিন্তা
মওলানা আবদুল আউয়াল
২০

জামাতে ইসলামীর ৪৬ বছর
শাহ আহমেদ রেজা
৪২

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা
শাহ আহমেদ রেজা
৬৮

গোলাম আযম ও জামাতের রাজনীতি
বিচিত্রা প্রতিবেদন
৮৮

জামাতে ইসলামী ও গোলাম আযমের পুনরুত্থান
শাহরিয়ার কবির
১০৮

জামাতে ইসলামীর সাম্প্রতিক তৎপরতা (১)
মোবাশ্বের মোনেম/সেলিম ওমরাও খান
১২৬

জামাতে ইসলামীর সাম্প্রতিক তৎপরতা (২)
সেলিম ওমরাও খান
১৪৩

জামাতের প্রধান অঙ্গদল ইসলামী ছাত্র শিবিরের স্বরূপ
সেলিম ওমরাও খান/নিমাই সরকার/সৈয়দ শামীম
১৫৭

জামাতে ইসলামীর ধর্মব্যবসা ঃ আলেমদের অভিমত
মওলানা আবদুল আউয়াল/আসিফ নজরুল
১৭১

আক্রমণাত্মক ভূমিকায় জামাত-শিবির ঃ সামনে বিভীষিকা
শাহরিয়ার কবির/আসিফ নজরুল
১৮৮

পরিশিষ্ট (ক)
২১১

পরিশিষ্ট (খ)
২২৭

সম্পাদকীয়

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা কি ছিলো এ বিষয়ে আজকের তরুণ সমাজ —মুক্তিযুদ্ধের কথা যাদের মনে নেই, কিম্বা যারা জন্মেছে একাত্তরের পরে, তারা খুব কমই জানে। সেই সময়ের কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরাও জামাতে ইসলামীকে অন্য সব স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের একটি হিসেবে বিবেচনা করেন। অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, জামাতে ইসলামীর সঙ্গে মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলের তৎকালীন কর্মকাণ্ডের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কিম্বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ছিলো বৈরিতাপূর্ণ। আর পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে এই দলটি পাকিস্তান আন্দোলনেরও বিরোধী ছিলো।

বৃটিশ ভারতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রসম্পন্ন একাধিক ধারা ছিলো। একটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করতেন সেইসব ব্যক্তি যাঁরা সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন এই আন্দোলন সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটাবে না বরং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে মেহনতি মানুষের আন্দোলনকে বিভক্ত ও বিপথগামী করবে। দ্বিতীয় ধারার অনুসারী ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলমান সম্প্রদায়, যাদের অধিকাংশই যুক্ত ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে। এঁরা মনে করতেন উপমহাদেশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হলে ভারতের অন্যত্র মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ব্যহত হবে। এ দুটি ধারার অনুসারীদের ভেতর আদর্শগত বৈপরীত্ব থাকলেও একটি সাধারণ যোগসূত্র ছিলো। এই দুই ধারার অনুসারীরা উপমহাদেশের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল থেকে দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান আন্দোলনের হোতা মুসলিম লীগের সঙ্গেও তাদের মিল ছিলো। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে জামাতে ইসলামী, যে দলটি ইসলামের দোহাই দিয়ে রাজনীতি করলেও পাকিস্তান আন্দোলনের যেমন ঘোরতর বিরোধী ছিলো, তেমনি বিরোধী ছিলো উপমহাদেশে বৃটিশ-শাসন অবসানের।

১৯৪৭-এর পর নবগঠিত পাকিস্তানে জাতিসমূহের স্বকীয় বিকাশের অধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেরও প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো জামাতে ইসলামী। কখনও বিরোধিতা করেছে আন্দোলনের মূল স্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে, কখনও করেছে আন্দোলনের ভেতরে থেকে। ইউরোপের ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদকে সমর্থন দিয়ে এবং সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জামাত ধর্মকে ব্যবহার করেছে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

জন্মলাভের পর থেকে জামাত এদেশে যে কাজটি করার জন্য নিজেদের তৈরি করেছে, অস্ত্রে শান দিয়েছে, সেই সুযোগ তারা পেয়েছিলো ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পর, যখন বর্বর পাকিস্তানী সামরিক জান্তা মানব-ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞটি এদেশে পরিচালিত করে —জামাতে ইসলামী ছিলো তাদের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে জামাতের বিরুদ্ধ-ভূমিকার প্রস্তুতি ছিলো দীর্ঘদিনের। প্রথমে শান্তি কমিটি, তারপর রাজাকার বাহিনী এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে আলবদর, আলশামস বাহিনী গঠন করে তারা বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করার যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলো তার সঙ্গে হিটলার বা মুসোলিনীর আদর্শিক সাযুজ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ফ্যাসিস্ট আর নাৎসীদের দ্বারা সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন গণহত্যার সঙ্গে একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে জামাতীদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা, নারী নির্যাতন, বুদ্ধিজীবী হত্যার কোন পার্থক্য নেই।

২

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী বা গবেষক মনে করেন জামাতে ইসলামী নিছক ধর্মীয় মৌলবাদীদের একটি সংগঠন। এই উপমহাদেশে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও দল যখন থেকে সংগঠিত হওয়া আরম্ভ করে তখন থেকেই সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের এদেশীয় দালালদের সহযোগিতায় কিম্বা কোথাও সক্রিয় উদ্যোগে ধর্মীয় মৌলবাদীদের বহু সংগঠনের জন্ম হয়েছিলো। 'শুদ্ধি আন্দোলন,' 'হিন্দু মহাসভা,' 'তবলীগ,' 'তনজীম,' 'আর্য সমাজী,' 'খিলাফত কমিটি,' 'জমিয়তে উলামা' প্রভৃতি মৌলবাদী সংগঠনের দ্বারা উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার শেকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো। তবে এ কথাও সত্য যে পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ এই সমস্ত দলের তৎপরতাকে বহু ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ বা পর্যুদস্ত করেছে এবং অধিকাংশ দলই এখন মৃত অথবা মৃতপ্রায়। '৪৭-এর পর থেকে বাংলাদেশের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলন একই সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে স্বৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। যে কারণে ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনের বিকাশ এদেশে সেভাবে হতে পারে নি। 'হিন্দু মহাসভা' বা 'জমিয়তে উলামা' যে অর্থে মৌলবাদী, জামাতে ইসলামীকে সে অর্থে মৌলবাদী বলা যাবে না। তার কারণ জামাতের চার যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একমাত্র '৫৩ সালের তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে 'কাদিয়ানী দাঙ্গা' ছাড়া অন্য কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানোর অপবাদ এ দলটিকে দেয়া যাবে না। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা রাজনীতি করে বটে, কিন্তু ধর্মের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী জামাতের জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। এ কারণে জামাতকে মৌলবাদী দল না বলে ফ্যাসিবাদী দল বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। ফ্যাসিবাদের আদর্শিক/সাংবিধানিক/ব্যবহারিক ভিত্তি এবং জামাতের আদর্শিক/সাংগঠনিক/ব্যবহারিক ভিত্তির সাযুজ্য তার বড় প্রমাণ। আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের প্রয়োজনেই জামাতের সঠিক চরিত্র নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে একাত্তরের পরাজিত শত্রু জামাতে ইসলামীর পুনরুত্থান তাদের সাংগঠনিক বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের উপর উপর্যুপরি আক্রমণের কারণ ও উদ্দেশ্য বিচারের প্রয়োজন আমাদের এই প্রয়াস। গত কয়েক বছরে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে জামাতী ইসলামীর মতো ফ্যাসিস্ট দলকে উপেক্ষা করে কিম্বা কখনও মিত্র বানিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যে ভুল করেছে তার মাশুল তাদের এখন সুদে আসলে দিতে হচ্ছে। যদিও এ কথা আমরা বহুবার বলেছি, কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনই সফল হতে পারে না যদি না তার সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ বিরোধী কর্মসূচী থাকে এবং সেই কর্মসূচী সম্পূর্ণ হতে পারে না যদি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতার প্রসঙ্গটি উপেক্ষিত হয়। জামাত সম্পর্কে বিরোধী দলগুলোর অজ্ঞতার কারণেই সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আন্দোলনে এক বিড়ম্বনা ও বিভ্রান্তিজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ/প্রতিবেদনগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের দ্বারা লিখিত। একটি ছাড়া সব কটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত। জামাতের অতীত ইতিহাস, রাজনীতর স্বরূপ, সাম্প্রতিক পুনরুত্থান, সাংগঠনিক তৎপরতা, আন্তর্জাতিক যোগসূত্র, নৃশংসতার খতিয়ান—এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক যতটুকু নেয়া হয়েছে তার দ্বারা এই দলটির চরিত্র ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করা কঠিন হবে না। কিছু প্রবন্ধে/প্রতিবেদনে তথ্যের পুনরাবৃত্তি রয়ে গেছে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপর আলোক প্রক্ষেপণকালে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হলে একাধিক প্রবন্ধ/প্রতিবেদনের যুক্তিগ্রাহ্যতা দুর্বল হয়ে পড়তো। তাই সম্পাদকের বিবেচনায় এই পুনরাবৃত্তি অসঙ্গত নয়। প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও সংক্ষেপণ প্রায় সব কটি রচনার ক্ষেত্রেই করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে লেখকদের পছন্দকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কিছু তারতম্য ঘটেছে, তবে শুদ্ধতার ব্যত্যয় ঘটে নি।

লেখা প্রকাশের অনুমতি প্রদানের জন্য আমরা লেখকদের কাছে কৃতজ্ঞ। অধিকাংশ লেখা প্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক বিচিত্রায়। এই পত্রিকা অত্যন্ত বৈরী সময়ে জামাতে ইসলামীর তৎপরতা সম্পর্কে এককভাবে দেশবাসীকে সর্তক করার দায়িত্ব নিয়েছিলো। এখন অবশ্য বহু পত্রিকাই এই ফ্যাসিস্ট দলটি সম্পর্কে লিখছে। এরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আগেই বলা হয়েছে জামাতে ইসলামী সম্পর্কে এটি কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়। বর্তমান সংস্করণের অসম্পূর্ণতা পরবর্তী সংস্করণে পূরণ করা হবে।

১

বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরুত্থান

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলো এবং অবধারিত পরাজয় বরণ করেছিলো। সঙ্গত কারণেই তখন মনে হয়েছিলো ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের উপযোগিতা এদেশ থেকে তিরোহিত হয়েছে। '৭২-এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র প্রভৃতির সংযোজন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিলো। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অচিরেই স্বাধীনতাযুদ্ধের পরাজিত শক্তিদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান তাদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়ার অধিকার প্রদান এবং ক্ষমতার অংশীদার করেন।এই প্রক্রিয়ায় জামাতে ইসলামীর ঘাতকদের পুনরুত্থান ঘটে প্রথমে গোপনে ছদ্মপরিচয়ে, পরে প্রকাশ্যে দল গঠনের ঘোষণা দিয়ে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর এই প্রবন্ধে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরুত্থানের পটভূমি ও কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন অশান্ত। মায়ামৃগ গণতন্ত্র (না ক্ষমতা?) রাজনৈতিক দল-উপদলের নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক নেতা/কর্মীদের নিদ্রাহরণকারী। স্বাধীনতার পর এক যুগ পেরিয়ে গেলেও গণতন্ত্র আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যেন বাংলাদেশ থেকে পলাতক। কেন এমন হলো? এমনটি হবার কথা তো ছিল না। একাত্তরের সংগ্রামী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শোষণ-বঞ্চনার আঁধার পেরিয়ে মুক্তির সোনালী দিনের আশায় বুক বেঁধেছিল। কিন্তু সোনালী দিন এলো না; এলো না শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি।

বলা প্রয়োজন, এমনি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা পরবর্তী অভিজ্ঞতাও প্রায় এমনি। ঔপনিবেশিক আমলের ঐতিহ্য হিসেবে বিরাজমান ধন-বৈষম্য আরও ব্যাপক হয় স্বাধীন দেশের ক্ষমতাসীন সরকারের অনুসৃত ভ্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে। ফলে অশান্ত-বিক্ষুব্ধ সমাজের রাজনীতিতে সমাজকে আলোড়িত করে, প্রভাবিত করে

এমনি বহু ব্যাপক প্রশ্নে—ঐকমত প্রতিষ্ঠা হয়ে ওঠে সুদূরপরাহত। সেই কারণে গড়ে ওঠে বহু-বিভিন্ন রাজনৈতিক মত ও দল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বোধহয় শতের ঘরে পৌঁছেছে এবং একই কারণে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিতে রাজনৈতিক সমস্যা-সংঘাত বা ক্ষমতার লড়াইয়ের মীমাংসা হয় সহিংস পদ্ধতিতে; গণতান্ত্রিক উপায়ে নয়। রাজনীতিতে অস্ত্র আর বুলেট-এর ভূমিকা সদা সক্রিয়। এমনি বিভিন্নতর কারণের প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। গত ১২ বছরে বাংলাদেশে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে আটবার (মুজিব, মোশতাক, খালেদ মোশাররফ, সায়েম, জিয়া, সাত্তার এবং এরশাদ)। এবং উল্লেখ্য যে, এদের মধ্যে দু'জন ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছেন নৃশংস হত্যার মাধ্যমে।

বাংলাদেশের এমনি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আরো জটিল হয়েছে এক কালের স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর সুযোগ সন্ধানী ভূমিকার ফলে। স্বাধীনতার লগ্নে বা তার কিছুদিন পর পর্যন্ত মনে হয়েছিল এদেশের ধর্মের নামে রাজনীতি বা রাজনৈতিক কারণে ধর্মের ব্যবহারের দিন শেষ হয়েছে। ক্ষমতাসীন সরকারের প্রাথমিক নীতি ও কর্মকাণ্ড সে বিশ্বাসকেই দৃঢ় করেছিল। কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয়নি এ ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতি। রাজনৈতিক অঙ্গনের বিশৃংখলার সুযোগে এবং অন্যান্য অনুকূল পরিস্থিতির আড়ালে ধর্মের মুখোশধারী রাজনীতির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। কেন এবং কি করে এ ঘটনাটি ঘটলো তার আলোচনায় এখন আমরা যাবো।

বাংলায় ইসলাম ঃ তের শতক থেকে পাকিস্তানী আমল—ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রথম প্রচারক ছিলেন সুফী সম্প্রদায়; অসির মাধ্যমে যে ইসলাম, তা এসেছে অনেক পরে। আর সে কারণেই বাংলাদেশে ইসলামের প্রকৃতিতে প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছে সুফীবাদের মানবমুখীন চেতনা। এ চেতনা কট্টর ইসলামী বিধি-বিধান থেকে ভিন্নতর। ফলে সনাতন শরিয়তী ইসলাম কোনদিনই আপামর বাঙ্গালী মুসলমানের মানস প্রকৃতিতে গভীরভাবে স্থান করে নিতে পারে নি। এছাড়া ভৌগোলিক প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল অনেক দূরে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য সংলগ্ন অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর চেয়ে এদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা তুলনামূলকভাবে কম প্রখর ছিল।

অপরদিকে যে ভূ-খন্ডটি বর্তমানে পাকিস্তান নামে পরিচিত তার বেশিরভাগই মুসলমানরা পদানত করেছিল প্রথমত অসির মাধ্যমে। প্রথমে রাজনৈতিক বিজয় এবং পরে হয়েছিল ইসলাম ধর্মের প্রচার। অর্থাৎ বাংলাদেশের ঠিক উল্টো ব্যাপারটি ঘটেছিল পাকিস্তানের ক্ষেত্রে। মুসলিম প্রশাসক ও সৈন্যাধ্যক্ষবৃন্দ প্রথম থেকেই সেখানে এমন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যার ভিত্তি ছিল শরিয়ত। ফলে অসির ছত্রছায়ায় যে ইসলামের প্রবর্তন হয়েছিল, তা ছিল

কট্টর এবং ইসলামী বিধি-বিধানের একনিষ্ঠ অনুসারী। মধ্যপ্রাচ্য সংলগ্ন ভৌগোলিক অবস্থানের ফলে এমনি ধরনের ইসলামী ব্যবস্থা ও চেতনা সহজাতভাবেই গড়ে উঠতে থাকে।

বৃটিশ ভারতে মুসলিম সমাজ ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে। তবে ভারতের সব এলাকায় সমানভাবে দুর্বলতার লক্ষণ পরিস্ফুটিত হয় নি। বাংলাদেশে এই লক্ষণের প্রকাশ তুলনামূলকভাবে দ্রুততর ছিল। কারণ, আঠারো শতকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে এখানেই বৃটিশ ভারত সাম্রাজ্যের সূচনা করে। ক্ষমতার হাত বদল হয়েছিল শাসক মুসলিম সম্প্রদায় থেকে বৃটিশ বনিকদের কাছে। কাজেই নতুন বৃটিশ শাসকবর্গ এই এলাকায় ক্ষমতার উত্তরসূরী মুসলমানদের সব সময়ে সন্দেহের চোখেই দেখতো। কাজেই সুপরিকল্পিতভাবে এবং সামগ্রিক বিচারে মুসলমান বিরোধী ইংরেজ নীতি অনুসরণ করা হতে থাকে। কাজেই বাংলার মুসলমান সমাজ দ্রুত অবক্ষয় ও পতনের দিকে এগিয়ে যায়।

এ সময়েও পাকিস্তানে ঘটেছিল অন্য রকম ঘটনা। এই এলাকায় বৃটিশ শাসনের বিস্তৃতি ঘটেছিল উনিশ শতকে; এবং এমন একটি সময়ে যখন সরকারীভাবে মুসলিম বিরোধী নীতির অবসান হয়েছিল। ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজ শাসকদের নীতিতে এই পরিবর্তন এনেছিল। উপরন্তু পাকিস্তানের এই ভূ-খন্ডকে বৃটিশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে সামরিক ও 'ষ্ট্রাটেজিক' কারণ দায়ী ছিল। এর ফলেই দেখা যায় যে বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ যত ব্যাপক ছিল পাকিস্তানে তা হয় নি। এমনকি মোটেই ছিল না বললেই চলে। পাকিস্তান ও বাংলায় মুসলমানদের প্রতি ঔপনিবেশিক শাসকের অনুসৃত নীতির বিভিন্নতার কারণে ভিন্ন ধরনের সামাজিক ফল সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, বাংলায় মুসলিম সমাজ ইংরেজদের নেতিবাচক নীতির কারণে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। অপর পক্ষে পাকিস্তানের মুসলিম সমাজ প্রায় অক্ষত থেকে যায়। আর ধর্মীয় ফলাফলের বিচারে দেখা যায় যে, পাকিস্তানে ইসলামী চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সনাতন শক্তি নিয়ে বিরাজ করতে থাকে; কিন্তু বাংলায় ইসলামী ঐতিহ্য ম্রিয়মান হতে থাকে; এমনকি উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার সূচনাও হয়।

পাকিস্তানে সনাতন ইসলামী ভাবধারার অটুট অবস্থা এবং বাংলায় এই ভাবধারার বিপর্যয়ের পেছনে ভাষারও কিছু ভূমিকা ছিল। উনিশ শতকে ইংরেজী ভাষা প্রবর্তনের পর ফরাসী ও আরবী ভাষার বিলোপ হয়। একই সময়ে দেখা যায় স্থানীয় ভাষা হিসেবে উর্দু ও বাংলার ব্যাপক ব্যবহার। এই দুটো ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা বক্তব্য বিষয় ও ভাবরীতিতে ছিল পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষা উনিশ শতকে হিন্দু সমাজের পুনর্জাগরণের বাহন ছিল, মুসলমানদের নয়। বাংলা সাহিত্য রচনায় বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। এর ফল হলো এই যে, বাংলার মুসলমান বিগত দিনের ভাষা ফার্সী বিস্মৃত হলো, অপর দিকে যে বাংলা ভাষা চর্চা করতে শুরু করলো, তা হিন্দু বা ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা সম্বলিত ছিল।

অপরদিকে উর্দু প্রথম থেকেই ইসলামী ভাবধার সম্বলিত ভাষা ছিল। উনিশ শতকের উর্দু রচনায় ইসলামী চেতনা পরিস্ফুট। উর্দুর সঙ্গে ইসলামী চেতনার এত

গভীর সম্পর্কের কারণে বর্তমান পাকিস্তানের যে উদারপন্থী/ধর্মনিরপেক্ষ রচনা, তার বেশির ভাগই ইংরেজীতে। কাজেই উর্দু ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমেও পাকিস্তানে ইসলামী ঐতিহ্য অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু বাংলায় ইংরেজী ও বাংলা ভাষার প্রচলনের ফলে পাশ্চাত্যমুখীন এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার ব্যাপক প্রসার হয়।

ওপরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তের শতক থেকে ইংরেজ শাসন আমল পর্যন্ত পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামের যে ইতিহাস আমরা পেলাম, তা থেকে বলা যায় যে, গোড়া থেকেই বাঙ্গালী মুসলমানের চেতনায় সনাতন কট্টর ইসলাম কোন স্থান পায় নি। বরং ইসলাম এদের কাছে আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নতির মাধ্যম হিসাবেই গৃহিত হয়েছিল, ব্যাপক অর্থে সামাজিক রাজনৈতিক কিছু নয়।

'৪৭-এর ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটো রাষ্ট্রের জন্মের পেছনে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভূমিকা ছিল। উপমহাদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সমাজ বুঝেছিলেন যে, ইংরেজহীন অবিভক্ত স্বাধীন ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের হাতে তাদের স্বার্থ নিরাপদ হবে না। কাজেই জন্ম হলো সম্প্রদায় ভিত্তিক দুটো রাষ্ট্রের। মূলতঃ হিন্দু ও মুসলিম উভয় নেতৃত্ব রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করেছিলেন। এর ফলে বাংলার মুসলমানকে পাকিস্তানী মুসলমানদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হতে হয়েছিল।

প্রায় হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে একমাত্র বন্ধন ছিল তথাকথিত ইসলাম। তবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো থেকে মনে হয় যেন, ধর্মকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস চলছিল। জিন্নাহর প্রাথমিক চিন্তা ও বক্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে। অবিভক্ত ভারতে একনিষ্ঠ কংগ্রেস অনুরাগী জিন্নাহ কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে। কিন্তু সেই জিন্নাহই পাকিস্তানের কারণে সাম্প্রদায়িক মুসলীম লীগ নেতা হয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জিন্নাহর মানসিক পরিবর্তন হতে সময় লাগে নি। যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় পড়িমসি বা ব্যর্থতার কারণে সেকালের মুসলীম লীগ এক পর্যায়ে কট্টর ইসলামপন্থীদের কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হতে থাকে। মওলানা মওদুদীর নেতৃত্বে জামাত ইসলামী এই সমালোচনার সুচনা করে। তবে ১৯৬২-তে আইউব সরকার রচিত সংবিধানেই প্রথম ইসলামী শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৪-র এক সংশোধনীর মাধ্যমে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙ্গালী মুসলমান বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান বাঙ্গালী অভিযোগ ও প্রতিবাদের উত্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ইসলামী সংহতির যুক্তি দেখাতে শুরু করেন। কাজেই ষাটের দশক থেকেই বাংলার মানুষ বুঝেছিল ইসলাম পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের জন্যে রাজনৈতিক মুখোশ মাত্র। অবশ্য একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সে মুখোশ উন্মোচন করে দেয়। একাত্তরে বাঙ্গালী নিধনের যুক্তি ছিল বাঙ্গালী ইসলামী সংহতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং 'কাফের' হয়ে গিয়েছে। কাজেই পাকিস্তানের 'জেহাদ'! ইসলামের চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাসে এমনি কলঙ্কজনক অধ্যায় আর নেই। তবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রমাণ করেছে যে, ধর্ম কখনও রাষ্ট্রের সংহতি সৃষ্টি করতে পারে না বা ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতে জাতীয়তাবোধও গড়ে উঠতে পারে না।

বাংলাদেশের জন্মলগ্নে মনে হয়েছিল, এ দেশের মাটিতে আর কোনদিন ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনীতির আবির্ভাব হবে না। কিন্তু তবুও তা হয়েছে।

বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ মুজিব আমল, ১৯৭২—১৯৭৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের অন্যতম মূল নীতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। ১৯৭২-এর ৪ নভেম্বর গৃহীত এই সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মের প্রভাব এবং ধর্মভিত্তিক বৈষম্য—ইত্যাদি বিলোপ করা হয়েছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইসলাম পসন্দ দলগুলোর গণবিরোধী ভূমিকার কারণে স্বাধীন বাংলাদেশের এমনি রাষ্ট্রীয় নীতি অবশ্যম্ভাবী ছিল। তবে মনে রাখা প্রয়োজন এই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচলিত অর্থে সাধারণ নিরপেক্ষতা ছিল না; সামগ্রিক ধারণায় কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। শেখ মুজিবের বহু বক্তৃতা ও বক্তব্যে এটা পরিস্কার হয়েছিল যে, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে এসে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা ছিল যে, রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্বের জন্যে একটি নতুন সংযোজন। এখানে দু'ধরনের ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। প্রথমত ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে শেখ মুজিব রাষ্ট্রীয় নীতি ও কর্মকান্ডকে অবাঞ্ছিত ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। এই নীতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুসৃত ও লালিত কোন ধর্মের অবমূল্যায়ন করা হয় নি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশকে ইসলামী বিশ্বের অংশ হিসাবে ঘোষণা করার সময়ে শেখ মুজিব একটি ভবিষ্যৎ ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলেন নি।

রাষ্ট্রীয় নীতির বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭২-এ গণবিরোধী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে ১৯৭৩-৭৪-এর অর্থনৈতিক সংকটের সময় থেকে রাষ্ট্রীয়, এবং বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতিতে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়ানোর জন্যে ইসলামী বিশ্বের পেট্রো ডলারের প্রয়োজন তৎকালীন নেতৃবৃন্দ গভীরভাবে অনুভব করেন। উপরন্তু জ্বালানী তেল সংকটের শিকার বাংলাদেশের দৃষ্টিতে তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ফলে ইসলামী কর্মকান্ডের (রাজনৈতিক নয়) প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এছাড়া '৭৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার লাহোর শীর্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিব ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং তারপর থেকেই ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল। যা হোক, রাষ্ট্রীয় নীতিতে ইসলামের প্রভাবের দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ১৯৭৫-এ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কথার উল্লেখ, ১৯৭২-এ এই প্রতিষ্ঠানটি বিলোপ করা হয়েছিল। পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন শ্রম, সমাজ কল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি আস্থাশীল; এবং সে ইসলামী আদর্শ শান্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।' তৎকালীন বাংলাদেশের এই নতুন ইসলামী প্রবণতার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথমত,

এটা ধারণা করা অযৌক্তিক হবে যে, বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্রের পথ ধরেছিল। দ্বিতীয়ত, মনে হয় এই নীতি অনেকটাই প্রচার সবস্ব ছিল; লক্ষ্যবস্ত ছিল মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী রাষ্ট্রগুলো। প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল এটাই প্রমাণ করা যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও বাংলাদেশ ইসলাম ধর্মকে বর্জন করে নি।

জিয়ার আমল ঃ ১৯৭৫-১৯৮১

অবশ্য ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরুত্থান বলতে বা বুঝার তার পথ সুগম হয় ১৯৭৫-এর সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিবেশের ফলে। ১৯৭৫-এর আগষ্ট মাসে শেখ মুজিবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পতন হয়। সে বছরই নভেম্বরে ঘটে যায় আরও একটি সামরিক অভ্যুত্থান, যার নেতৃত্বে ছিলেন খালেদ মোশাররফ। এই দুই অভ্যুত্থানের আন্তবর্তীকালে সরকার প্রধান ছিলেন খন্দকার মোশতাক। এ সময়ে শোনা গিয়েছিল, বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বদলিয়ে করা হবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র। অবশ্য পরবর্তীকালে তা হয় নি; বা করা সম্ভব হয় নি। তবে এটাও ঠিক যে, কিছুদিনের মধ্যেই সংবিধান সংশোধিত হয়; এবং মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা বিদায় নেয়।

১৯৭৬-এর জানুয়ারী মাসে নতুন সামরিক সরকার ঘোষণা করেন একটি বিশেষ অধ্যাদেশ। এই অধ্যাদেশ অনুযারী ১৯৭২-এর অধ্যাদেশের অধীনে যত স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তিবর্গের যে বিচার চলছিল, তার অবসান করা হয়। একই বছর আগষ্ট মাসে ঘোষিত রাজনৈতিক অধ্যাদেশ। '৭৫-এর সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর যে দলগুলোকে বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে। তবে রাজনৈতিক দলের পুনরাবির্ভাব ও নতুন কর্মকাণ্ড শুরু করার কিছু পূর্বশর্ত আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে পূর্বেই সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সংবিধান ও মেনিফেস্টোসহ আবেদন করতে হবে। নভেম্বর মাসের মধ্যেই প্রায় ৫৬টি দল আবেদন করে, এদের মধ্যে মাত্র ১৭টি দল সামরিক সরকারের স্বীকৃতি পেতে সমর্থ হয়।

১৯৭৭-এর ২১ এপ্রিল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতাসীন হন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ ছিল সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিদায় দেয়া। এই পরিবর্তন সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সে সময়ের মোট রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল ২১টি। এদের মধ্যে ৫টি দল জিয়াউর রহমানের নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়; এবং তারা হলো, মুসলিম লীগ, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ, জামাতই ইসলামী, নেজাম-ই-ইসলাম, ও খেলাফত-ই-রাব্বানী। বলাবাহুল্য, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গণবিরোধী ভূমিকার জন্যে '৭২-এ দলগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কাজেই দেখা যায়, জিয়াউর রহমানের আমলেই এই দলগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই থেকে শুরু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরুত্থান; আজ তা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

তবে যদি বলা হয় এই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরাবির্ভাবের জন্যে শুধুমাত্র

জিয়াউর রহমানই এককভাবে দায়ী, তবে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হবে। আমরা দেখেছি, এই প্রক্রিয়ার সূচনা মুজিব আমলের শেষ পর্যায় থেকে। আবার এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, জিয়াউর রহমান কোনদিনই ইরান বা পাকিস্তানের মতো একটি গোঁড়া ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা চান নি; বা তা সম্ভবও ছিল না। অন্তত জিয়াউর রহমানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তাই প্রমাণ করে। ক্ষমতাসীন হবার পরই তাঁর ওপর একটি বিশেষ মহল থেকে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল যেন অনতিবিলম্বে বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়; এবং পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠন করা হয়। এই দাবীর সপক্ষে ১৯৭৬-এর মার্চ মাসে এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ গোলাম তওয়াব ও জামাত-ই-ইসলামী এক গণজমায়েত ও বিক্ষোভের আয়োজন করে। এর উত্তরে জিয়া '৭৬-এর ৩০ এপ্রিল তওয়াবকে অবসর গ্রহণ ও দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

তবুও সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে, জিয়ার আমলেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির শক্তি সঞ্চয়ের সূচনা হয়েছিল। জিয়া যদি গোঁড়া ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে নাই চেয়েছিলেন তবে তাঁর বা তাঁর সরকারের ইসলাম প্রবণতার ব্যাখ্যা কি হতে পারে? সম্ভবত স্বাধীনতাপন্থী ও স্বাধীনতা বিরোধী পক্ষ দুটোর মধ্যে একটি সামাজিক রাজনৈতিক আপোস সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। বোধহয় জিয়া ভেবেছিলেন, এই দুই পক্ষের মধ্যে বিরাজমান বৈরী সম্পর্ক ও মানসিক দূরত্ব অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত চলতে থাকলে একটি ব্যাপক সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। রাজনৈতিক কৌশলের বিচারে জিয়ার এই পদক্ষেপ আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই; এবং এর তুলনা করা যেতে পারে ১৯৩০-এর দশকে বৃটেন/ফ্রান্স অনুসৃত 'তোষণনীতি' বা ১৯২৫-এ স্বাক্ষরিত লোকার্নো চুক্তিসমূহের সঙ্গে। উভয় পদক্ষেপের মাধ্যমে দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালের ইউরোপে বিজয়ী ও বিজিত শক্তির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈরিতার অবসান করার ঐকান্তিক প্রয়াস নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে সময়ের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উভয় পদক্ষেপই বাস্তববর্জিত ছিল, এবং এই অবাস্তব নীতি অনুসরণের কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। তোষণ নীতি ছিল হিটলারের প্রতি প্রসারিত নেভিল চেম্বারলেনের সমঝোতার হাত। হিটলারের কিছু যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ ছিল, যার সমাধান সম্ভব ছিল এই নীতির মাধ্যমে। কিন্তু সমঝোতার মানসিকতাকে হিটলার বৃটেনের দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করলেন। হিটলার প্রকাশ্যে সমঝোতার মনোভাব দেখালেও গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছিলেন। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের পুনর্বাসন করতে গিয়ে জিয়া বাস্তববর্জিত একই বিভ্রান্তির শিকার হলেন।

জিয়ার আমলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কতটুকু শক্তি সঞ্চয় করেছিল তার নির্দেশক হিসেবে অনেকে '৮১-র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হাফেজ্জী হুজুরের তৃতীয় স্থান অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করেন। নির্বাচনের আগে গোঁড়া ইসলামপন্থী হাফেজ্জী হুজুর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একজন অজানা-অচেনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু তিনিই কিনা অন্যান্য প্রগতিবাদী ও বামপন্থী দলকে অতিক্রম করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের পরে তৃতীয় স্থান দখল করলেন। এই ঘটনাটিই কি বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অগ্রযাত্রা সূচনা করে? মনে হয় ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার; এবং এর জন্যে প্রয়োজন এই প্রথম তিনটি দলের প্রাপ্ত ভোটের

সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাণ ও শতকরা হার।

রাষ্ট্রপতি নিবার্চন—১৯৮১

মোট ভোটারের সংখ্যা ঃ		৩,৮৯,৫১,০১৪
মোট ভোটদানের সংখ্যা ঃ		২,১৬,০৭,২৫৩
ভোটদানের শতকরা হার ঃ		৫৫.৪৭%
প্রার্থী	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
আবদুস সাত্তার	১,৪২,১৭,৬০১	৬৫.৮০%
কামাল হোসেন	৫৬,৯৪,৮৮৪	২৬.৩৫%
হাফেজ্জী হুজুর	৩,৮৭,২১৫	১.৭৯%

উৎস ঃ হলিডে, ২২ নভেম্বর ১৯৮১।

উপরের সারণি থেকে হাফেজ্জী হুজুরের বিজয়ের আন্তঃসারশূণ্যতা লক্ষ্য করা যায়।

এরশাদ আমল ঃ ১৯৮২

'৮২-র শুরুতে এরশাদ সরকারের ক্ষমতাসীন হবার পর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ইসলামী প্রবণতা এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। শুরু থেকেই এরশাদ এ মত প্রকাশ করেছেন যে, একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান মূলনীতি হবে ইসলাম। ডিসেম্বর মাসে সচিবালয় কর্মচারীদের উদ্দেশ্য এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, আমাদের সংবিধানে ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তার যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। যদি ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা দেয়া যায় তাহলে ভয়ের কি আছে? মোটের ওপর, ইসলাম হলো সহিষ্ণুতা ও সমঝোতার ধর্ম। একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি হয় '৮৩-র জানুয়ারীতে আর একটি বিবৃতিতে। কিন্তু এমনি বক্তব্য/বিবৃতি প্রচণ্ড সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি করে। ১৫ দল এক বিবৃতির মাধ্যমে এরশাদের এধরনের বক্তব্যগুলোর কঠোর সমালোচনা করে। ঢাকার একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি বিগ টক আর ব্যাক' শিরোনামে এক জোরালো প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিছুদিন গুজবও শোনা গেল বাংলাদেশের জন্যে একটি ইসলামী সংবিধান রচনা করা হচ্ছে; এবং এর অন্যতম

রচয়িতা একজন প্রবাসী বাঙ্গালী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। কিন্তু তীব্র সমালোচনার ঝড়, জাতীয় মানসিকতার সুস্পষ্ট প্রবণতা—ইত্যাদির কারণে এরশাদ সম্ভবত যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েই এ বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীকালে নতুন কোন পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকেন। অবশ্য অন্যান্য জটিল সমস্যার গুরুভারও তাঁকে অন্যদিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য করে। ফলে ইসলামী সংবিধান আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। একই কারণে সে সময়ের শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খানের ইসলামী শিক্ষার নীল নকশাটিও বাস্তবায়িত হতে পারে না।

তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, '৮২ থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যতটুকু শক্তি সঞ্চয় করেছে তা পূর্ববর্তী যে-কোন সময়ের চেয়ে বেশী। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো আজ সরাসরি 'ইসলামী হুকুমত' কায়েমের জন্যে সোচ্চার। শুধু জামাতই নয় এদের সঙ্গে মুসলিম লীগের মতো দলও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে উচ্চকণ্ঠ; এবং এমনকি গণতন্ত্রের (!) জন্যেও। কিন্তু একটি বিরাট প্রশ্ন রয়ে যায়। '৭১-পূর্ব সময়ে যখন বাঙ্গালী শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের সপক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তখন এ দলগুলোই ইসলামের দোহাই দিয়ে গণতন্ত্র বিরোধী ও বাঙ্গালী বিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত ছিল। কাজেই প্রশ্ন ঃ এ দলগুলোর গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কি?

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির এই নতুন প্রবাহের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামী মেনিফেস্টো নিয়ে কিছু নতুন দলের আত্মপ্রকাশ বা এককালের মোটামুটি মুক্তমনা নেতৃত্বের ইসলামী কাফেলায় শরীক হওয়া। এ প্রসঙ্গে মেজর জলিলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এককালে ভারতীয় প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জাসদ নিয়ে এবং 'মার্কসবাদ মুক্তির পথ' লিখে তাঁর সৈনিক জীবনের ইতি ও রাজনৈতিক জীবনের সূচনা; বর্তমানে তিনি তাঁর 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' দল নিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে রত।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কারণসমূহ

ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্যে আমরা মোটামুটি চারটি কারণ নির্দেশ করতে পারি। প্রথমত, ক্ষমতাসীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা। '৭২ থেকে '৮৪ এই পৃষ্ঠপোষকতার গুণগত রকমফের হয়েছে, এবং তা হয়েছে বিভিন্ন সরকারের প্রকৃতির কারণে। আলোচনার শুরুতে আমরা উল্লেখ করেছি মুজিব সরকারের ইসলাম প্রবণতার কথা। আরো উল্লেখিত হয়েছে যে, এর জন্যে রাজনৈতিক-কূটনৈতিক চিন্তা চেতনা কার্যকরী ছিল। জিয়া (সামরিক) ও এরশাদ সরকার গণতান্ত্রিক অর্থে অবৈধ। কাজেই গণমানসে বৈধতার আবরণ (রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 'লেজিটিমেসী' বলা হয়) সৃষ্টি করার কারণেই ইসলামের শরণাপন্ন হতে হয়েছে; তুলতে হয়েছে ইসলামের শ্লোগান। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলোর (যারা ইসলাম পসন্দ দল) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় শ্লোগান ব্যবহার। এটা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমান সরল মানসিকতাসম্পন্ন এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্মপ্রাণ। কাজেই তাদের কাছে ধর্মের আফিমের একটা তাৎপর্য আছে। আর সেই কারণেই ইসলামী শ্লোগান।

মেজর জলিলের একটি বক্তব্যে বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে; 'আমি লক্ষ্য করলাম বৈজ্ঞানিক সমাতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করা যায় না এবং গন্তব্যস্থল সুদূরপরাহত। এছাড়া জনগণের সাথে মেশার ফলে আমার উপলব্ধি হলো যে, জাসদকে জনগণ ইসলাম বিচ্যুত দল হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেছে। এটা আমাদের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমার স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে, মানুষের সার্বিক মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম ও কোরান সুন্নাহ এবং এটাই গ্রহণযোগ্য' (বিচিত্রা, ২ নভেম্বর ১৯৮৪)। কাজেই ইসলামের অন্তর্নিহিত আবেদন নয় বরং জনগণের গ্রহণযোগ্যতার কারণেই ইসলামী রাজনীতি। কিন্তু প্রশ্ন হলো ঃ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে সহজ ও সরলভাবে জনগণের বোধগম্য করে উপস্থাপনের কোন চেষ্টা কি আজ পর্যন্ত হয়েছে? শহরভিত্তিক বুর্জোয়া রাজনীতির পরিমণ্ডলে দেশের আপামর জনগণের সঙ্গে নেতৃবৃন্দের যোগাযোগ কোথায়? তৃতীয়ত, স্বাধীনতার পর ইসলাম পসন্দ নেতৃবৃন্দ মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে বুঝিয়েছিলেন বাংলাদেশে 'ইসলাম ইন ডেঞ্জার'; মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়েছে অসংখ্য মসজিদ। কাজেই '৭৫-এর পর থেকে আসতে শুরু করলো পেট্রো-ডলারের সাহায্য। এই সাহায্য শুধু জাতীয় পুনর্গঠনের জন্যেই নয়, বরং বিভিন্নভাবে ইসলামের পুনর্গঠনের জন্যেও। ফলে রাতারাতি বাংলাদেশে গড়ে উঠলো সীরাত মজলিশ, মসজিদ সমাজ ইত্যাদি; শুরু হলো ব্যাপক ইসলামী কার্যক্রম। চতুর্থত, মনে হয় '৭২—'৭৫-এর ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের যে ব্যর্থতা, তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে জনমনে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল, তারই সুযোগে ইসলামী রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অবাঞ্ছিত কেন?

মুক্তমন নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বহুবিধ কারণেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অবাঞ্ছিত। প্রথমত, বিশ্বের ইতিহাস আলোচনা থেকে একটি বিরাট সত্য বেরিয়ে আসে; আর তা হলো, যখন সমাজে ধর্ম আর রাজনীতি যখনই মিলিত হয়েছে তখনই সৃষ্টি হয়েছে বিশৃংখলা। ধর্ম রাজনীতির অঙ্গনে সব সময়েই সামাজিক বিভেদ সৃষ্টিকারী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলোতে শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে তখনই যখন রাজনীতিকে ধর্মমুক্ত ও ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত করা হয়েছে। উপরন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিচার করলে বলা উচিত যে, স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কোন অধিকার নেই। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এরা ছিল গণহত্যার সক্রিয় সহযোগী। আলবদর /আলশামস ছিল পাকিস্তানী সামরিক চক্রের দোসর এবং বুদ্ধিজীবী নিধনের নীল-নকশা প্রণয়নকারী ও বাস্তবায়নকারী। এছাড়া আরো কারণ আছে। এদের অনেকে বাংলাদেশের আদর্শিক ভিত্তিকে গ্রহণ করে না। কিছুদিন আগে জামাত নেতা গোলাম আযম বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ মাটির নাম, আদর্শের নয়।' অবশ্য তিনি তা বলতে পারেন। কারণ, তিনি এখনও পাকিস্তানের নাগরিক এবং পাকিস্তানী পাসপোর্ট বহনকারী। কিন্তু প্রশ্ন হলো ঃ বাংলাদেশের আদর্শ যদি গ্রহণযোগ্য না-ই হয় তাহলে এদেশের মাটিতে তাঁর দল 'গণতন্ত্রের'(!) সংগ্রাম করছে কেন?

উপসংহার

আলোচনার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশে ইসলামের ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের কথা। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ইরান বা পাকিস্তানের মতো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অযৌক্তিক এবং অবাঞ্ছিত। '৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসেবে আমাদের যে অভিজ্ঞতা তাও একটি বিবেচ্য বিষয়। উপরন্তু '৭১-এ ইসলামী সংহতি রক্ষার নামে অগণিত ধর্ষিত নারী ও নিহত প্রাণের কাছে আমাদের জবাব কি?

বিচিত্রা, ৩০ নভেম্বর '৮৪

২

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা ও মওদুদীর চিন্তা

মওলানা আবদুল আউয়াল

জামাতে ইসলামীর জন্ম হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী। বিভিন্ন সময় থেকে উপমহাদেশের মুক্তির জন্য জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি যে সকল আন্দোলন করেছিল ইংরেজ সরকারের জন্য সেটা খুব স্বস্তিদায়ক ছিল না। জাতীয়তাবাদীদের এই আন্দোলনকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার মুসলমান এবং হিন্দু উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনকে উৎসাহিত করে। ইংরেজদের এই মদদের ফলশ্রুতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামী। প্রথম থেকে মওদুদী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কট্টর সমালোচক ছিলেন। বিরোধিতা করেছেন মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইটালীর ফ্যাসিস্ট ও জার্মানীর নাৎসীরা পরাজিত হলে মওদুদী তাদের আদর্শ গ্রহণ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় লিপ্ত হন। ১৯৬৯ সালে মওলানা আবদুল আউয়াল 'মওদুদী চিন্তাধারা' নামে একটি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে এই ফ্যাসিস্ট দলটির প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এই নিবন্ধটি সেই গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

মওলানা মওদুদীর কর্মজীবন আরম্ভ হয় ১৯১৭ কিংবা ১৯১৮ সাল থেকে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে তার কর্মজীবনের সূচনা। এ সময় থেকে ১৯২৮ সাল অবধি তিনি ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করেন। এর পরবর্তী কর্মস্থল হলো হায়দরাবাদ। মওলানার বড় ভাই আবুল খায়ের মওদুদী সেখানে থাকতেন। তিনি হায়দরাবাদে নিজামের অনুবাদ দফতরের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এ সময়ে মওলানা কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন। সম্ভবত ভাইয়ের সুপারিশে হায়দরাবাদের 'দারুত্তরজমা' থেকে দর্শনের একটি গ্রন্থ তাঁকে তরজমা করার জন্য দেয়া হয়। অবশ্য তাড়াহুড়ো এইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু পারিশ্রমিক হিসেবে তিনি পাঁচ হাজার টাকা লাভ করেন। এ অর্থ দ্বারা ১৯৩৩ সালে মাসিক 'তরজমানুল কোরআন' ক্রয় করেন। পত্রিকাটি আগে থেকে প্রকাশিত হতো।

তরজমানুল কোরআনের মাধ্যমে মওলানা তাঁর 'বিশেষ মত' প্রচার আরম্ভ করেন। এর আগে তিনি সালজুক বংশ ও হায়দরাবাদের ইতিহাস রচনা করেন। বইগুলো হায়দরাবাদের নিজামস্তুতিমূলক আর্থিক জগত জীবন ১৯৩৩ ...

আকস্মাৎ মুশাপো। ফলে এখন প্রভু তিনি কিরূপ যুক্তিভিত্তি নিয়ে বিভিন্ন ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন তা বলা মুশকিল। একথা সত্য যে, এখন প্রভুর মাধ্যমে তিনি হায়দরাবাদের শাসক গোষ্ঠীর অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সাল, যখন তরজমানুল কোরআন আত্মপ্রকাশের পর থেকে হায়দরাবাদ জীবন মওলানার মতাদর্শ কি ছিলো তার কিছুটা সন্ধান পাওয়া যায়। এ সময় থেকে তিনি হায়দরাবাদে নিজাম শাসন পদ্ধতি তথা রাজতন্ত্রের তৈলাক্ত প্রশংসায় তরজমানুল কোরআনের অধিকাংশ পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। তাও আবার ইসলামের 'বিশেষ ব্যাখ্যার' মাধ্যমে। কারণ এছাড়া তখন নিজামদের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণের বিকল্প কোনো পথ ছিলো না।

১৯২৯ সাল ও তার পরবর্তী কয়েক বছর সময় বৃটিশ ভারতে একটা চরম উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো। এ সময় একবার ইংরেজ ও কংগ্রেসের মধ্যকার সম্পর্ক জটিল রূপ পরিগ্রহ করে। পরে তা প্রশমিত হয়। গান্ধীজিকে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল কনফারেন্সে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি লণ্ডন থেকে ভারতে ফেরার পর আবার ইংরেজ-কংগ্রেস সম্পর্কে মারাত্মক অবনতি দেখা দেয়। এ সময় কংগ্রেস সমর্থক মুসলমান হঠাৎ জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও আহরার পার্টি কংগ্রেস জোটভুক্ত হয়। সীমান্তের গফফার খান গ্রুপও এ সময় কংগ্রেসে শামিল হয়। এ ছিলো সে সময় বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ১৯৩৬ সাল ভারতশাসন আইন জারীর পর কংগ্রেসের শক্তি পুর্ণোদ্যমে বেড়ে যায়। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারণায় মেতে উঠে। সর্ব প্রথম তারা রাজার শাসনপদ্ধতির উপর হামলা চালায়। নিজাম শাসিত হায়দরাবাদও তখন এই হামলা থেকে নিরাপদ ছিলো না। এর আগে ১৯২৪ সালের পর থেকে সেখানে শুদ্ধি সংগঠন ও আর্য সমাজীর সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রচারণা আরম্ভ হয়। তদুপরি সেখানকার ইণ্ডিয়ান স্টেট, শিক্ষিত যুবক শ্রেণী সমাজতন্ত্রের প্রচারণা আরম্ভ করে। সবকিছুতে ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করে সেখানকার দেশীয় আন্দোলন। কোন কোন মুসলমান নেতা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতেন, ''আমাদের নিকট যদি একজন মদিনার মুসলমান ও একজন দেশীয় বাসিন্দা এসে রুটি ভিক্ষা চায়, তাহলে আমরা দেশীয়কেই প্রাধান্য দেব।''

এসব আন্দোলনে হায়দরাবাদের শাসনযন্ত্র ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। উত্তর ভারত, বিশেষ করে যুক্ত প্রদেশ ও দিল্লী থেকে আগত মুসলমান সরকারী কর্মচারী ও রাজ্যের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত মুসলমান আমলারা ঘাবড়ে যায়। কারণ দেশীয় আন্দোলন কামিয়াব হওয়ার অর্থ নিজামের রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া। কিন্তু নিজাম ও তাঁর আরাম-আয়েশ প্রিয় পরিবার এবং ক্ষমতা আমলাদের প্রতি মোটেও কর্ণপাত করেনি। সত্যি কথা বলতে কি, মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থার যাঁতাকলে সেখানকার মুসলমানরাও নিষ্পেষিত হচ্ছিলো। সাধারণ মানুষ বলতে সবারই জীবন যাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিলো। এ সময় মওলানা মওদুদী মাসিক 'তরজমানুল কোরআন' বের করেন। মনে হয় সাময়িকীটি বের করার পিছনে কর্তা গোষ্ঠীর হাত ছিলো। এরূপ ধারণা করার যথেষ্ট কারণ আছে। জানা যায়, সে সময় হায়দরাবাদের ধর্ম সংক্রান্ত বিভাগ 'তরজমানুল কোরআনে'র কয়েক'শ কপি খরিদ করতো। সে যাই হোক, মওলানা সাময়িকীটির মাধ্যমে নিজামের রাজতান্ত্রিক

শাসনব্যবস্থার বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রচার করে যেতে লাগলেন। মজার ব্যাপার হলো আজকাল যেমন মওলানা সবকিছু ইসলামের দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করছেন বলে দাবী করেন, হায়দরাবাদ জীবনেও তাঁর প্রচারধারা অনুরূপ ছিলো। ইসলামের ছদ্মাবরণে নিজাম-রাজতন্ত্রের মহিমাকীর্তন করেছেন। তিনি নিঃসংকোচে ঘোষণা করেছেন, ''জনগণের সরকার জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য—মুসলমান হিসেবে আমি এ নীতির সমর্থক নই।''[১]

রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের আশা-আকাংখা প্রতিফলিত হয়েছে, এরূপ নজির ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। হায়দরাবাদেও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপেক্ষা করে বাইরের লোকদের চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। এক সময় সেখানে এর বিরুদ্ধে প্রবল গণ-অসন্তোষ দেখা দেয়। মওলানা এ সময়ের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন। নিজের ক্ষুরধার লেখনী নিজামের সর্মথনে পরিচালনা করেন। তিনি সেখানকার শাসকগোষ্ঠীর উক্ত অন্যায় আচরণ সর্মথন করে বলেন, ''মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো যোগ্য লোক সংগ্রহের ব্যাপারে কোন সময়ই বিশেষ দেশ বা জাতির সম্পদে সীমাবদ্ধ রয়নি। সকল স্থান থেকেই জ্ঞানী ও কর্মঠ হাত তাদের জন্য জমায়েত হয়েছে। এবং তারা প্রতিটি দারুল ইসলামকে নিজেদের ওয়াতন ও আবাসভূমি মনে করেছে।'' [২]

আজকের সমাজ বা পরিবেশে দাঁড়িয়ে মওলানার উপরোক্ত উদ্বৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে হয়তো দোষণীয় বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হবে না। কিন্তু তিনি যে সময়, পরিস্থিতি ও পরিবেশে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছিলেন, সেদিকে লক্ষ্য করলে এর অশুভতা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। যে সময় হায়দরাবাদবাসী সরকারী চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করছে, ঠিক সে মুহূর্তে তিনি কিনা বললেন যোগ্য লোক যে কোন দেশ থেকেই সংগ্রহ করা চলে। উক্ত আন্দোলনের প্রতি এর চাইতে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রচারণা আর কি হতে পারে? ঠিক এভাবেই তিনি সে সময়ে 'তরজমানুল কোরআনের' মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সর্মথনে প্রচারণা চালাতেন।

কর্মজীবনে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে মানুষের মতাদর্শের পরিবর্তন হয়। এমনকি কোনো দল বা রাষ্ট্রও সময় বিশেষে বিভিন্ন ব্যাপারে তাদের মত ও পথের পরিবর্তন করে থাকে। এটা দোষণীয় কিছু নয়। কিন্তু যিনি একটা বিশেষ আদর্শের অনুসারী বলে দাবী করেন, সব কিছুই তিনি সে আদর্শের দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেন বলে প্রচার করেন তাঁর পক্ষে তো একই বিষয় সম্পর্কে পাত্র-ক্ষেত্র-সময়-কাল বিশেষে বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা মতামত দেয়া সম্ভবপর নয়। ইসলাম ধর্মের মূলনীতি-আদর্শ প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পবিত্র কোরআন, মহানবীর (সঃ) বাণী ও কর্মাবলী দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন যুগে ইসলামিক চিন্তাবিদগণ প্রধানত কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারাই বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ ও মতামত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান ও আগামী দিনের মুসলিম জীবনে যে সব সমস্যার উদ্ভব হবে কোনআন ও সুন্নাহর আলোকেই সেগুলোর সমাধান করতে হবে। মওলানা মওদুদী একজন ইসলামিক

১) সিয়াসী কাশমকাশ, মওলানা মওদুদী, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠা
২) তরজমানুল কোরআন, ১৯৩৩, নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা।

চিন্তাবিদ। তিনি সুদীর্ঘ কর্মজীবনে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন যা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি এবং হবে না। তাঁর এ সব লেখার শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার-বিবেচনা না করলেও একটা বিষয় আমাদের ভাবিয়ে তুলে। সেটা হলো স্ববিরোধী উক্তি, একই বিষয় সম্পর্কে বৈসাদৃশ্য মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ১৯৩৩ সালে থেকে এ পর্যন্ত তরজমানুল কোরআনের সবগুলো সংখ্যা এবং তাঁর লেখা সব কটি পুস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর অনেক লেখাই আজকাল দুর্লভ। তবু যা কিছু পাওয়া যায় তাতে দৃষ্টিপাত করলেই আমাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়।

মওলানা মওদুদীর হায়দরাবাদ জীবনের পরবর্তীকালের প্রবন্ধরাজিতে দেখা যায়, 'ইসলাম ও মুসলমানের' তিনি একটি বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''ইসলামের দৃষ্টিতে তারাই কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায় যারা 'গায়ের ইলাহী' সরকার মিটিয়ে দিয়ে ইলাহী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের গড়া আইন-কানুনের পরিবর্তে খোদাই আইন-কানুন দ্বারা দেশ শাসনের জন্য সংগ্রাম করে। যে দল বা জমাত এরূপ করে না, বরং গায়ের ইলাহী শাসনব্যবস্থায় 'মুসলমান' নামক একটি সম্প্রদায়ের পার্থিব কল্যাণ সাধনে সংগ্রাম করে তারা ইসলাম পন্থী নয় এবং তাদের মুসলিম সম্প্রদায় বলাও বৈধ নয়।'' ৩

সাধারণত কলমায় যারা বিশ্বাসী তাদের তিনি মুসলমান ও মুসলিম বলতে প্রস্তুত নন।

কিন্তু হায়দরাবাদ জীবনে তিনি কেবলমাত্র কলমাকেই মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্য সূত্র, অন্যার্থে কলমায় বিশ্বাসীকেই মুসলমান বলে অভিহিত করেছেন। তরজমানুল কোরআনের উপরোল্লিখিত সংখ্যার একস্থানে তিনি বলেছেন, ''ইসলাম জাতীয়তার যে বৃত্ত একেঁছে তা ঘিরে রয়েছে একটি কলমা .....লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। এই কলমার উপরই বন্ধুতা আর শত্রুতা। এর স্বীকার একত্র করে, অস্বীকার পৃথক করে।''

হায়দরাবাদের শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে তিনি 'মুসলমানের' এক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি বুঝে এটা পাল্টে দিয়েছেন। অর্থাৎ হায়দরাবাদে 'মুসলমানের' যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাতে সাধারণভাবে সবাই যাদের মুসলমান বলে তিনিও তাই বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের ব্যাখ্যায় মুসলিম জাহানের শতকরা একজনও পড়ে কিনা সন্দেহ। এভাবে মুসলমান শব্দটিও তাঁর স্বার্থসিদ্ধির শিকার থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।

বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে তিনি অসংখ্য স্থানে এধরনের স্ববিরোধী মন্তব্য করেছেন। এসব লেখা দেখে যে কোন লোক মওলানা মওদুদী সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করতে বাধ্য হবেন যে ইসলাম প্রচার তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। তিনি ইসলামকে স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। তা সত্ত্বেও মওলানা যে একজন অসাধারণ কলমী ও সংগঠন প্রতিভার অধিকারী, একথা অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকালের কর্মজীবনের প্রতি তাকালে আর একটা বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি চিন্তাধারা ও সংগঠনপদ্ধতির ব্যাপারে কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদের নিকট ঋণী। অবশ্য

৩) সিয়াসী কাশমকাশ, ৩য় খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা—মওলানা মওদুদী।

তিনি কোথাও এর স্বীকারোক্তি করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। এজন্য বেশী দূর যেতে হবে না। মরহুম মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মিসরের ইসলামিক ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শেখ হাসান বানার রচনাবলী ও চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলেই অনেকটা প্রতিভাত হবে।

সম্ভবত মওলানা আজাদ ১৯১২ সাল থেকে তাঁর 'আল-হেলাল' সাময়িকীর মাধ্যমে এক নতুন পদ্ধতিতে মুসলিম ভারতকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে মুসলমানরা তাঁর এ ডাকে সাড়া দেন। বৃটিশ সরকার 'আল-হেলাল' বন্ধ করে দেওয়ার পরও তাঁর এ বিশেষ ধরনের প্রচারে ভাটা পড়েনি। তিনি 'আল-বালাগ' নামক আর একটি সাময়িকী বের করেন। তাঁর অনলবর্ষী লেখনী উর্দুভাষী মুসলিম ভারতে ইসলাম সম্পর্কে এক বৈপ্লবিক প্রেরণা সঞ্চার করে। তিনি 'হেজবুল্লাহ' দল গঠন করেন। সম্ভবত ১৯২০ সালের দিকে তার চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। তার মতের পরিবর্তন ঘটলেও লাখ লাখ উর্দুভাষী যারা মওলানার লেখা পড়ে ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েছিলো তাদের মতাদর্শে ব্যতিক্রম দেখা দেয় না। তারা যেখানে ছিলো সেখানেই রয়ে যায়। কিন্তু মওলানা পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের প্রতি মোটেও তাকাননি। এমনকি এ পরিবর্তন সম্পর্কে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও সন্তোষজনক জবাব দেননি। এ সম্পর্কে একরূপ মৌন ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন বলা চলে। পরবর্তীকালে মওলানা মওদুদী মওলানা আজাদের অনুসরণ করে তাঁর গড়া মহলকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করায় নিয়োজিত হন।

সম্ভবত মওলানা আজাদ ১৯১৮ কিংবা ১৯১৯ সালে একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "……আমার প্রতি তাকাও। আমি একজন মানুষ, তোমাদের মধ্যে রয়েছি। গত দশ বছর থেকে একই আহবান ধ্বনি তুলে যাচ্ছি। কেবলমাত্র একটি কথার প্রতিই তোমাদের আহবান করছি। ফিরে ফিরে ডাকছি। কিন্তু তোমরা সব সময়ই এড়িয়ে চলেছো। …আমি তোমাদের প্রতিটি দল পরীক্ষা করেছি। প্রতিটি হৃদয় ও প্রাণের আনাচে আনাচে খুঁজে ফিরেছি। যখনই কোনো জনতার ভিড় দেখেছি ফরিয়াদ করেছি, নিজের দিকে ডেকেছি, কিন্তু সবাই আমার থেকে দূরে সরে রয়েছে। বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন খুব কম হৃদয়েরই সাক্ষাৎ মিলেছে। ……আফসোস, তোমাদের ভিতর কেউ নেই যে আমার ভাষা বুঝে, আমাকে চিনে। সত্যি বলছি, আমি তোমাদের এই দেশে বন্ধু-বান্ধবহীন একজন দরিদ্র অধিবাসী।" ……

মওলানা মওদুদী ১৯৩৯ সালের তরজমানুল কোরআনের মার্চ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলেছেন, …"এ সব আকাঙ্খা অন্তরে পোষণ করছি এবং সেগুলো হাসিল করার জন্য গত ছ'বছর থেকে শরীরের পুরো শক্তি ব্যয় করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি একা। আমার শক্তি সীমিত, সম্পদহীন। যা করতে চাই, পারছি না। সঙ্গী খুঁজে ফিরছি, খুবই নগণ্য সংখ্যক পাওয়া যাচ্ছে। কোটি কোটি মুসলমানের ভিতর আমি নিজেকে অপরিচিত ও গরীব বোধ করছি। আমি যে উম্মাদনায় পতিত হয়েছি তার প্রতি আসক্ত কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বছরের পর বছর ধরে যাদের নিকট নিজের চিন্তাধারা পৌঁছাচ্ছি যখনই তাদের নিকটস্থ হই, দেখতে পাই তারা আমার থেকে অনেক দূরে। তাদের সুর আমার সুর থেকে

স্বতন্ত্র.....আমার হৃদয় তাদের হৃদয়ের অপরিচিত। তাদের কর্ণ আমার ভাষা বুঝে না।''

উদ্ধৃতি দু'টোতে শব্দগত পার্থক্য রয়েছে সত্য কিন্তু একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, প্রায় বিশ বছর পূর্বে মওলানা আবুল কালাম আজাদ যা বলেছেন, যেদিকে মুসলিম ভারতকে আহবান জানিয়েছেন, ১৯৩৯ সালে মওলানা মওদুদী তারই প্রতিধ্বনি করেছেন।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'হেজবুল্লাহ' পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির নাম দিয়েছেন 'ক্বলী এবং রোগ' (আদ্দাউ ওয়াদ্দাওয়াউ)। মওলানা মওদুদীও ''একটি সত্যবাদী দলের প্রয়োজন'' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। মওলানা আজাদের লেখাটি সর্বপ্রথম ১৯১২ সালে 'আল-হেলালে' বের হয়। মওলানা মওদুদীর প্রবন্ধটি তরজমানুল কোরআনে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪১ সালে। উক্ত প্রবন্ধে মওলানা আজাদের কংগ্রেসে যোগদান পূর্ব-কালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারা চমৎকার আলোচিত হয়েছে। মওলানা মওদুদীর তাঁর প্রবন্ধে অনুরূপ আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধ দুটো পড়লে যে কেউ একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে পরবর্তীকালে লেখা প্রবন্ধটিতে প্রথমটির প্রতিধ্বনি করা হয়েছে।

মওলানা আজাদ তার প্রবন্ধে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেছেন, ''আজ আমাদের সামনেই আমাদের অধঃপতন উপস্থিত। নিজেদের কাফন-দাফনের সামান আমরা নিজেদের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। বার বার ব্যবস্থাপত্র পরীক্ষা করা ও একাধিক চিকিৎসকের নিকট যাওয়ার এখন আর আমাদের সময় নেই। এখন শুধু আমাদের একটি ব্যবস্থাপত্র ও একজন ডাক্তারেরই প্রয়োজন।.....সুতরাং এখন ইসলামকে আর একবার তার সেই কর্তব্য পালনের সময় এসে গেছে যা সে একবার সম্পাদন করেছিলো। মুসলমানকে তাদের সংশোধন নিজের জন্যই নয়, বরং অন্যদের জন্যও করতে হবে। তাতে করে তাদের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব সংশোধিত হবে।.....''

মওলানা মওদুদী তাঁর 'একটি সত্যবাদী দলের প্রয়োজন' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন, ''একথা ন্যায়তই বলা যায় যে, মানবতার ভবিষ্যৎ এখন ইসলামের উপর নির্ভরশীল। মানুষের গড়া চিন্তাধারা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাদের কারোর জন্যই সফলতার কোনো সুযোগ নেই। পুনরায় কোনো চিন্তাধারা প্রণয়ন করা এবং তা পরীক্ষার উপর নিজেদের ভাগ্য জড়িত করার মত ধৈর্যটুকু এখন মানুষের মধ্যে নেই। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র ইসলামই এমন এক আদর্শ যা থেকে মানুষ কল্যাণের আশা-ভরসা করতে পারে।.....''

মওলানা আজাদ ও মওদুদী উল্লিখিত প্রবন্ধ দুটোর উদ্ধৃত অংশ থেকে একথা স্বভাবতই প্রতিভাত হয় যে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির অনুসরণে লেখা হয়েছে। মূলতঃ গোটা প্রবন্ধ দু'টোই এ ধরনের। শব্দগত পার্থক্য যতই করা হোক না কেন, এর দ্বারা ভাবের অভিন্নতা কিছুতেই ধামাচাপা দেয়া যায় না। সত্যিকথা বলতে কি, মওলানা আজাদ ১৯১২ সাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ নাগাদ অর্থাৎ কংগ্রেসে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত হেজবুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র দল সম্পর্কে যে ধরনের কথাবার্তা বলেছেন, 'আল-হেলাল' ও 'আল-বালাগ' পত্রিকার মাধ্যমে

যেরূপ প্রচার অভিযান চালিয়েছেন, মওলানা মওদুদী তার বড় বিশেষ কিছু বাদ দেননি। মওলানা মওদুদীর ''সত্যবাদী জমাতের'' পরিকল্পনা 'হেজবুল্লার' প্রতিচ্ছবি বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

এ ধরনের সাযুজ্য আমরা শেখ হাসান বানা ও মওলানা মওদুদীর মধ্যেও দেখতে পাই। শেখ হাসান বানা ছিলেন মিসরে ইসলামিক ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৮ সালে মার্চ মাসে বানা তাঁর ইসমাইলিয়াস্থ বাসভবনে মাত্র ছ'জন অনুসারী নিয়ে সর্বপ্রথম এই পার্টি গঠন করেন। শেখ বানার পার্টি গঠনপদ্ধতি, এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা বিবৃতির সাথে মওলানা মওদুদীর জমাতের গঠন পদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে তুলনা করলে প্রায় একরূপ বলে মনে হয়। অথচ উভয়ের মধ্যে সময়েরও বেশ ব্যবধান রয়েছে।

শেখ বানা তাঁর পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, ''ইসলামিক ভ্রাতৃসংঘের চিন্তা, উদ্দেশ্য ও উপায় সবই ইসলামিক, কেবলমাত্র ইসলামিক। ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর সাথে এর বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই।''

মওলানা মওদুদী তাঁর দল জমাতে ইসলামী গঠনের পর প্রথম ভাষণে বলেছেন, ''আমরা খাঁটি এবং আসল ইসলাম নিয়ে যাত্রা করছি। এবং পুরোপুরি ইসলামই আমাদের আন্দোলন।'' ৪

শেখ হাসান বানা ১৯৩৮ সালে পার্টির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেছেন, ''.....বস্তুত বিশ্বাস, ইবাদত, ওয়াতন, বংশ বা জাতি, ধর্ম, সরকার, অধ্যাত্ম, তরবারি—এ সব কিছুই ইসলাম।...ইসলামিক ভ্রাতৃসংঘের আওয়াজ হলো, মর্তের যে কোন অংশে একজন মুসলমানও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলিয়ে থাকবে, সেটা তাদের ওয়াতন।.....''

ইসলামের রাজনৈতিক বিশ্বজনিনতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মওলানা মওদুদীও একথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, ''ইসলাম যেমন বিশ্বাস ও ইবাদত তেমনি ওয়াতন ও বংশ বা জাতিও। সে মানুষের মধ্যকার অন্য সব পার্থক্য ও সম্পর্ক মিটিয়ে দিয়েছে।.....ইসলাম ভৌগোলিক সীমা-সরহদ এবং রক্ত ও বংশ বা জাতিগত পার্থক্য স্বীকার করে না, বরং সকল মুসলমানকে এক উম্মত বা জাতি বলে মেনে নেয় এবং সকল ইসলামিক রাষ্ট্রকে এক ওয়াতন হিসেবে পরিগণিত হরে।''

শেখ হাসান বানা তাঁর ইসলামিক ভ্রাতৃসংঘের আন্দোলন তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। মওলানা মওদুদীও তাঁর আন্দোলন অনুরূপ তিন পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

এ সম্পর্কে হাসান বানা বলেন, ''ইসলামিক ভ্রাতৃসংঘ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে যে, প্রতিটি আহবানের তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। প্রথম, আবেদন পর্যায়। তাতে আহবানের চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করান হয়। অধিকাংশ জনতার নিকট এর আবেদন পৌছান হয়। দ্বিতীয় সংগঠন পর্যায়। এ পর্যায়ে আহবান তার সাহায্যকারী বেছে নেয় এবং মানুষের মধ্য থেকে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সৈনিক সংগ্রহ করে তাদের সুসংহত করে। তৃতীয় ও শেষ বাস্তবায়ন পর্যায়। এটি হলো আহবানের শক্তি অর্জন ও ফলশ্রুতি

৪) রোয়েদাদে জমাতে ইসলামী, প্রথম খণ্ড।

সময়।...'' ১৯৩৮ সালের ভাষণে শেখ হাসান বানা তার আন্দোলনের প্রথম দু'পর্যায়ের কর্মবিবরণীর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তৃতীয় পর্যায় সম্পর্কে তিনি বলেছেন,.....''ইনশা-আল্লাহ আমরা তৃতীয় পর্যায়ের পদক্ষেপ গ্রহন করবো আর এ হবে বাস্তবায়ন পদক্ষেপ।''

অনুরূপ রূপরেখা মওলানা মওদুদী ও তার আন্দোলন সম্পর্কে এঁকেছেন। তিনি লিখেছেন, ''জমাতে ইসলামী যে আন্দোলন নিয়ে যাত্রা করেছে, গত আঠার বছরে তার দুটি পর্যায় শেষ হয়েছে। এখন তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায় ছিলো নিছক আহবান ও প্রচারের। এধারা আনুমানিক নয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায় ছিলো সংগঠন ও শিক্ষাদীক্ষার। তাতে আনুমানিক ছ' বছর অতিবাহিত হয়েছে। তৃতীয় পর্যায় হলো সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন পদক্ষেপ। আর এটা তিন বছর পূর্বে শুরু হয়েছে।'' ৫

শেখ হাসান বানা আইন পরিষদে একাধিক রাজনৈতিক পার্টির বিরোধিতা করেছেন। মওলানা মওদুদীও এক্ষেত্রে বানার অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ''আইন পরিষদে একাধিক দল গঠন করা শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।'' ৬

দেশের পরিষদগুলোতে মহিলাদের সদস্য পদ দানে বিরোধিতার ব্যাপারেও মওলানা মওদুদী শেখ হাসান বানার প্রতিধ্বনি করেছেন। শেখ হাসান বানা ও ইসলামিক ভ্রাতৃসংঘের বইপুস্তক আমাদের দেশে, এমন কি মিসরেও আজকাল বড় বিশেষ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন উপায়ে যতটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যায়, শেখ বানার মতাদর্শ ও পার্টি গঠন সম্পর্কিত নানান বিষয়ের অনেক কিছুই মওলানা মওদুদীর মধ্যে রয়েছে।

মওলানা মওদুদীর জনৈক অনুসারীর উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, তিনি মওলানাকে একজন উঁচুদরের লেখক, সাহিত্যিক, ইসলামিক চিন্তাবিদ, সংগঠনবিদ, বিপ্লবী, রাজনীতিক ইত্যাকার বলে প্রশংসা করেছেন। তাঁর মধ্যে এসব গুণের কোনটিই যে নেই, এরূপ উক্তি কেউ করবে না। মওলানার মতাদর্শ সম্পর্কে অনেকেরই দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি অনেক কিছুই করেছেন, একথা হয়তো অনেকেই স্বীকার করবে। তা সত্ত্বেও মওলানার চিন্তাধারার মৌলিকতা এবং প্রকাশভঙ্গির স্বকীয়তা সম্পর্কে আমাদের মনে নানান প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তিনি ইসলামের আলোকে নানান বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে অসংখ্য স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। তাঁর লেখা, মতাদর্শ ও সংগঠন পদ্ধতিতে এমন অনেক কিছু রয়েছে যা হুবহু তাঁর পূর্ববর্তী ইসলামিক চিন্তাবিদদের মধ্যে পাওয়া যায়। একথা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। অন্যদের থেকে এসব নেয়া হয়েছে কিনা এ ব্যাপারটা তিনি এড়িয়ে গেছেন বললে অত্যুক্তি করা হবে না। এ দু'টো বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রীতিকর হলেও আমরা তাঁর সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছি যে, বিভিন্ন যুগের ইসলামিক চিন্তাবিদদের চিন্তাধারা ও মতামতকে নিজের করে, নিজের ভাষায় প্রকাশ করার প্রবণতার দরুনই মওলানা মওদুদী স্ববিরোধী

৫) জমাতে ইসলামী, মকসদে তারিখ।
৬) দৈনিক জংগ, ১৯৫২, ৩০শে অক্টোবর।

ইসলামিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দোষমুক্ত হতে পারেননি। আবার অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় স্বার্থসিদ্ধির জন্যও তিনি এধরনের প্রবণতার আশ্রয় নিয়েছেন।

মওদূদীর বৃটিশ প্রীতি

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হলেও ১৯৩৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের অধিবাসীদের সম্মিলিত ভূমিকাই প্রবল ছিল। মওলানা মুহাম্মদ আলী শওকত আলী, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এমনকি স্বয়ং কায়েদে আজমও কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। এ সম্মিলিত আন্দোলনের সময় মওলানা মওদূদী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না সত্য কিন্তু তার ভূমিকা ছিল অদ্ভুত ধরনের। তিনি মূল স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এসময়ও তিনি ইসলামের তথাকথিত দোহাই দিয়েই বিরোধিতা করতেন। তিনি সম্মিলিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা প্রসঙ্গে বলেন, ''বিশ্বের অন্যান্য জাতির মত আমাদের স্বাধীনতার অর্থও কি এই যে, বিজাতির শাসনমুক্ত হওয়া? স্বজাতি শাসন কিংবা স্বদেশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া কি আমাদের লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন? ……আমাদের সামনে তো শুধু একটি উদ্দেশ্য রয়েছে আর তা হলো আল্লার বান্দার আল্লাকে ছাড়া আর কারো অধীন না হওয়া। মানুষের সার্বভৌমত্ব অবসান হওয়া এবং আল্লাহ্ প্রেরিত ন্যায়নীতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া।''[৭]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে মওলানা মওদূদী যে পাক-ভারতের স্বাধীনতার নবীর বিরোধিতা করেছেন, একথা কারো চোখ এড়াবার কথা নয়। এখানে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে তিনি আল্লার হুকুমতের দোহাই দিয়ে পাক-ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বহাল থাকার সাফাই গেয়েছেন। ধীরে ধীরে তার স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধিতা আরো স্পষ্টরূপ ধারণ করে।

তিনি আরো বলেন, ''যে আজাদী জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য তার সমর্থনে সংগ্রাম করার কোনো অর্থ নেই। আমি তো একে ইংরেজের গোলামীর চাইতেও ঘৃণ্য মনে করি। আমাদের নিকট (এই আজাদী সংগ্রামের) পতাকাবাহীরা মুসলমানদের জন্য সে পর্যায়ভুক্ত যে পর্যায়ের ছিল ক্লাইভ ও ওয়েলেসলী। এবং তাদের সমর্থক মুসলমানরা কোন অবস্থায়ই মীর জাফর ও মীর সাদেক থেকে ভিন্নতর নয়। যদিও অবস্থা ও পরিস্থিতি ভিন্নতর নয়। যদিও অবস্থা ও পরিস্থিতির ভিন্নতা রয়েছে কিন্তু শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ধরনে কোনো ফারাক নেই।''[৮]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে মওলানা সে যুগের আজাদী সংগ্রামকে বৃটিশের গোলামীর চাইতেও ঘৃণ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। আজাদী পতাকাবাহীদের তিনি ক্লাইভ, ওয়েলেসলী, মীর জাফর, মীর সাদেক প্রমুখের সমগোত্রীয় বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি যে বিদেশী শক্তির খয়েরখাহ্ গিরি করলেন এটা মীর জাফরী হলো না।

এরূপে মওলানা মওদূদী বিশেষ ভঙ্গিতে পাক-ভারতের স্বাধীনতা ও

৭) সিয়াসী কাশমকাশ, ৩য় খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।
৮) সিয়াসী কাশমকাশ, ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরোধিতা করতে থাকেন। তাঁর এ প্রচারণার ফলে যদি হোক, অন্তত তিনটে দল খুবই খুশী হতেন। এরা হলেন ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার, বৃটিশ ব্যবসায়ীবৃন্দ, ভারতীয় পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও নবাব, জমিদার, স্যার, যারা ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব বিদায়ী না হোক আরো দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন।

মওলানা স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, "আজাদীর পূর্ণ সংগ্রাম যদি কেবলমাত্র এই জন্যই হয় যে রাজতন্ত্রের কোন মূর্তির পরিবর্তে কোন সরকারী প্রতিমা ঘরে স্থাপন হবে তবে তাতে মুসলমানদের নিকট বিশেষ কোন পার্থক্য বোধ হবে না। 'লাত' গেলো 'মানাত' আসলো। এক মিথ্যা দেব আর এক মিথ্যা দেবের স্থান দখল করলো। বাতিলের পূজা যেমন ছিল তেমনই রইলো। কোন্ মুসলমান এটাকে আজাদী বলবে?"[১]

সমগ্র বৃটিশ ভারত যখন আজাদী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাদের জন্মগত ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তখন মওলানা আজাদীর বিরুদ্ধে তাঁর উদ্ভাবিত 'বিশেষ ইসলামিক দর্শন' প্রকাশ করে বসলেন। তাঁর মতে জনগণ নির্বাচিত স্বাধীন সার্বভৌম সরকার আর বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের মধ্যে নাকি কোনো পার্থক্য নেই। তিনি রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা-পরাধীনতা, শোষক-শোষিত ও ন্যায়-অন্যায়কে একই কাঠগড়ায় নিয়ে দাঁড় করালেন। কী চমৎকার ইসলামিক ব্যাখ্যা! সত্যিই কি ইসলাম তাই বলে?

মওলানা অন্যত্র বলেছেন, "...ইসলামের এই মতবাদ অনুযায়ী ভাল সরকারের জাতীয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারসম্পন্ন হওয়া নয় এবং খারাপ সরকারের নিকৃষ্ট বিদেশী কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারহীন হওয়া নয়। আসল প্রশ্ন হলো সরকারের ব্যবস্থাপনা ইসলাম ও সত্যনীতি ভিত্তিক কিনা......।"

বাহ্যত মওলানার উপরোক্ত উক্তি খুব একটা দোষণীয় নয়। কিন্তু যে সময় ও পরিস্থিতিতে এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত মন্তব্য করেছিলেন সেদিক থেকে এটা খুবই মারাত্মক। সে সময় একটা বিদেশী শক্তি এদেশ শাসন ও শোষণ করতো। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার জন্য সমগ্র পাক-ভারতে প্রবল আন্দোলন চলছিল। দু'চারজন স্বার্থান্ধ ছাড়া হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মুক্তিকামী নাগরিক এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এ সংগ্রামের মূলনীতি ছিল প্রতিটি জাতির নিজেদের দেশ পরিচালনার অধিকার রয়েছে। সুতরাং এদেশবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দিতে হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে মওলানা বললেন, "ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো সরকারের ভাল বা মন্দ হওয়া জাতীয় ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পন্ন হওয়া নয়।' তাঁর এ উক্তি যে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার সহায়ক ছিল তা আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

বৃটিশ প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বলেছেন, "ইসলামের দৃষ্টিতে ইংরেজ এবং ভারতবাসী উভয়েই মানুষ। সে উভয়কেই নিজের আহবানে সম্বোধন করে। ইংরেজের সাথে ইসলামের এজন্য দ্বন্দ্ব নয় যে সে এক দেশের বাসিন্দা হয়ে অন্য দেশ কেন শাসন করছে, বরং এই জন্য যে সে খোদার সার্বভৌমত্ব এবং আইন-কানুন কেন স্বীকার করছে না......।"

---

১) সিয়াসী কাশমকাশ, ৩য় খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

এখানেও তিনি ইসলামের ছদ্মাবরণে ঘোলাপানিতে মাছ শিকার করতে চেয়েছেন। এদেশবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে উপেক্ষা করে বৃটিশ প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন।

মওলানা মওদুদী আরো বলেছেন, ''যদি আপনার ইংরেজের সাথে শত্রুতা এজন্য যে, সে ইংরেজ, ছ'হাজার মাইল দূর থেকে এসেছে, আপনার দেশের বাশিন্দা নয়, তবে আপনার এ শত্রুতা ইসলামিক শত্রুতা নয়—অজ্ঞতা প্রসূত শত্রুতা।'' ১০

চিন্তা করুন, মওলানা মওদুদী সে আমলে ইংরেজ প্রীতিতে কিরূপ মোহান্ধ হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় তিনি এভাবেই নিরলসভাবে ইংরেজের সমর্থনে লেখনী চালিয়েছেন। এ ধরনের অসংখ্য উদ্বৃতি তাঁর সে আমলের রচনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পাওয়া যাবে। এখানে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হলো।

হায়দরাবাদে নিজামের সমর্থনে মওলানা মওদুদীর ইসলামকে ব্যবহার করার কিছুটা যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ নিজাম ছিলেন মুসলমান। হয়তো মওলানা সাম্প্রদায়িক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিলো তার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এক্ষেত্রে একদিকে বৃটিশ স্বার্থ অপর দিকে দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন। ভারত স্বাধীন হলে মুসলমানরাও স্বাধীন হবে। একথাটা তখন একজন সাধারণ মানুষের নিকটও অবোধ্য ছিলো না। এমতাবস্থায় কেন মওলানা বৃটিশ প্রীতির এরূপ পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। এব্যাপারে তিনি ইসলামকেও পুরোপুরি ব্যবহার করেছিলেন। ব্যাপারটা সত্যি ভাববার বিষয়।

সম্ভবত মওলানা মওদুদী তাঁর প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শনকারী একশ্রেণীর পদস্থ মুসলিম সরকারী কর্মচারীর গুণভাজন হওয়ার জন্যই সে আমলে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার সহায়ক এ সব ইসলামিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতেন। এছাড়া এর পিছনে কোন যৌক্তিকতা আমরা খুঁজে পাই না। কারণ দেশের আজাদী যখন অত্যাসন্ন তখনো এক শ্রেণীর মুসলিম সরকারী অফিসার তাদের বিদেশী প্রভুদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য বলে বেড়াতেন মুসলমানদের স্বার্থেই এদেশে বৃটিশের আরো কিছু দিন থাকা দরকার। কেননা বর্তমানে প্রশাসনযন্ত্রে মুসলমানরা তাদের ন্যায্য অধিকার লাভ করে চলছে। বৃটিশ আরো কিছু দিন এদেশে থাকলে মুসলমানরা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যাবে। তাতে করে হিন্দুদের সাথে কুলিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। মওলানা মওদুদী সে আমলে এসব অফিসারের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো বলে জানা যায়। এরপর, এমনকি স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পর্যন্ত তাঁর এ নীতি অব্যাহত ছিলো। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনে এ প্রচার অভিযান চালিয়েছেন।

কংগ্রেস ও মওদুদী

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষের দিকে মওলানা মওদুদী হায়দরাবাদ থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসেন। এখানে পাঠানকোটে মওলবী নিয়াজ আলী নামক

১০) সিয়াসী কাশমকাশ, ১ম খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা।

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত এসডিও একটি ক্ষুদে মুসলিম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর নাম দেয়া হয়েছিলো ''দারুল ইসলাম।'' পাঞ্জাবে আসার পর এই দারুল ইসলামেই মওলানা অবস্থান করেন। মওলানা কেন হায়দরাবাদ ছেড়েছিলেন এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। সেখানকার শাসকগোষ্ঠীর সাথে তাঁর মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো কিনা, এরূপ কোনো তথ্যও জানা যায় না। অবশ্য পাঞ্জাবে আসার পর তাঁর মতাদর্শে মৌলিক কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। হায়দরাবাদে তিনি ওপর ওয়ালাদের ছত্রছায়ায় ছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজতন্ত্র সমর্থন করেছেন। ইসলামের 'বিশেষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ' দ্বারা রাজতন্ত্রের বৈধতা প্রমাণ করেছেন। বলেছেন, 'জনগণের সরকার জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য—মুসলমান হিসেবে আমি এ নীতিতে বিশ্বাসী নই।' পাঞ্জাবে তাঁর 'ইসলাম প্রচারধারা' (?) পূর্বের মতই ছিলো। তবে লক্ষ্য ছিলো ভিন্ন। এখানে তিনি বৃটিশ স্বার্থ রক্ষায় ইসলামকে ব্যবহার করতেন। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। জানা যায়, তৎকালীন ভারত সরকারের মুসলিম পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা মওলানাকে পাঠানকোটে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এ আমন্ত্রণ রক্ষার্থেই নাকি তিনি এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এখান থেকেই ১৯৩৮ সালে পুনরায় 'তরজমানুল কোরআন' বের করা শুরু করেন।

সে যাই হোক, মওলানা মওদুদীর এ সময়কার রচনাবলীর প্রতি তাকালে দেখা যায় তিনি বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার্থে দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় পার্টিরই বিরোধিতা করেছেন। মুসলিম লীগ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। কংগ্রেসের উপর আক্রমণকালে তিনি মুসলিম জাতীয়তা ও মুসলমানদের স্বার্থগত দিকের আশ্রয় নিতেন। কংগ্রেসের বিরোধিতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ''তাদের প্রথম আক্রমণ হল ইসলামী জাতীয়তার উপর। তারা মুসলমানদের বলে, মূলত তোমরা কোনো জাতিই নও। এটা শুধু বৃটিশ সম্রাজ্যবাদীদের প্রবঞ্চনা এবং গুটিকতক সম্রাজ্যবাদী এজেন্টের প্রচারণা বই কিছু নয়।'' ১১

''.....অনুরূপ এই আন্দোলন আমাদের জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর সাথে শরিক হওয়ার অর্থ আমাদের নিজেদের জাতীয়তা ও তাহজিব-তমদ্দুন নিশ্চিহ্ন করায় অংশ গ্রহণ করা।...১২

পণ্ডিত নেহরুর প্রতি আক্রমণ করে মওলানা বলেছেন, ''পণ্ডিতজী একথা ভাল করেই জানেন যে, জ্ঞানী মুসলমান যাদের ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনা আছে, যাদের মধ্যে নিজস্ব জাতীয় অনুভূতি পুরোপুরি রয়েছে এবং যারা নিজেদের তাহজিবকে সবচাইতে মূল্যবান মনে করে, তারা ইসলাম জাতীয়তা পরিত্যাগ করে ভারতীয় জাতীয়তায় নিজেদের মিশিয়ে ফেলা কেয়ামত পর্যন্ত গ্রহণ করতে সম্মত হবে না। তাদের পক্ষে এরূপ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার...।'' ১৩

''মার্কসের শ্লোগান ছিলো বিশ্বের সকল শ্রমিক এক হয়ে যাও। তাঁর শিক্ষা ছিলো কম্যুনিজম মনোভাবাপন্ন লোক যেখানেই থাকুক না কেন, তারা সবাই

---

১১) সিয়াসী কাশমকাশ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।
১২) সিয়াসী কাশমকাশ, প্রথম খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা।
১৩) সিয়াসী কাশমকাশ, ২য় খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

একই দলভূক্ত।.......কম্যুনিষ্ট হিসেবে পণ্ডিত নেহরুও এ মতবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু তবু তিনি ইসলামী জাতীয়তার সমালোচনা করেন। অথচ ইসলামী জাতীয়তাও উপরোক্ত নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত...।''১৪

মওলানা মওদুদীর উল্লিখিত উদ্ধৃতি দেখে অনেকের মনে এরূপ ধারণার উদয় হতে পারে যে, তিনি বোধ হয় পাকিস্তান আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব উক্তি করেছেন। আসলে কিন্তু তা নয়।

তাঁর এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য পাক-ভারতীয় মুসলিম স্বার্থরক্ষা ছিলো না। তিনি বিদেশী প্রভুদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এসব যুক্তির অবতারণা করেছিলেন।

কংগ্রেসের বিরোধিতা প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র বলেছেন, ''মুসলমানদের পক্ষে দেশের এরূপ স্বাধীনতা সংগ্রাম করা হারাম যার পরিণামে ইউরোপীয় অমুসলিমদের হাত থেকে ক্ষমতা ভারতীয় অমুসলিমদের নিকট হস্তান্তরিত হবে।'' ১৫

এরূপে তিনি কংগ্রেসের চরম বিরোধিতা করেছেন। অবশ্য এ কালে তিনি কংগ্রেসের সমর্থক জমিয়তে ওলামা হিন্দের মুখপত্র 'আলজমিয়তের' সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সে যাইহোক, পাক-ভারতীয় মুসলিম স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করেননি, একথা বলা অসঙ্গত নয়। তিনি বৃটিশ প্রভু ও তাদের এদেশীয় সমর্থকদের সন্তুষ্ট করার জন্যই কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছিলেন। কেননা সে আমলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ছাড়া যে কয়টি অঙ্গদল ছিলো তারা কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ এদুটোর কোন একটার সমর্থক ছিলো। কিন্তু মওলানা মওদুদী কোনটারই সমর্থক ছিলেন না। এমনকি তখন তাঁর নিজেরও কোন রাজনৈতিক দল ছিলো না।

পাকিস্তান আন্দোলন ও মওদুদী

১৯৩৬ সালে বৃটিশকে সরকার পরিচালনার বেশ কিছু ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। সেবার দেশের সব কয়টি প্রদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে কংগ্রেস অধিকাংশ প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনে আশাতীত কামিয়াবীর পর কংগ্রেসী নেতারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। এ সময়ই মাদ্রাজের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন, ''ভারতে দু'টি মাত্র দল রয়েছে—একটি কংগ্রেস অপরটি ইংরেজ সরকার।'' নির্বাচনের পর অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তারা মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে। অপর দিকে যে কয়টি প্রদেশে মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয় সেখানে কংগ্রেস শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা মুসলিম লীগ সরকারকে শান্তিতে বসতে দেয়নি। তাতে মুসলিম ভারতে চরম হতাশার করাল ছায়া নেমে আসে। তারা কায়েদে আজমের নেতৃত্বে সংহত হতে আরম্ভ করে।

১৯৩৬ সালের নির্বাচনোত্তর কালে মুসলমানদের এরূপ অসহায় ও হতাশ

১৪) সিয়াসী কাশমকাশ, ২য় খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা।
১৫) সিয়াসী কাশমকাশ, প্রথম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা।

অবস্থা দেখে মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন, "....চরম ব্যর্থতার দরুন মুসলমানরা সত্যি যদি এরূপ মনে করে যে, তারা বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে, ইংরেজ ক্ষমতার সহায়তা কিংবা কংগ্রেসের প্রবোধ ছাড়া তাদের নিরাপত্তার বিকল্প কোন পথ নেই এবং তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরতার এতটুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গও নেই যা তাদের শীতল ধমনীকে গরম করবে, তা হলে আমি বলবো, এরূপ জীবিত শবদেহগুলো যেখানে আছে সেখানে পড়ে থাকাই তাদের জন্য শ্রেয়। তাদের ইংরেজ কিংবা কংগ্রেস কারো দিকেই তাকানো উচিত নয়। তারা যেন আত্মবিশ্বাসের সাথে ভবিষ্যৎ ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করে.....।"

কায়েদে আজমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। কিন্তু মওলানা মওদুদী কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগে যোগদান করলেন না। জোরদার লেখনীর মাধ্যমে মওলানা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় রাজনৈতিক পার্টিরই বিরোধিতা করে যেতে লাগলেন। তিনি উভয় পার্টিকেই ইসলাম বিরোধী, ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু ইত্যাকার বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর এসব বলার পেছনে একই নীতি কার্যকর ছিলো। অর্থাৎ বিদেশী প্রভূ ও তাদের সমর্থকদের সন্তুষ্ট করা। নতুবা অন্তত মুসলিম লীগের বিরোধিতার আর কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে, আমাদের বুঝে আসে না। কারণ তিনি যদি সত্যি আন্তরিকভাবে পাক-ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণকামী ও তাদের স্বাতন্ত্র্যে অনুপ্রাণিত হতেন তবে নিশ্চয়ই মুসলিম লীগে যোগদান করতেন। এমনকি তখনো পর্যন্ত তিনি নিজেও কোন রাজনৈতিক দল গঠন করেননি। এ সময় তিনি পরিস্কার ঘোষণা করেছিলেন, "এই জাতি প্রথম থেকেই একটি জমিয়ত বা সংঘ। এ সংঘের ভিতর কোন পৃথক সংঘ পৃথক নামে গঠন করা, মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ নিদর্শন কিংবা বিশেষ কোন নাম বা নীতির দ্বারা প্রভেদ সৃষ্টি করা এবং মুসলমানদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে দল-উপদলগত কোন্দল সৃষ্টি করা মূলত মুসলমানদের সুদৃঢ় করা নয়, এতে তাদের আরো দুর্বল করে দেয়া।"[১৬]

মওলানার উপরোক্ত উক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সত্যি আমাদের হাসি পায়। হাসি পায় এজন্য যে পাকিস্তান আন্দোলনকারীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে কি করে তিনি দিবালোকের মত স্পষ্ট ইতিহাসকে বিকৃত করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। সে আমল তো দূরের কথা, আজকের একজন স্কুল ছাত্রও জানে যে, কায়েদে আজমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সংগঠিত হওয়ার পূর্বে পাক-ভারতীয় মুসলমানরা সুসংহত ছিলো না। তারা ছিলো শতধাবিচ্ছিন্ন। আর এই দুর্বলতার দরুন তারা হিন্দু ও ইংরেজের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিলো। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী চাকরি-বাকরি শিক্ষা-দিক্ষা সকল ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো। বস্তুত কায়দে আজমের নেতৃত্বে সুসংহত হওয়ার পর থেকেই তারা নিজেদের অধিকার আদায় করণে সক্ষম হচ্ছিলো। অথচ মওলানা মওদুদী কিনা বললেন, পাক-ভারতীয় মুসলমানরা এমনিই সংঘবদ্ধ। নতুন নাম দিয়ে মানে "মুসলিম লীগ" নামে রাজনৈতিক দল গঠন করার অর্থ মুসলমানদের দুর্বল করে দেয়া। স্বয়ং মওলানার পরবর্তীকালের একটি

(১৬) 'পয়গামে হক, ১৯৩৮, ফেব্রুয়ারী সংখ্যা।

উদ্ধৃতির প্রতি তাকালেই তাঁর পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতিটির অবাস্তবতা অনুধাবন করা যায়।

মওলানা বলেছেন, ''সারকথা, এই নামগড়া মুসলিম সমাজে অনুসন্ধান করলে রংবেরং-এর মুসলমান আপনার নজরে পড়বে। এতো ধরনের মুসলমান দেখতে পাবেন যা আপনি শুনে শেষ করতে পারবেন না। এটা একটা চিড়িয়াখানা, যাতে চিল, শকুনি, তিতির, ভারই এবং আরো অনেক প্রকার প্রাণী রয়েছে। এদের সবাই পাখী, কেননা তারা চিড়িয়াখানায় রয়েছে।''১৭

মওলানা তাঁর উদ্ধৃতিতে পরিষ্কার স্বীকার করেছেন যে, পাক-ভারতীয় মুসলমানরা সে আমলে সংঘবদ্ধ ছিলো না। মূলত তিনি যখন প্রথম বিবৃতিটি দেন তখন বেশ ভাল করেই জানতেন পাক-ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একতা নেই। একমাত্র মুসলিম লীগের মাধ্যমেই তারা একটা সুসংহত জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। মুসলিম লীগের বিরোধিতার নেশায়ই তিনি সত্যের অপলাপ করেছিলেন।

সম্ভবতঃ ১৯৩৯ সালের দিকে মওলানা মওদুদী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কঠোর সমালোচনা করে লিখেছেন, ''মুসলমান নিরেট অজ্ঞ হবে যদি এখনো তারা পরিস্থিতির নাজুকতা যথাযথ উপলব্ধি করতে না পারে। তারা এখনো এই ধোকায় পড়ে রয়েছে যে, বাহ্যাড়ম্বর সভাসমিতি এবং ফাঁপা শোভাযাত্রা তাদের জাতীয় ধ্বংস থেকে রক্ষা করবে। তারা এমন লোকদের নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করেছে যাদের সামনে মন্ত্রিত্ব এবং ঐশ্বর্য ছাড়া আর কোন জিনিস নেই। যারা জাতির জন্য এতটুকু ক্ষতি স্বীকার করতে পারবে না। যারা কেবলমাত্র মন্ত্রিসভায় নিজেদের দখল টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলমানদের সুবিধার নাম উচ্চস্বরে নিচ্ছে। এবং যাদের ভীরুতা সম্পর্কে শত্রুদের পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে।....''১৮

সম্ভবত মওদুদী সাহেব এ সময়ে এরূপ ধারণা করেছিলেন যে, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দ্বারা কিছুই হবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের হাতে জাতির তরী ডুববে বই ভাসবে না। এমনকি ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পাশ হওয়ার ঘটনাও তাঁর মধ্যে কোনরূপ রেখাপাত করেনি। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ যখন মুসলিম জাতীয়তা, মুসলিম তাহজীব-তমদ্দুন, মুসলিম রাষ্ট্র ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে আরম্ভ করলেন এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে যখন পাক-ভারতের আকাশ-বাতাস নিনাদিত হয়ে উঠলো, মওলানা তখন এসব অনৈসলামিক বলে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। অর্থাৎ কায়েদে আজম ও তাঁর সহকর্মীরা ইসলাম সম্পর্কে যা বলেন এসব ইসলামে নেই কিংবা তাঁদের এসব প্রচারণা মাত্র। তিনি কিনা যা বলেন সেটাই খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলাম। অত্যন্ত জোরেশোরে তাঁর খাঁটি ইসলামের দিকে মুসলমানদের আহবান করতে লাগলেন। খাঁটি আর ভেজাল ইসলামের প্রচারণায় তিনি এক চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেন। এই পরিস্থিতিটা মওলানার লেখা থেকে কিছুটা অনুমান করা যাবে।

তিনি তাঁর রাজনৈতিক পুস্তক 'সিয়াসী কাশমকাশ' তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, ''.....আমার নিকট এই পরিস্থিতি ভয়াবহতার দিক থেকে দেশীয় জাতীয়তা আন্দোলনের চাইতে কম নয়। ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের নেতৃত্বে ভারতের মুসলমানরা যদি একটি বিধর্মী জাতির মত নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

(১৭) সিয়াসী কাশমকাশ, ৩য় খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।
(১৮) সিয়াসী কাশমকাশ, ২য় খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা।

টিকিয়েও রাখে (যেমন তুর্কী ও ইরানীরা রেখেছে), তবে তাদের এরূপ জীবিত থাকা এবং কোনো অমুসলিম জাতীয়তা মিশে যাওয়াতে কী পার্থক্য আছে? হীরা যদি তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বসে তবে হতভাগা পাথর হয়ে পড়ে থাকুক কিংবা বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে মিশে যাক জহরীর তাতে কী আকর্ষণ থাকতে পারে?''

সে আমলে এরূপ কঠোর ভাষায় তিনি আজাদী সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছেন। আর একস্থানে লিখেছেন ''....এই জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের জন্য আপনাদের ইসলামের নাম ব্যবহার করার অধিকার নেই। কেননা, ইসলাম সকল প্রকার জাতীয়তাবাদের শত্রু। সেটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদই হোক কিংবা নামগড়া মুসলিম জাতীয়তাবাদই হোক।''

একথা বলাই বাহুল্য যে, আজাদী সংগ্রামকালে কায়েদে আজমের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরোধিতা করার অর্থ ছিলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা, কারণ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই ছিলো কায়েদে আজম ও তাঁর সহযোগীদের ঈপ্সিত লক্ষ্য। বস্তুত সে আমলে যারা তাদের বিরোধিতা করেছেন তারাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় পঞ্চমুখ ছিলেন। মওলানা মওদুদীও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও পাকিস্তান দাবীর বিরোধিতায় তিনি তাঁর জোরদার লেখনীর ব্যবহারে এতটুকু কসুর করেননি। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে ইসলামকে তিনি একটা প্রবল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মুসসলিম লীগ ও তাঁর নেতৃবৃন্দকে তিনি ইসলামের শত্রু আখ্যায়িত করেছেন। 'খোড়া পাকিস্তান, 'না-পাকিস্তান' ইত্যাকার আরো কত কি বলা হয়েছে। এসব গালিগালাজ ও ইসলামিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উদ্বৃত করতেই কয়েক হাজার পৃষ্ঠার দরকার। সে যাইহোক, আমরা এখানে আরো কয়েকটি উদ্বৃতি উল্লেখ করছি।

মুসলিম লীগ সম্পর্কে মওলানা বলেছেন, ''....কেবল মাত্র মুসলমান শব্দ দ্বারা প্রতারিত হয়ে যারা অজ্ঞতার পূজারীদের সংস্থাকে একটা সংস্থা মনে করে এবং একথা ভাবে যে, এধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান ইসলামের দৃষ্টিতে কল্যাণকর হবে, তাদের স্থূলবুদ্ধি শোকজ্ঞাপন যোগ্য।''১৯

''...যে মসজিদের বুনিয়াদ ন্যায়-নিষ্ঠার উপর নয়, কোরআন সেখানে দাঁড়ানোর অনুমতি দেয় না। এখানে তো ন্যায়-নিষ্ঠাকে মস্তিষ্কের বিকৃতি মনে করা হয়।''২০

''এ ব্যাপারেও আমার কোনো কিছু বলার নেই যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলিম লীগের ''মুসলমান নাম'' ধারণনীতি এই জাতি যারা হিন্দুস্তানে বাস করে তাদের জন্য কল্যাণকর হবে, না ক্ষতিকর হবে। আমার নিকট যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এ সময় যে জাতিকে মুসলমান নামে ডাকার দরুন পৃথিবীতে ইসলামের প্রতিনিধি মনে করা হয় তার সব চাইতে বড় প্রতিষ্ঠান ইসলামকে বিশ্ববাসীর সামনে কিরূপে পেশ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলিম লীগের প্রস্তাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমার অন্তর কাঁদতে আরম্ভ করে।''২১

---

(১৯) সিয়াসী কাশমকাশ, তৃতীয় খণ্ড।
(২০) পূর্বানুরূপ।
(২১) পূর্বানুরূপ।

মওলানা মওদুদী যে আমলে মুসলিম লীগ সম্পর্কে এসব উক্তি করেছিলেন তখন দু'চারজন কংগ্রেস-সমর্থক ছাড়া পাক-ভারতের সকল মুসলমানই লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। যেসব মুসলিম নেতা কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন তাদের সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার নেই। কারণ তারা ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য একথা সত্য যে তাঁরাও পাক-ভারতের স্বাধীনতাকামী ছিলেন। এ জন্য তাঁরা সংগ্রাম করেছেন। জেল খেটেছেন। কিন্তু তারা মওলানা মওদুদীর মতো ইসলামের ছদ্মাবরণে বিদেশী শক্তির স্বার্থ রক্ষার ভূমিকা পালন করেননি। নানা ছলছুতার আশ্রয়ে মুসলমানদের আজাদী সংগ্রাম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেননি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকারী নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে মওলানা বলেছেন, ''এই সংস্থায় যাদের প্রথম সারিতে দেখা যাচ্ছে ইসলামী জমাতে তাদের সঠিক স্থান সবচেয়ে পিছনের সারিতে। এমন কি কেউ কেউ তা সেখানেও অনুগ্রহেই স্থান পেতে পারে। এ ধরনের লোকদের নেতা বানান রেলগাড়ীর সবচেয়ে পিছনের বগীকে ইঞ্জিনের স্থানে লাগিয়ে দেয়ার সমতুল্য। যে উঁচুস্থানে আপনারা যাওয়ার ইচ্ছে করছেন এ নামমাত্র ইঞ্জিন আপনাদের গাড়ীকে এক ইঞ্চিও নিয়ে যেতে পারবে না। অবশ্য গাড়ী তার আপন গতিতে নিচের দিকে চলে আসবে। এবং আপনারা কিছুকাল পর্যন্ত এ ভুল ধারণায় পড়ে থাকবেন যে, মাশাআল্লাহ্, আমাদের 'ইঞ্জিন' গাড়ীকে খুব উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ বাস্তব যত তাড়াতাড়ি অনুধাবন করতে পারবেন ততই মঙ্গল। কেননা প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাচ্ছে। সে আপনাদের উপরের পরিবর্তে নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে.....।''২২

মওলানা আরো বলেছেন, ''তাঁদের উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি, নেতৃত্ব এমনকি আন্তরিক অবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। অনেক লোকের অর্ন্তদৃষ্টিহীনতার দরুন এসব গলদ অনুভবই হয় না।''২৩

সত্যি মওলানা মওদুদী অর্ন্তদৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়। তিনি অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, কায়েদে আজম, কায়েদে মিল্লাত প্রমূখ নেতার উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ও নেতৃত্ব সবই ছিলো ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু অন্যরা অর্ন্তদৃষ্টির অভাবে তা অনুভব করতে পারেনি। অর্ন্তদৃষ্টিহীন কে ছিলো, মওলানা মওদুদী, না অন্যরা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মওলানা এ বিষয়টা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পেরেছেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার প্রসঙ্গে মওলানা মওদুদী আরো বলেছেন, ''কিন্তু দুঃখের বিষয়, লীগের কায়েদে আজম থেকে আরম্ভ করে ছোটখাটো অনুসারী পর্যন্ত এমন একজনও নেই যে ইসলাম ভাবাপন্ন ও ইসলামী ধ্যান-ধারণার অধিকারী। এবং বিভিন্ন বিষয়কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিবেচনা করেন। তারা মুসলমান শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য এবং তার বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানও বিশ্বের অন্যান্য জাতির ন্যায় একটা জাতি। তারা মনে করে, যেকোন রাজনৈতিক চাল ও হিলা-তদবীর দ্বারা এজাতির স্বার্থ রক্ষা করাই ইসলামী রাজনীতি। মূলতঃ এধরনের নিম্নমানের

(২২) সিয়াসী কাশমকাশ, তৃতীয় খণ্ড।
(২৩) সিয়াসী কাশমকাশ, তৃতীয় খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

রাজনীতিকে ইসলামী রাজনীতি বলা ইসলামের প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা খর্ব করার চাইতে কম নয়।''২৪

উল্লিখিত উদ্বৃতিতে কায়েদে আজম থেকে আরম্ভ করে পাকিস্তান আন্দোলনকারী সাধারণ কমিটি পর্যন্ত তাঁর গালিগালাজ থেকে রেহাই পাননি। তিনি বলেছেন, তারা কেউই নাকি ইসলামিক ভাবাপন্ন ছিলো না। কোন বিষয়ই তাঁরা ইসলামের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করতেন না। এমনকি তাঁরা মুসলমান শব্দের অর্থও জানতেন না। অথচ আমরা জানি পাক-ভারতের অধিকাংশ আমলেই সে যুগে পাকিস্তানী দাবী সমর্থন করতেন।

মওলানা মওদুদী কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষিতদেরই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ইত্যাকার বলে গালিগালাজ করেননি। সে আমলে পাক-ভারতের প্রখ্যাত ও সর্বজনমান্য পাকিস্তান দাবী সমর্থক আলেমরাও তার এসব অশালীন সমালোচনা থেকে অব্যাহতি পাননি।

তিনি একস্থানে বলেছেন, ''পাশ্চাত্য ধরণের নেতাদের সম্পর্কে তো তেমন আশ্চর্যবোধ হওয়ার নয়; কারণ বেচারাদের কোরআনের আলো-বাতাসও লাগেনি কিন্তু আশ্চর্য লাগে এবং হাজার বার লাগে সেসব আলেমদের ব্যাপারে, যাদের দিবারাতের কাজই হলো 'আল্লাহ্ বলেছেন' ও 'রাসুল বলেছেন' (কোরআন-হাদিস পড়ান)। বুঝে আসে না তাদের কি হয়ে গেছে।''২৫

উপরোক্ত উদ্বৃতিতে মনে হয় মওলানা মওদুদী একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, পাশ্চাত্য ধরনের নেতৃবৃন্দ যাদের কোরআন সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান নেই, তারা না হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করলো, তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু পাক-ভারতের যে সব আলেম সব সময় কোরআন-হাদিস অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত তাঁদের এ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তাঁরা তো জানেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা তথা মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবী কোরআন-হাদিস বিরোধী। জেনেশুনে কেন এসব আলেম কোরআন-হাদিস বিরোধী একটা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের এই অনৈসলামিক ভূমিকার কথা ভাবলে সত্যি আমার আশ্চর্য বোধ হয়।

মওলানা কেবলমাত্র মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান দাবীর সমর্থক নেতৃবৃন্দ ও আলেম-ওলামার সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি সাধারণ মুসলমানদেরও তীব্র ভাবে আক্রমণ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ''একটি জাতির প্রতিটি ব্যক্তিকে শুধুমাত্র এজন্য যে তারা বংশগত মুসলমান, সত্যিকার অর্থে মুসলমান গণ্য করা এবং এরূপ আশা পোষণ করা, তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় যে কাজই হবে তা ইসলামী নীতি মোতাবেকই হবে—প্রথম এবং মৌলিক ভুল। এই বিরাট দল যাদের মুসলিম জাতি বা সম্প্রদায় বলা হয় তাদের অবস্থা এরূপ যে, প্রতি হাজারে নয় শ' নিরানব্বুই জনই ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে জানে না, তাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিক ধ্যান-ধারণাও ইসলাম মোতাবেক পরিবর্তিত হয়নি।...২৬

(২৪) সিয়াসী কাশমকাশ, ২য় খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।
(২৫) সিয়াসী কাশমকাশ, তৃতীয় খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।
(২৬) সিয়াসী কাশমকাশ, তৃতীয় খণ্ড।

তিনি পাকিস্তান দাবীর বিরোধীতা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''কেবলমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু এ আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে একটি খাঁটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এরূপ আশা খুবই ক্ষীণ। কেননা, খাঁটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যে নৈতিক বিপ্লবের উপর নির্ভরশীল তা পাকিস্তান আন্দোলনের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে না।''২৭

''যারা এরূপ ধারণা করেছে যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠদের করায়ত্তমুক্ত হোক, এবং এখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক, তাদের এ ধারণা ভুল। মূলতঃ এর পরিণামে যা কিছু অর্জিত হবে তা শুধু মুসলমানদের কাফেরী রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠিত হবে। এর নাম আল্লাহ্‌র রাষ্ট্র রাখা, এই পবিত্র নামের অপমান করা বই কিছু নয়।'' ....এরূপ অবস্থায় সে ব্যক্তি কি অজ্ঞ (নাদান) নয় যে ইসলামিক বিপ্লবের পরিকল্পনা সামনে রেখে এমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে যা বিধর্মী রাষ্ট্রের চাইতেও অধিক এর লক্ষ্যপথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াঁবে।''২৮

জমাতে ইসলামী

মওলানা মওদুদী ইসলামের ছদ্মাবরণে পাক-ভারেতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলন, এর নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে এতোসব বিষোদ্‌গার করেও যখন দেখলেন কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করছে না তখন তিনি একটি নতুন পরিকল্পনা নিলেন। সম্ভবত বৃটিশভক্ত পদস্থ মুসলিম সরকারী কর্মচারীরাই তাঁকে পরিকল্পনাটি নেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি একটি রাজনৈতিক পার্টি গঠনের মনস্থ করলেন। অথচ ইতিপূর্বে তিনি একাধিকবার বলেছিলেন 'ইসলাম' বা 'মুসলিম' নাম দিয়ে নতুন কোনো সংস্থা গঠন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ পাক-ভারতীয় মুসলমানরা এমনিতেই সংঘবদ্ধ। সে যাইহোক, পার্টি গঠন করার কয়েক বছর পূর্ব থেকে তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করলেন এদেশে সত্যিকার ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য একটি সালেহ্ বা ন্যায়নিষ্ঠ দলের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ''একথা স্পষ্ট, কোনো অমুসলিম মিষ্টার জিন্নার ১৪ কিংবা ২৪ দফার বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। মুসলিম লীগ, আহ্‌রার পার্টি কিংবা জমিয়তে ওলামার প্রস্তাবাবলীতেও এমন কোন জিনিষ নেই যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। কেউ যদি বিশ্বাস স্থাপন করে তবে একমাত্র 'কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লা'র উপরই করতে পারে। তবে শর্ত হলো একটি জমাত হতে হবে যে এই কলেমার জন্য বাঁচতে ও মরতে প্রস্তুত। কিন্তু সে কোথায়?''২৯

মওলানা মওদুদী তাঁর সিয়াসী কাশমকাশ গ্রন্থে ''একটি ন্যায়নিষ্ঠ জমাতের প্রয়োজন'' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলেছেন, ''এই কাজের (হকুমতে ইলাহী প্রতিষ্ঠার) জন্য একটি প্রবল সমালোচনামুখর, ধ্বংসাত্মক ও সংগঠিত আন্দোলনের

(২৭) রেসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড।
(২৮) মওজুদা মুসলমান আওর সিয়াসী কাশমকাশ, তৃতীয় খণ্ড।
(২৯) সিয়াসী কাশমকাশ, ৩য় খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

প্রয়োজন যা একদিকে জ্ঞান-গরিমার শক্তি দ্বারা পুরনো সভ্যতার বুনিয়াদ উড়িয়ে দেবে এবং অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে নিজের বিশেষ চিন্তাধারার বুনিয়াদের উপর নতুন করে গড়ে তুলবে। এমনভাবে করতে হবে যাতে চিন্তা জগৎ পুরোপুরি প্রভাবান্বিত হয় এবং মানুষ এই পদ্ধতিতে চিন্তাভাবনা ও অনুভব করতে আরম্ভ করে।''৩০

উপরোক্ত উদ্বৃতিতে বাহ্যত মওলানা খুব ভাল কথাই বলেছেন। জাতিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যই কায়েদে আজম মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আভাসভূমির দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু মওলানা ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। তবে তিনি কিভাবে কোথায় এধরনের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। সম্ভবত তিনি বিদেশী প্রভুদের ছত্রছায়ায় থেকে এধরনের কিছু একটার কল্পনা করেছিলেন। এজন্যই পাক-ভারতের মুসলমানরা তাঁর এই কল্পনার রথের প্রতি মোটেও ফিরে তাকায়নি। আসলে এসব তাঁর বাকচাতুরী ছাড়া কিছুই ছিলো না। তিনি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীকে নস্যাৎ করার হীন উদ্দেশ্য নিয়েই এসব নীতি কথা বলেছেন।

সে যাইহোক, মওলানা মওদুদীর ১৯৪১ সালের ২৫শে আগস্ট 'জমাতে ইসলামী' গঠন করা হয়। 'জমাতে ইসলামী' নামটিও তিনি অন্যের থেকে ধার করে নিয়েছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর পাক-ভারতের যেসব মুসলমান যুবক ইউরোপে গিয়েছিলো তারা নাজিবাদ কিংবা সমাজতন্ত্রের শিকার হয়ে দেশে ফিরতো। দিল্লীর আব্দুল জব্বার ও আব্দুস সাত্তার খায়রী ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন ইউরোপ ফেরত যুবকদের অন্যতম। তাঁরা দেশে ফিরে 'জমাতে ইসলামী' নাম দিয়ে একটি পার্টি গঠন করেন।

'জমাতে ইসলামী পর একনজর' নামক গ্রন্থকার লিখেছেন, ''দিল্লীর বিশ্বস্ত লোকদের মতে মওলানা মওদুদী দীর্ঘ দিন পর্যন্ত খায়রী ভ্রাতৃদ্বয়ের সভাসমিতিতে যোগদান করতেন। পার্টি সংগঠন ও প্রচারণার যেসব নীতি মওলানা আব্দুস সাত্তার খায়রী জামনী থেকে শিখে এসেছিলেন মওদুদী সেগুলি তাদের নিকট হতে আত্মস্থ করেন।....পরবর্তীকালে তিনি স্বয়ং যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তাতে খায়রীদের আন্দোলনের অনেক বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিলো। মওলানা সোলায়মান নদবী ও 'কাউসার' পত্রিকার সম্পাদকের ভাষায় খায়রী ভ্রাতৃদ্বয় তাদের পার্টির যে নাম রাখেন মওদুদীও তার পার্টির নাম তাই রাখেন অর্থাৎ জমাতে ইসলামী।''

মওলানা মওদুদী যে নাজিবাদ থেকেও প্রেরণা লাভ করেছেন তাঁর রচনাবলীতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ১৯৩৪ সালে তরজমানুল কোরআনের ডিসেম্বর সংখ্যায় লিখেছেন, ''আজ আপনাদের সামনে জামানীও ইটালীর দৃষ্টান্ত মওজুদ রয়েছে। হিটলার ও মোসুলিনী যে বিরাট শক্তি অর্জন করেছে সমগ্র বিশ্বে তা স্বীকৃত। কিন্তু এই সফলতার কারণ জানা আছে কি? সেই দুটো বস্তু, অর্থাৎ বিশ্বাস ও নির্দেশের প্রতি আনুগত্য। নাজি ও ফ্যাসী দল কখনো এতো শক্তি ও সফলতা অর্জন করতে পারতো না, যদি না তারা নিজেদের নীতির প্রতি অটল বিশ্বাস রাখতো এবং নিজেদের নেতৃবৃন্দের কঠোর অনুগত না হতো।''

(৩০) সিয়াসী কাশমকাশ, ৩য় খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

উক্ত প্রবন্ধে তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্য বলেছিলেন ''যদি উন্নতি করতে হয় এবং মর্যাদাসম্পন্ন জনাত বনতে হয়, তবে সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে ঈমান ও নির্দেশের অনুগত থাকার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করো। এছাড়া তোমাদের ব্যক্তিজীবনে শক্তি সঞ্চিত হবে না।, তোমাদের দলে শৃংখলা আসবে না এবং বিশ্বে মাথা উঁচিয়ে রাখার মতো তোমাদের সামাজিক শক্তিও অর্জিত হবে না।''

অবশ্য এসব উক্তি তিনি হায়দরাবাদ জীবনে করেছিলেন। সেখানকার প্রভুদের স্বার্থ রক্ষায় এসব প্রেরণা কাজে লাগাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি বৃটিশ প্রভুদের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার জন্য সেসব প্রেরণার আলোকেই জমাতে ইসলামী গঠন করেন। সে যাইহোক, জামাতে ইসলামী গঠনের পর মওলানা সমবেতদের সামনে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''আমরা সত্যিকার এবং আসল ইসলাম নিয়ে যাত্রা শুরু করেছি। সম্পূর্ণ ইসলামই হলো আমাদের আন্দোলন।...প্রথম রাসুলুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত যে জমাত ছিলো আমরাও হুবহু সেই জীবনপদ্ধতিই গ্রহণ করছি।...''

জমাতে ইসলামীর নীতি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মওলানা মওদুদী বলেছিলেন,' ''আমাদের নিকট খোদ ইসলামই আন্দোলন এবং সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যই ইসলামের আহ্বান। সুতরাং কোন বিশেষ জাতি বা দেশের সাময়িক সমস্যাবলীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। বরং তা সমগ্র মানবতা ও বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত।...''

জমাতে ইসলামীর নীতি বিশ্লেষণী ভাষণ থেকে স্বভাবতই অনেকে ধারণা করেছিলো যে, মওলানার মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান বিরোধী ভূমিকায় হয়তো পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু দেখা গেলো তা নয়, বরং পূর্বের চাইতেও জোরেশোরে তিনি একাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

সিয়াসী কাশমকাশ তৃতীয় খণ্ডের একস্থানে তিনি বলেছেন, ''মুসলমান হিসেবে এ বিষয়ের প্রতিও আমার কোনরূপ আকর্ষণ নেই যে, হিন্দুস্তানের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। আমার নিকট সর্বাগ্রে প্রথম প্রশ্ন হলো, আপনাদের পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় দুনিয়ার খোদার সার্বভৌমত্বের উপর হবে, না পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক বিধান মোতাবেক জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের উপর হবে। প্রথমটি হলে পাকিস্তানই হবে। দ্বিতীয়টি হলে তা হবে না-পাকিস্তান যেমনটি হবে দেশের অপর অংশ—যেখানে আপনাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী অমুসলিমরা দেশ শাসন করবে। বরং খোদার দৃষ্টিতে ইহা (পাকিস্তান) তার (বর্তমান ভারত) চাইতেও নাপাক বা অপবিত্র।...যদি জনসাধারণের মতের নিকট নত হতে হয়, তাহলে হিন্দুস্তান ও তার মাটির পূজারীরা জাহান্নামে যাক। এটা একদেশ থাকুক কিংবা দশ হাজার খণ্ড বিভক্ত হয়ে যাক তাতে আমার কি লাভ?...''

মওলানা মওদুদী জমাতে ইসলামীর মূলনীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তাদের দৃষ্টি কোন বিশেষ জাতি বা দেশের সাময়িক সমস্যাবলীর প্রতি নিবদ্ধ নয়। কারণ তাদের আন্দোলন ইসলামেরই আন্দোলন আর সে সমগ্র বিশ্বমানবকেই আহ্বান জানায়। কিন্তু মওলানার দীর্ঘ কর্মজীবনের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিপাত করলে যে কোন লোকের নিকট এ সত্য মূর্ত হয়ে উঠে যে, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

এই উক্তির বরখেলাপ করেছেন এবং আজো করছেন। হায়দরাবাদ জীবনের ইসলাম প্রচারের ধারা ছিলো রাজতন্ত্র তথা নিজাম গোষ্ঠির স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রিক। পরবর্তীকালে পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটে আসার পর তার ইসলাম প্রচার অভিযান পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী ও বৃটিশ স্বার্থরক্ষামূলক রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৪৭ সাল নাগাদ তিনি এইরূপে পূর্ণনামে পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে তাঁর 'বিশেষ ইসলামিক' দৃষ্টিতে কলমী জেহাদ চালিয়েছেন।

ঔপনিবেশিক শাসনেতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, যুগে যুগে বিভিন্ন উপনিবেশে, বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে জন্মাতে ইসলামী ধরনের অনেক 'আমিরিয়ত' কেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তারা দেশে অর্থনৈতিক লুটতরাজ, বিভিন্ন দৈনন্দিন সমস্যা সর্বোপরি সাধারণ মানুষের অধিকার সম্পর্কে কোন কথাই বলতো না। আদর্শ বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক ও প্রচারণা ছিলো সেসব প্রতিষ্ঠানের মূল ভূমিকা। কোন প্রতিষ্ঠানের এরূপ ভূমিকা স্বভাবতই ঔপনিবেশিক স্বার্থ হানিকর নয়। এই জন্য উপনিবেশবাদীরাও এধরনের প্রতিষ্ঠানকে সহানুভূতির চোখে দেখতো। মওলানা মওদুদীও ইতিহাসের এই অধ্যায়টি থেকে পুরোপুরি অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করেছিলেন। আর তাই তিনি পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন।

৩

জামাতে ইসলামীর ৪৬ বছর

শাহ আহমেদ রেজা

*এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আশা-আকাঙ্খার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশ হিসেবে জন্ম হয়েছিলো জামাতে ইসলামী। জন্মলগ্ন থেকে জামাত নেতারা বিরোধিতা করেছেন বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনকে, পাকিস্তান আমলে গণতন্ত্রের আন্দোলনকে এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে। স্বাধীন বাংলাদেশে পুনরায় সংগঠিত হয়ে অতীতের ফ্যাসিস্ট চেহারা নিয়ে তৎপরতা আরম্ভ করেছে এদেশের রাজনীতিতে। জামাতের ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদ, স্বৈরাচার ও সামরিক জান্তার দালালির ইতিহাস। বিভিন্ন সময়ে কপটতার আশ্রয় নিয়ে ঢুকে পড়েছে গণতন্ত্রের আন্দোলনে যদিও শেষ পর্যন্ত তাদের আসল চেহারাটি বেরিয়ে পড়েছে। তরুণ গবেষক শাহ আহমদ রেজার এই তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিলো বিচিত্রার প্রচ্ছদ কাহিনী হিসেবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।**

বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম, মওদুদীর ভিন্নমত এবং জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা

১৯৪১ সালের ২৬ আগষ্ট 'জামাতে ইসলামী হিন্দ' নামে জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর মাতৃ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। দলের মূল স্থপতি ছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (১৯০৩-৭৯)। উর্দু মাসিক 'তর্জুমানুল কোরআন'-এ বিভিন্ন রচনা, বিশেষ করে 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' ('মুসলমান এবং বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত') শিরোনামে প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধের মাধ্যমে '৩৭ পরবর্তীকালে তিনি 'হকুমতে ইলাহিয়া' বা 'আল্লাহর রাজত্ব' প্রতিষ্ঠার অনির্দিষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতার দাবী এবং মুসলমানদের পৃথক

* এ বিষয়ে আরো তথ্য রয়েছে আমাদের পূর্ববর্তী প্রকাশনা 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থে।

আবাসভূমি পাকিস্তান অর্জনের আন্দোলন তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মওদুদীর প্রচারণাও ক্রমাগত সর্বাত্মক হয়েছিলো। গণতন্ত্র এবং ভৌগোলিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতিটি ধারণাকে ইসলাম-পরিপন্থী আখ্যা দিতে গিয়ে এই প্রক্রিয়ায় তিনি একইযোগে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিলেন। মওদুদী বলেছেন ঃ বংশ, জন্মভূমি, ভাষা ও বর্ণ এসবের ভিত্তিতে তৈরী জাতীয়তা মানব জাতির জন্যে এক বিরাট বিপদ।··· এসবই হচ্ছে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা ও হানাহানির চির উৎস, খোদার সবচেয়ে বড় অভিশাপ এবং শয়তানের স্বার্থক হাতিয়ার, যার দ্বারা সে তার আদি দুশমনকে নিপাত করে।'

ভারতীয় মুসলমানদের তিনি সকল জাতীয়তার অনুভূতিকে বাতিল এবং সকল মাটি ও রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার উপদেশ দিয়েছিলেন, কেননা, তার মতে 'কুফর ও শির্কের অজ্ঞতার পর ইসলামের দাওয়াতে হকের যদি কোন বড় দুশমন থাকে তাহলে সে হচ্ছে এই বংশ ও জন্মভূমির শয়তান।' মওদুদী তাই জোর দিয়ে বলেছিলেন ঃ যারা মুসলমান এবং মুসলমান থাকতে চান, তারা জাতিপূজা ও জাতীয়তাবাদের নাম পরিহার করুন এবং ঐ আন্দোলন থেকে পৃথক হয়ে যান, যা ইসলামী জাতীয়তাকে আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক জাতীয়তায় রূপান্তরিত করতে চায়।'

স্বাধীনতা এবং পাকিস্তান প্রসঙ্গে মওদুদীর বক্তব্য ঃ আমার এতে কি এসে যায় যে ভারত একটি দেশ থাকবে, না হাজার খন্ডে বিভক্ত হবে।··· মুসলমান হিসেবে এ বিষয়ে আমার কোনো আকর্ষণ ও অনুরাগ নেই যে ভারতের যেখানে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ সেখানে সরকার কায়েম হোক।' নিজের প্রস্তাবিত 'হুকুমতে ইলাহিয়া' প্রতিষ্ঠাকে একমাত্র শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, 'অন্যথায় দেশটি হবে 'নাপাকিস্তান'। শুধু তা-ই নয় মওদুদীর ভাষায় ঃ 'বরঞ্চ খোদার দৃষ্টিতে এ পাকিস্তান তার (অর্থাৎ অমুসলিম শাসিত দেশের) চেয়েও অধিক ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হবে।'

স্বাধীনতার নামে পূজনীয় কোনো 'প্রতিমা' অর্জনের পরিবর্তে এমন 'এক বর্গ মাইল ভূ-খন্ডকেও' মওদুদী ভারত ও পাকিস্তানের চাইতে 'অনেক বেশী মূল্যবান' বলে ঘোষণা করেছিলেন, যেখানে 'মানুষের উপর খোদা ব্যতীত আর কারো শাসন কর্তৃত্ব থাকবে না।' বৃটিশ শাসনের স্থলে মুসলমান ও ভারতীয়দের শাসন প্রতিষ্ঠা কোন অর্থে মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর তা তিনি 'বুঝতে' ব্যর্থ হয়েছিলেন, ফলে তার দ্বিধাহীন প্রাসঙ্গিক স্বীকারোক্তি ঃ 'এটাকে যদি কেউ বৃটিশ পূজা বলে তো এ গালির আমরা কোন পরোয়া করি না।' গণতন্ত্র সম্পর্কেও মওদুদী তার ধারণার কথা লিখেছিলেন ঃ মুসলমান হিসাবে আমি 'জনগণের সরকার, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা—এ মতবাদে বিশ্বাসী নই, যার জন্য আমি আনন্দ করতে পারি।'**

বৃটিশ বিরোধি চলমান স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপন্থী এই সব উদ্ভট এবং সুপরিকল্পিত বক্তব্য কোন মহলেই কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে নি, ওদিকে

** (উদ্ধৃতিগুলির জন্য দ্রষ্টব্য ঃ আব্বাস আলী খান, 'জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস' ১৯৮৬, পৃ-৫৪-৫৫, ৬১, ৬৫-৬৬, ৬৯, ২১৫—১৬, ২৩০—৩১, ২৩৫ ও ২৪০)

মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবীতে মুসলিম লীগ 'লাহোর প্রস্তাব' (১৯৪০) গ্রহণ করার পর থেকে মওদুদীর আত্মায়, তার নিজের ভাষায়, শুরু হয়েছিলো 'মারাত্মক মাতম'। সে পরিস্থিতিতে তিনি নিজেই একটি সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 'তর্জুমাজুল কোরআন'—এর লেখক সম্পাদক হিসেবে অনেক পাঠকের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিলো এবং এদের মধ্য থেকে ১৫০ জনকে তিনি প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের ২৫ থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত লাহোরে 'তর্জুমানুল কোরআন' কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনটিতে ৭৫ জন যোগদান করেছিলেন। মওদুদীর উদ্বোধনী ভাষণের পর ২৬ আগস্ট গঠিত হয়েছিলো 'জামাতে ইসলামী হিন্দ।' মওদুদীকে এর আমীর বা নেতা বানানো হয়। তিনি ১৬ সদস্যের একটি 'মজলিশ-ই-শুরা' বা কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ গঠন করেন। দলীয় আমীরকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করে ২৮ আগস্ট গৃহীত গঠনতন্ত্রের বিধানে বলা হয় যে, জামাতের 'রুকন' বা সদস্য পদপ্রার্থীদেরকে অবশ্যই নুতন করে 'ঈমান' আনতে হবে এবং সে উদ্দেশ্যে 'কালেমায়ে শাহাদাত' পাঠ করতে হবে।

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণায় আবুল আ'লা মওদুদীর চিন্তাধারাই সর্বাত্মকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিলো ঃ 'হুকুমতে ইলাহিয়া' কায়েমকে এর প্রধান লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে ঘোষিত তিন দফা কর্মসূচীর শেষাংশে বলা হয় , 'খোদাবিমুখ, অসৎ ও চরিত্রহীন লোককে সমাজের সকল নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে দাও এবং ঈমানদার, চরিত্রবান ও যোগ্য লোকদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত কর, যেন জীবন ঠিক খোদার পথে চালিত হয়।' সংগঠনে যোগদানকারীদের 'খোদার পুরস্কার' পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে ঘোষণা করা হয় ঃ 'যে ব্যক্তি এ কাজে বাধা দেবে সে যেন খোদার নিকট জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকে।' বৃটিশ শাসন সম্পর্কে নিরবতা এবং ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের বিরোধিতার লক্ষ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনকে 'ইসলাম-বিরোধী' হিসেবে আখ্যা দান ছিলো ঘোষণার লক্ষণীয় দিক। 'সারা দুনিয়াই একটি দেশ' এবং 'দুনিয়ার গোটা শয়তানী ব্যবস্থাকে বদলিয়ে দিতে হবে' বললেও মাতৃভূমির স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় এই লক্ষ্যার্জন করা সম্ভব সে প্রশ্নে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ঘোষণা প্রদান থেকে জামাত বিরত থাকে। কারণ, 'জন্মভূমির পূজা' ছিলো দলটির ভাষায় 'কুফর ও শির্ক।'

পাকিস্তান ও স্বাধীনতার অব্যাহত বিরোধিতা ঃ প্রাথমিক বিকাশকাল

বৃটিশ ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মাত্র ৭৫ জন ধর্মান্ধ ব্যক্তির সমন্বয়ে জামাতে ইসলামী হিন্দের প্রতিষ্ঠা আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হতে পারে নি। প্রচার ও পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে মওদুদী তাই নিজের প্রাক্তন সংগঠন জমিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দ সহ বিভিন্ন দল এবং বিশেষ করে মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধাচরণের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। জমিয়ত নেতা হুসেইন আহমদ মাদানী এবং কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর

আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগকেও তিনি রেহাই দেন নি। মওদুদীর মতে এই মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইসলামকে খণ্ডিত ও বিকৃত করেছিলেন, তাদের নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিরাও 'প্রকৃত মুসলমান' নন, কেননা, জামাতের মতো এদের কাউকেই কালেমা পাঠ করানোর মাধ্যমে দলভুক্ত করা হয়নি। জামাতে ইসলামীকেই মওদুদী 'একমাত্র, প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

কালেমা পাঠ এবং নতুন করে 'ঈমান' আনার বিধানের কারণে ওলামাদের কেউ কেউ 'ইমাম মেহদী' নামে মওদুদীকে উপহাস করলেও সাধারণভাবে জামাতে ইসলামীকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, সেই সঙ্গে মওদুদীও চিহ্নিত হয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হিসেবে। সে পরিস্থিতিতে সংগঠনের বিস্তারকে মওদুদী অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম বিরোধিতা এসেছিলো জামাতের মধ্য থেকেই। '৪২ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত মজলিস-ই-শুরার বৈঠকে ইসলাম পরিপন্থী বিলাসী জীবন যাপনের কারণে মওদুদীর বিরুদ্ধে 'তাকওয়া পরহেজগারী' না করার অভিযোগ উঠেছিলো। মজলিশ তার পদত্যাগ দাবি করে, চারদিনব্যাপী আলোচনা ও দরকষাকষির মাধ্যম তিনি আমীরের পদটিতে বহাল থেকে যান এবং এর প্রতিবাদে মওদুদী প্রথম সেক্রেটারী কামরুদ্দিন খান সহ উপস্থিত ১৩ জনের মধ্যে ৪ জন সদস্য দলত্যাগ করেন।

নিজের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্ব রক্ষার প্রশ্নে সতর্ক মওদুদী দলীয় সিদ্ধান্ত আমান্য করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বার্ষিক রোকন বা সদস্য সম্মেলন আহবান থেকে বিরত থাকেন, কেন্দ্রীয় দফতরও তিনি লাহোর থেকে সরিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের এক নিভৃত পল্লী পাঠানকোটে নিয়ে যান (অক্টোবর, ১৯৪২)। অভ্যন্তরীণ বিরোধিতাকে নির্মূল করার কৌশল হিসেবে এরপর তিনি নিখিল ভারত সম্মেলনের পরিবর্তে আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের পথে অগ্রসর হন ঃ এই প্রক্রিয়ায় '৪৩ সালের ২১-২২ অক্টোবর দারভাঙ্গায়, ১০-১২ নভেম্বর হায়দরাবাদে এবং ৪৪ সালের ২৬-২৭ মার্চ পাঠানকোটে অনুষ্ঠিত হয় তিনটি পৃথক রোকন সম্মেলন। একইযোগে মওদুদী তার মজলিশ-ই-শুরাকেও পুনর্গঠিত করেছিলেন। ৪৪ সালের ১৭ এপ্রিল পাঠানকোটে অনুষ্ঠিত মজলিশের বৈঠকে তিনি 'তানজিম-ই-জামায়াত' বা দলের 'সংগঠন বিভাগ' উদ্বোধন করেন এবং মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদকে নিযুক্তি দেন দলের প্রথম 'কাইয়েমে জামায়াত' বা সেক্রেটারী জেনারেল পদে। মজলিশের এই বৈঠকে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত জামাতীদের প্রতি 'আরবী ভাষায় কথোপকথনের' অভ্যাস গড়ে তোলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

১৯৪৫ সালের ১৯-২১ এপ্রিল পাঠানকোটে জামাতে ইসলামী হিন্দের প্রথম কেন্দ্রীয় রোকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সেক্রেটারী জেনারেলের রিপোর্ট থেকে তৎকালীন জামাতের সাংগঠনিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় ঃ ৪৫ সালের মার্চ পর্যন্ত রোকনের সংখ্যা ছিলো ৭৫০ জন এবং ৩৭টি স্থানে আঞ্চলিক জামাত গঠিত হয়েছে (প্রধানতঃ পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বিহারে)। মওদুদীর বিরোধিতা এবং ইসলাম পরিপন্থী জীবন যাপনসহ বিভিন্ন অভিযোগে এই সম্মেলনে ৭৫০ জনের মধ্যে ৪০০ জনের সদস্যপদ এবং ৬টি আঞ্চলিক জামাতকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। আমীরের ভাষণে জামাতের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা

সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মওদুদী বলেন ঃ 'আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই নয়, আমরা চাই এক সর্বব্যাপী বিপ্লব ... আমাদের সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য নেতৃত্বের বিপ্লব। (হকুমতে ইলাহিয়ার মাধ্যমে) দুনিয়ায় আমরা যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে চাই তা হলো, এই যে ফাসেক ফাজেরদের নেতৃত্বের অবসানের পর (জামাতের) সব নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। উল্লেখ্য যে সুদীর্ঘ ভাষণের কোনো পর্যায়েই মওদুদী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিংবা ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে কোনো বক্তব্য রাখেন নি।**

১৯৪৬ সালের ৫-৭ এপ্রিল এলাহাবাদের হরওয়ারায় দ্বিতীয় সম্মেলনের পর '৪৭ সালের ৯-১০ মে পাঠানকোটে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো জামাতের সর্বশেষ নিখিল ভারত রোকন সম্মেলন। ততোদিনে ইংরেজদের বিদায় এবং ভারতের স্বাধীনতার বিষয় নিশ্চিত হয়ে গেলেও মওদুদী সুনির্দিষ্টভাবে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন ঃ পাঠানকোটের ভাষণে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা, মুসলিম জাতীয়তাবাদকে জাতিপূজা এবং গণতন্ত্রকে খোদার বিরোধিতা ও জনগণের সার্বভৌমত্বকে 'শির্ক' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, জামাতের এমনি ধরনের বক্তব্যের কারণে এর কয়েকদিন আগে ২৫-২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ সম্মেলনে মুসলিম লীগ কর্মীরা সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছিলো, মওদুদী বেঁচে গিয়েছিলেন অল্পের জন্য।

জামাত ইসলামী হিন্দ-১৯৪১-৪৭ ঃ আত্মঘাতী ব্যর্থতা ও ধ্বংসের রাজনীতি

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পর ৩০ আগষ্ট পাঠানকোট থেকে সদলবলে মওদুদী লাহোর চলে এসেছিলেন। এই সময়কালে পর্যন্ত জামাতে ইসলামী হিন্দের মূল্যায়নকালে বলা যায় ঃ আল্লাহ্, রসুল (সঃ), কোরআন ও ইসলামের নামে ধর্মান্ধ, অনির্দিষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ও ধ্যানধারণা প্রচারণার মধ্য দিয়ে জামাত মূলতঃ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতীয় জনগণের সংগ্রামের বিরোধী অবস্থানে চলে গিয়েছিলো। যার ফলে দলটি এমনকি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরও কাছাকাছি যেতে পারে নি। কোরআন ও ইসলামের মওদুদীয় ব্যাখ্যা এবং নতুন করে 'ঈমান' আনার অশ্রুতপূর্ব ও অস্বাভাবিক বিধান বরং বিপরীত প্রতিক্রিয়া ও মারাত্মক সংশয়ের কারণ ঘটিয়েছে, কেননা, এর অনুচ্চারিত অর্থটি আসলে ছিলো জামাত বহির্ভূতদের মুসলমান হিসেবে অস্বীকার করা।

মওদুদীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মোহ জামাতের বিকাশকে রুদ্ধ করেছিলো। বিলাসী জীবনের প্রতি তার স্ববিরোধী আসক্তি প্রতিষ্ঠার ছ'মাসের মধ্যেই সংগঠনের বিভক্তি এনেছিলো; এক বছর পরপর সম্মেলন অনুষ্ঠানের দলীয় সিদ্ধান্তকে পদদলিত করে তিনি প্রথম সম্মেলন ডেকেছিলেন দীর্ঘ চার বছর পর এবং সেখানেও তাঁর নির্দেশে বহিস্কার করা হয়েছিলো অর্ধেকের বেশী সদস্যকে, —৪০০ জনকে। ওদিকে 'হকুমতে ইলাহিয়া'র হেঁয়ালীর মধ্যে আচ্ছন্ন রেখে

** [দ্রষ্টব্য ঃ আব্বাস আলী খানের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১২৮-৪৫]

জামাতীদের তিনি সাফল্যের সঙ্গে চলমান বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং সে প্রক্রিয়ায় এমনকি ১৯৪৫-৪৬ সালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনেও তিনি জামাতকে অংশ নিতে দেন নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যারা প্রার্থী হয়েছিলেন তাদের প্রত্যেককেই সংগঠন থেকে বহিস্কার করা হয়েছিলো।

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সরাসরি বিরোধিতা জামাতের জন্যে সবচেয়ে মারাত্মক পরিণতির কারণ হয়েছিলো। 'সারা দুনিয়ায় হকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠার' লক্ষ্যে '৪৭ সালে মওদুদী পাঠানকোটে ইসলামের 'আবাস ভূমি' হিসেবে 'দারুল ইসলাম' স্থাপন করেছিলেন, নিজেকে এর 'আমীর' ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি তার আকাঙ্ক্ষার কথাও গোপন রাখেন নি এবং ফলশ্রুতিতে খোদ জামাতীদের মধ্যেও ক্রমাগত প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলো। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মওদুদী এরপর তার বক্তব্যে কিছু কিছু পরিবর্তন আনতে শুরু করেন ঃ শেষ দিনগুলিতে তিনি 'হকুমতে ইলাহিয়া'র প্রচারণাকে ব্যাপকতা দেয়ার পরিবর্তে একটি 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে মওদুদীর মুখে বৃটিশ বিরোধী বক্তব্যও উচ্চারিত হয়েছিলো ঃ পাঠানকোটে সম্মেলনে প্রথমবারের মতো ইংরেজদের তিনি 'দখলদার' বলেছিলেন, বৃটিশ শাসনকে বলেছিলেন 'তাগুতী শাসন।' পরিস্কার এই বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে মওদুদী কেবল নিজের চরিত্র ও রাজনীতির অসারতাই তুলে ধরেন নি, একই সঙ্গে উম্মোচিত হয়েছিলো তার 'ঈমান'-এর 'কমজোরী'ও। মর্দে মোমেন-এর মতো জেহাদ কিংবা 'ইসলামী বিপ্লব' দূরে থাক, সাধারণ প্রতিবাদেরও সাহস তার হয় নি, 'হিজরত' করার নামে বরং রাতের অন্ধকারে মওদুদী আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই দেশটিতেই—মাত্র কিছুদিন আগেও তিনি স্বয়ং যাকে 'নাপাকিস্তান' আখ্যা দিয়েছিলেন।

বাস্তবতার পরিপন্থী সংগঠনের ধর্মান্ধ বক্তব্য ও রাজনীতির পাশাপাশি মওদুদীর ক্ষমতালিপ্সা এবং পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের কারণে '৪৭ সাল পর্যন্ত জামাতে ইসলামী সাংগঠনিকভাবে প্রতিষ্ঠা যেমন পায় নি, তেমনি রাখতে পারে নি কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও। ফলে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকালে জামাতের সদস্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ৫৩৩ জন, এদের মধ্যে মওদুদীর সঙ্গে পাকিস্তানে এসেছিলো আরো কম সংখ্যক, মাত্র ৩০৬ জন।

পাকিস্তানে জামাত ঃ 'ইসলামী শাসনতন্ত্র' এবং মওদুদীর 'ফতোয়া'

প্রকৃতপক্ষে সংগঠন হিসেবে জামাতে ইসলামীর বিকাশ ঘটেছিলো পাকিস্তানে। প্রতিষ্ঠাকালীন নীতি ও ঘোষণাকে সাধারণভাবে বহাল রাখলেও 'কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ইসলামী শাসনতন্ত্র' প্রণয়নের চার দফা দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে পাকিস্তানে জামাতের কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো (মার্চ, ১৯৪৮)। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়েই দলটিকে বাধাগ্রস্ত হতে হয়। পাকিস্তানের সহযোগিতায় পরিচালিত বিতর্কিত রাজ্য কাশ্মিরের চলমান 'জেহাদ'কে 'হারাম' বলে ফতোয়া দেয়ার অভিযোগে '৪৮ সালের ৪ অক্টোবর মওদুদীসহ একদল জামাত নেতা গ্রেফতার বরণ করেন।

আবদুল জব্বার গাজীর নেতৃত্বে জামাত সে অবস্থায় সরকারের প্রতি সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ইসলামের আলোকে গণপরিষদে 'অবজেকটিভ রিজোলিউশন' উত্থাপন করার পর (মার্চ, '৪৯) মজলিশ-ই-শুরার পক্ষ থেকে 'শুকরিয়া' এবং পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছিলো (৬-৮ এপ্রিল, '৪৯)।

এই ভূমিকা সত্ত্বেও মওদুদীর মুক্তি বিলম্বিত হয়। তার অনুপস্থিতিতেই '৪৯ সালের ৬-৮ মে লাহোরে আয়োজিত হয়েছিলো জামাতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রথম সম্মেলন। '৫০ সালের ২৮ মে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে মওদুদী প্রধানতঃ শাসনতন্ত্রকে ইসলামীকরণের দাবীতে সকল তৎপরতা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রভাষা, দু'অঞ্চলের সংখ্যাসাম্য এবং দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদসহ মূলনীতি কমিটির অন্য কোনো সুপারিশের প্রশ্নই তার বা জামাতের দিক থেকে এই সময়কালে কোনো বক্তব্য উত্থাপন করা হয় নি। ইসলামীকরণের দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জমিয়তুল ওলামায়ে ইসলামসহ ইসলামী দলগুলির সঙ্গে জামাত আতাঁত গঠন করে। '৫১ সালের ২১ জানুয়ারী করাচীতে এক ওলামা সম্মেলন শেষে এরা শাসনতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে ২২ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেছিলো।

ওলামাদের এই আন্দোলন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পথে ক্রমাগত জটিলতা সৃষ্টি করতে থাকে এবং '৫০ সালের সেপ্টেম্বরে উত্থাপিত মূলনীতি কমিটির অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট স্থগিত হয়ে যায়। মুসলিম লীগ সরকার মূলনীতি কমিটির ধর্মীয় উপবিভাগ 'তালিমাত-ই-ইসলামীয়া'র সভাপতি পদে ওলামাদের প্রতিনিধি হিসেবে জমিয়ত নেতা সৈয়দ সোলায়মান নাদভীকে অন্তর্ভুক্ত করলে সুযোগ লাভে ব্যর্থ মওদুদী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। আন্দোলনের নামে পরিস্থিতিকে তিনি নিজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা এবং জামাতের সংগঠন বিস্তারের কাজে লাগানোর সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। '৫১ সালের ২১ নভেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় জামাতের রোকন সম্মেলন। ওলামাদের ২২ দফার পাশাপাশি মওদুদী ঘোষণা করেন পৃথক ৯ দফা দাবী।

'কাদিয়ানী' হত্যার অভিযান, মওদুদীর ফাঁসী এবং জামাতের অবস্থান

জমিয়ত সভাপতির নেতৃত্বাধীন ধর্মীয় উপবিভাগের সুপারিশের ভিত্তিতে '৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন তার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। এতে ইসলামকে রাষ্ট্রের আদর্শ এবং কোরআন ও সুন্নাহকেই শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মওদুদীর উদ্যোগে তথাপি এর বিরোধিতার সূচনা হয়েছিলো। নাজিমুদ্দিনের রিপোর্ট বিবেচনার উদ্দেশ্যে '৫৩ সালের ১৮ জানুয়ারী করাচীতে আয়োজিত ৩১ জন ওলামার এক সম্মেলনে মওদুদী নতুন একটি ভয়ংকর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। 'কাদিয়ানী' নামে পরিচিত ইসলামের 'আহমদীয়া' সম্প্রদায়কে তিনি 'অমুসলিম' ঘোষণার দাবী জানান। এ ব্যাপারে সাধারণভাবে ওলামাদের মধ্যে আগে থেকেই ঐক্যমত ছিলো। '৫২র জুলাই সম্মেলনে তারা দাবীটি উত্থাপনও করেছিলেন, কিন্তু মওদুদী একে

শাসনতন্ত্রের বিধানে পরিণত করার দাবী জানিয়েছিলেন। উপস্থিত ওলামাদের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে তিনি উগ্র ধর্মান্ধতা সংক্রামিত করেন এবং পূর্ব ঘোষিত ২২ দফার সঙ্গে সম্মেলনে নতুন তিনটি দাবীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় ঃ ১) 'কাদিয়ানী'দের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা; ২) 'কাদিয়ানী' পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লাহ খানের পদচ্যুতি এবং ৩) সকল গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদ থেকে 'কাদিয়ানী'দের অপসারণ।

কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করলেও ওলামারা একে শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করার প্রশ্নে মওদুদীর অভিমত মানতে অস্বীকার করেছিলেন। সম্মেলনে 'কাদিয়ানী' সম্পর্কিত দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে একটি 'সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়, এর পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি একমাসের সময়সীমাও ঘোষিত হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে সম্প্রদায় হিসেবে 'কাদিয়ানী'দের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে '৫২ সালের ১৮ মে প্রদত্ত একটি ভাষণের কারণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লাহ খানকে ওলামারা পদচ্যুত করতে চেয়েছিলেন।

ওলামা সম্মেলনের প্রস্তাবকে মওদুদী নিজের এবং জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার কাজে লাগিয়েছিলেন। 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামে একটি পুস্তিকার ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র মারাত্মক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন। মওদুদীর এই প্ররোচনার ফলে '৫৩ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিক থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে শুরু করে, মার্চের প্রথম সপ্তাহে শত শত 'কাদিয়ানী' মুসলমান মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হয়। লাহোর সহ বিভিন্নস্থানে মওদুদী এ সময় অসংখ্য জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন এবং তার ফলে বিশেষ করে পাঞ্জাবে হত্যাকান্ড এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছিলো। উল্লেখ্য যে মওদুদী এবং জামাত এই অমানবিক দাঙ্গাকে 'সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলো।•

মওদুদী এবং জামাতে ইসলামীর সক্রিয় উদ্যোগে চলমান অব্যাহত দাঙ্গার প্রেক্ষিতে '৫৩ সালের ৬ মার্চ লাহোরে সামরিক আইন প্রবর্তিত হয়। মওদুদীকে গ্রেফতার করা হয় ২৮ মার্চ। 'কাদিয়ানী সমস্যা' পুস্তিকা ও বিভিন্ন সময়ে ভাষণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংঘাত সৃষ্টি এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা প্রদানের অভিযোগে সামরিক আদালত ৮ মে মওদুদীকে ফাঁসীর নির্দেশ দেয়, অপর দু'জন জামাত নেতাকেও সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। ফাঁসীর এই নির্দেশই প্রথমবারের মতো মওদুদীকে সারা পাকিস্তানে পরিচিতি দিয়েছিলো। মওলানা ভাসানী এবং 'আজাদ' সম্পাদক মওলানা আকরাম খাঁ সহ নেতৃবৃন্দ দন্ডাদেশ মওকুফ এবং সাধারণ আদালতে বিচার লাভের সুযোগ দেয়ার দাবি জানালে সরকার ফাঁসীর পরিবর্তে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ডাদেশের কথা ঘোষণা করেছিলো। উল্লেখ্য যে, জামাতে ইসলামী সে সময় মৃতপ্রায় সংগঠনে পরিণত হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে মওদুদী মুক্তি পেয়েছিলেন (২৯ এপ্রিল, '৫৫) ঃ '৫৪-র নির্বাচনে পূর্ব-বাংলার মুসলিম লীগের পরাজয়ের পাশাপাশি পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং ২১ দফার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবিতে বাঙ্গালীর দুর্বার আন্দোলনের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার

•• [দেখুন ঃ আব্বাস আলী খান, 'মওলানা মওদুদী,' ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১২০-২৩]

ষড়যন্ত্রের পথকে বেছে নিয়েছিলো। এই প্রক্রিয়ায় যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গন আনা হয় এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের অব্যাহত চাপকে এড়িয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নকে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মওদুদীর মতো ধর্মান্ধ মওলানার প্রয়োজন দেখা দেয়। মুক্তিলাভের পর সে দায়িত্ব মওদুদী পালন করেছিলেন পরিপূর্ণরূপে। 'কাদিয়ানী'সহ অসংখ্য প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয়ে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের নামে অচিরেই বাঙালীর স্বার্থবিরোধী অভিযানে নিয়োজিত হয়েছিলেন সর্বাত্মকভাবে।

পূর্ব বাংলায় জামাতে ইসলামী

'৫৩ সালের ৯ জানুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদে শাসনতন্ত্রের খসড়া উপস্থাপিত হওয়ার পর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার সর্বত্র প্রতিবাদ উঠেছিলো, স্বায়ত্বশাসনের বিধানহীন এবং সংখ্যাসাম্যের প্রবর্তনকারী শাসনতন্ত্রটিকে 'জনগণকে শৃংখলিত করার মহাষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে ১৫ জানুয়ারী ভাসানী এমনকি 'বিচ্ছিন্নতার' পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেছিলেন। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার অবসান এবং যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য ও এদেশে সম্মিলিত দাবি উত্থাপিত হয়েছিলো। সে পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধাচরণের উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মতো পূর্ব বাংলা সফরে এসেছিলেন মওদুদী, সাথে ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ (২৪ জানুয়ারী, '৫৬)।

এদিকে পূর্ব বাংলার সংগঠন হিসেবে জামাতে ইসলামী তখনো কোনো ভিত্তি লাভ করতে পারে নি। বাংলাভাষীদের মধ্যে বরিশালের মওলানা আবদুর রহীম জড়িত ছিলেন প্রথম থেকেই। প্রদেশে জামাত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো হয়েছিলো জনৈক রফী আহমদ ইন্দোরীকে (মে, ১৯৪৮)। রফী ও রহীমের প্রচেষ্টায় মাত্র চারজনের সমন্বয়ে প্রাদেশিক জামাত গঠিত হয়। '৫১ সালে আমীরের দায়িত্ব পান মওলানা রহীম। '৫৩ সালে আমীর নিযুক্ত হন পশ্চিম পাকিস্তানের আলী আহমদ খান, কিন্তু মওদুদীর গ্রেফতার ও ফাঁসীজনিত বিপর্যয়ের ফলে জামাত কোনো সংগঠন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক গোলাম আযমের যোগদান প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলায় জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার কারণ হিসেবে ক্রিয়া করেছিলো। '৫৪ সালে তিনি 'মুত্তাফিক' বা সহযোগী সদস্য হিসেবে যোগ দেন, রোকন হন তিনি '৫৫-র এপ্রিলে। এরপর ক্রমাগত তার পদোন্নতি ঘটতে থাকে। '৫৫-র জুনে রাজশাহীর বিভাগীয় সেক্রেটারী, '৫৬ সালে যথাক্রমে প্রাদেশিক সহকারী সেক্রেটারী, রাজশাহীর আমীর এবং সর্বশেষ নভেম্বরে তিনি প্রাদেশিক সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। এ সময় আমীরের দায়িত্বে ছিলেন মওলানা আবদুর রহীম।

সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী ঃ বাঙালী স্বার্থের বিরুদ্ধে মওদুদী

মওদুদী সফরের প্রাক্কালে প্রাদেশিক জামাতে ইসলামী একটি সর্বদলীয় ইসলামী ফ্রন্ট গঠন করেছিলো ঃ নেজাম-ই-ইসলাম এবং পরাজিত মুসলিম লীগ এতে যোগ দিয়েছিলো (৩ জানুয়ারী, '৫৬)। চল্লিশ দিনব্যাপী পূর্ব বাংলা সফরকালে বিভিন্ন সম্মেলন ও সমাবেশে মওদুদী ইসলামী শাসনতন্ত্রের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। স্বায়ত্তশাসন ও বাঙালীর স্বার্থবিরোধী শক্তিশালী কেন্দ্র, দু'অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যাসাম্য ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট তথা একটি প্রদেশ প্রতিষ্ঠা এবং পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার যৌক্তিকতা তুলে ধরা ছিলো তার প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবির মধ্যে ক্ষমতাসীনদের মতো তিনিও পাকিস্তানের সংহতি বিনাশের সম্ভাবনা আবিস্কার করেছিলেন, ফলে এর বিরুদ্ধে তার আক্রমণ এসেছিলো অত্যন্ত কঠিন ভাষায়।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার দাবীর বিরুদ্ধেও মওদুদী আক্রমণাত্মক বক্তব্য রেখেছিলেন। গণতান্ত্রিক এই দাবীটিকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের প্ররোচনা হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, 'এর ফলে হিন্দুরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক হবে এবং মুসলমানরা হিন্দুদের অধীনস্থ হয়ে পড়বে।' ব্যাখ্যাদানকালে মওদুদী বলেন, পৃথক নির্বাচনের বর্তমান ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলায় হিন্দুরা যেখানে মাত্র ৭০টি আসন পাচ্ছে, যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সেখানে তাদের আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১৪২টিতে এবং 'পরিণামে হিন্দুদের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা চলে যাবে,' কেননা, প্রদেশে সর্বমোট আসনের সংখ্যা হলো ৩০৯টি।

নিজের দাবীকে বলিষ্ঠতাদানের উদ্দেশ্যে জামাতের নেতৃত্বাধীন ইসলামী ফ্রন্টের মাধ্যমে মওদুদী ঢাকায় এক 'সর্বদলীয় ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্মেলনের'ও আয়োজন করেছিলেন। '৫৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চল থেকে ওলামা, পীর ও মাশায়েখরা যোগদান করেন। এতে গৃহীত প্রস্তাবে প্রধান চারটি শাসনতান্ত্রিক দাবীকে তুলে ধরা হয়েছিলো ঃ ১) পাকিস্তানকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা; ২) প্রেসিডেন্ট পদটি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ; ৩) পূর্ব বাংলাকে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণ; এবং ৪) পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা। ৪ মার্চ ঢাকায় এক জামাতী সম্মেলনে ভাষণদানকালে মওদুদী পাকিস্তানকে তার 'দেহ ও প্রাণ' এবং পূর্ব বাংলাকে নিজের একটি 'হাত' হিসেবে তুলনা করে দেশের সংহতি রক্ষার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকার জন্য জামাতীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জামাতের অভ্যন্তরীণ সংকট ঃ মওদুদীর নতুন তত্ত্ব

'৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী গণপরিষদে 'ইসলামী শাসনতন্ত্র' গৃহীত হওয়ার পর জামাতে ইসলামী 'শুকরিয়া' জ্ঞাপন করে, কিন্তু যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার বিধানের বিরুদ্ধে মওদুদী তার আন্দোলনকে অব্যাহত রাখেন। 'সিস্টেম অব

ইলেকটরেট ঃ সেপারেট অব জয়েন্ট?' শিরোনামে প্রকাশিত ('ডন', ৩-৫ জুন, '৫৬) তার প্রবন্ধ নতুন করে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে থাকে। সে অবস্থায় জামাতে ইসলামীর অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দাঙ্গার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করেছিলো। মওদুদীর বিরুদ্ধে একনায়কত্ব স্বেচ্ছাচারিতা এবং সুবিধাবাদী স্ববিরোধিতার কারণে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগে বলা হয় যে তিনি ১) গঠনতন্ত্র অমান্য করে আমীরের পদ আঁকড়ে রয়েছেন; ২) নিজের বক্তব্য ও কার্যক্রমকে জামাতের নামে চালিয়ে যাচ্ছেন; ৩) 'হুকুমতে ইলাহিয়া' প্রতিষ্ঠার আগে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণকে ইসলাম বিরোধী বলে ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচন থেকে সংগঠনকে বিরত রাখলেও এবং প্রার্থী হওয়ার অভিযোগে কতিপয় জামাতীকে বহিস্কার করলেও পাকিস্তানী নির্বাচনে অংশগ্রহণের অগঠনতান্ত্রিক বিধান প্রবর্তন করেছেন একক সিদ্ধান্তে। উল্লেখ্য যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে '৫০-'৫১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মওদুদী প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন। এদের মধ্যে পাঞ্জাবে কেবল একজন নির্বাচিত হন, সিন্ধুতে পরাজিত হন প্রত্যেকে এবং সীমান্ত প্রদেশের সকল প্রার্থীই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সংগঠনের সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে মওদুদী '৫৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে নিখিল পাকিস্তান জামাত সম্মেলন আহ্বান করেন এবং দরকষাকষির পরিস্কার লক্ষ্য নিয়ে এর প্রাক্কালে আমীরের পদ থেকে অব্যাহতি নেয়ার কথা ঘোষণা করেন। ভাওয়ালপুরের মাছিগোটে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী এই সম্মেলনে মওদুদীর কৌশলটি সার্থক প্রমাণিত হয়। তিনিই আবার আমীর পদে নির্বাচিত হন এবং ভিন্ন মতাবলম্বীরা দল থেকে বেরিয়ে যান। ছ'ঘন্টার দীর্ঘ ভাষণে নির্বাচন সম্পর্কিত বিতর্কের ওপর মওদুদী বলেন ঃ '...আমরা যদি যথার্থই নিজ দেশের গোটা জীবন ব্যবস্থাকে ফাসেকী ও ভ্রষ্টতার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে সত্য দ্বীনের সহজ-সরল পথে চালাতে চাই, তবে শাসন ক্ষমতা থেকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শক্তিকে অপসারিত করে তদস্থলে গঠনমূলক শক্তিকে অভিষিক্ত করার জন্য সরাসরি চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। বস্তুতঃ দেশের শাসন ক্ষমতা কল্যাণ ও সংশোধনকামী লোকদের হাতে ন্যস্ত হলে..... কয়েক বছরের মধ্যেই তারা এতটা পরিবর্তন সাধন করতে পারেন, অরাজনৈতিক পন্থায় যা একশ বছরেও সম্ভবপর হতে পারে নি।' আর সেজন্যই মওদুদীর মতে, 'দেশের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে খালেছ ইসলামী ভিত্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে জামাতকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হবে। [দ্রষ্টব্য ঃ জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশিত মওদুদীর গ্রন্থ 'ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী' ১৯৮৬, পৃ-২৮-২৯] উল্লেখ্য যে জামাতের এই সম্মেলনে যোগদানকারী প্রায় আটশ সদস্যর মধ্যে পূর্ব বাংলা থেকে গোলাম আযম, মওলানা আবদুর রহীম এবং আব্বাস আলী খান সহ ১৪ জন জামাতী অংশ নিয়েছিলেন।

সাম্প্রদায়িক তিক্ততা, আইউব বিরোধী 'ফতোয়া' এবং নিষিদ্ধ জামাত

নিজের নেতৃত্ব সুসংহত করার পর মওদুদী আবার পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন, একইভাবে তিনি ভারত বিরোধী প্রচারণার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক স্থিতিশীলতা নস্যাতেরও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তোলেন, নির্বাচন ব্যবস্থার প্রশ্নে গণভোটের দাবি জানান এবং ঘোষণা করেন যে একমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই কাশ্মির সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং পাকিস্তানের সে পন্থাই গ্রহণ করা উচিত।'*

সাম্প্রদায়িক সংঘাত উস্কিয়ে দেয়ার প্রমাণিত উদ্দেশ্য নিয়ে এরপর মওদুদী পঞ্চাশ দিনের সুদীর্ঘ সফরে পূর্ব বাংলায় এসেছিলেন (ফেব্রুয়ারী, '৫৮)। কিন্তু এবার তাকে প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়। রংপুরে তাকে ট্রেন থেকেই নামতে দেয়া হয় নি, অন্য স্থানগুলিতেও তিনি বাঙালী জনগণের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন, প্রতিটি সমাবেশেই পন্ড হয়ে গিয়েছিলো। প্রাদেশিক জামাতের তিনদিনব্যাপী সম্মেলন ব্যতীত অন্য কোনো সমাবেশে তিনি স্বাভাবিকভাবে বক্তব্য রাখতে পারেননি। মওদুদী তথাপি তার উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তব্য থেকে বিরত হন নি। '৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন ঘোষিত হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত তিনি তার প্রচারণাকে অব্যাহত রেখেছিলেন।

সামরিক শাসনোত্তরকালে প্রেসিডেন্ট আইউব খান বিরোধী ধর্মান্ধ বক্তব্য উপস্থাপনার মাধ্যমে মওদুদী রাজনৈতিক অঙ্গনে ফিরে এসেছিলেন। গণতন্ত্র হত্যা কিংবা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মতো অভিযোগ এড়িয়ে তিনি আইউব প্রবর্তিত 'মুসলিম পারিবারিক আইন '৬১-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। আইউবও ওলামাদের পরামর্শেই আইনটি তৈরী করেছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে মওদুদী বা তার কোনো প্রতিনিধি স্থান না পাওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন এবং আইউব ও তার শাসনকে 'শয়তান ও 'গায়ের ইসলামী' বা ইসলাম বিরোধী বলে আখ্যা দিতে থাকেন। মওদুদী এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন যে 'শয়তান' আইউব পবিত্র কোরআনকে বিকৃত ও খন্ডিত করে নতুন একটি কোরআন রচনা করেছেন এবং তার ভিত্তিতেই পারিবারিক আইনটি প্রণীত।' জামাতের রংপুর (১৮ নভেম্বর, '৬২) এবং লাহোর (২৫-২৭ অক্টোবর, '৬৩) সম্মেলনসহ বিভিন্ন সভা সমাবেশে মওদুদী তার 'গায়ের ইসলামী' তত্ত্ব ব্যাপকভাবে প্রচার করেন, 'তর্জুমানুল কোরআন' তার হাতিয়ারে পরিণত হয়। জামাতের ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী জমিয়তে তালাবা' মওদুদীর নির্দেশে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়সহ পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামা চালাতে থাকে, প্রদেশের সর্বত্র আবার সংঘাতের

---

* ১৯৪৮ সালে মওদুদী ঠিক এর বিপরীত ফতোয়া দিয়েছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, 'হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তানের সরকারের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি থাকা অবস্থায় সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ আমি জায়েজ মনে করি না। আমার জানা মতে শরিয়তের নির্দেশ তাই।' (দ্রষ্টব্য : মওদুদী চিন্তাধারা, মওলানা আবদুল আউয়াল ঢাকা ১৯৬৯।)

পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়।

পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সামরিক প্রেসিডেন্ট আইউবের নির্দেশে জামাতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ (৬ জানুয়ারী, ১৯৬৪) এবং মওদুদী সহ ৬০ জন জামাত নেতাকে গ্রেফতার করা হয়—এদের মধ্যে গোলাম আযম সহ ১৩ জন ছিলেন পূর্ব বাংলার জামাতী। মওদুদীর বিরুদ্ধে আনীত অন্যতম অভিযোগটিতে বলা হয়েছিলো যে তিনি এবং জামাতে ইসলামীর বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সংক্রামিত করে বলপূর্বক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র চালিয়ে এসেছেন। মওদুদী তার জবাবে অভিযোগ অস্বীকার করেন। ওদিকে দু'প্রদেশের হাইকোর্ট একইযোগে 'হেবিয়াস করপাস' আবেদনের ফলে জামাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় এবং মওদুদীও মুক্তিলাভ করেন (অক্টোবর, '৬৪)। [বিস্তারিত ঃ আব্বাস আলী খান, 'মওলানা মওদুদী,' পৃ-১৭২-২২১]

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিনয় ঃ গণঅভ্যুত্থান বিরোধী ষড়যন্ত্র

আইউব সরকারের এই দমনমূলক পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় জামাতে ইসলামী প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলো ঃ '৬৫-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনোপলক্ষে গঠিত 'কপ' বা 'সম্মিলিত বিরোধী দল'এর (সেপ্টেম্বর, '৬৪) অঙ্গ সংগঠন হিসেবে জামাত আইউবের বিরুদ্ধে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন দিয়েছিলো। প্রকাশ্যে আইউব বিরোধিতার নীতিকে অব্যাহত রাখলেও পরবর্তীকালে মেহনতী মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বিশেষ করে স্বায়ত্বশাসনসহ পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের প্রশ্নে জামাতের ভূমিকা অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে, ইসলাম এবং সংহতির নামে দলটি চলে গিয়েছিলো সম্পূর্ণ পরিপন্থী অবস্থানে।

'৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের ন্যায়সঙ্গত দাবিটি ক্রমাগত তীব্রতর হতে থাকে, শেখ মুজিবের ৬ দফা (ফেব্রুয়ারী '৬৬) এবং মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা (জুন, '৬৬) এক সুনির্দিষ্ট আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে। উভয় কর্মসূচীকেই জামাত 'বিচ্ছিন্নতার পরিকল্পনা' হিসেবে চিহ্নিত করে, ১৪ দফার মধ্যে দলটি সমাজতন্ত্রের 'কুফরী' এবং 'শয়তানী'ও আবিস্কার করেছিলো। বাঙ্গালীর সম্ভাব্য আন্দোলনকে নস্যাৎ ও বিপথগামী করার প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রে জামাত সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়, এই প্রক্রিয়ায় অন্য চারটি সংগঠনের সঙ্গে একযোগে সে 'পি ডি এম' বা 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন' গঠন করে (এপ্রিল, '৬৭)। ৬ দফা ও ১৪ দফার পাল্টা কর্মসূচী হিসেবে ঘোষিত পিডিএম-এর ৮ দফায় স্বায়ত্বশাসনের বিধানহীন '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পূনর্বহাল দাবী করা হয় এবং 'আঞ্চলিক বৈষম্য'সহ কতিপয় বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের পাশাপাশি ইসলাম বিরোধী আইন ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের জন্যও আন্দোলনের আহবান জানানো হয়। প্রাদেশিক পিডিএম-এর সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আযম এসময় অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

'৬৮-র ডিসেম্বরে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে উঠা ঘেরাও আন্দোলন আইউব বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করলে প্রতিক্রিয়াশীল অন্য

সংগঠনগুলির সঙ্গে জামাতে ইসলামীও একে যৌক্তিক পরিণতির দিকে যেতে না দেয়ার উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো। আটটি দলের সমন্বয়ে গঠিত ড্যাক বা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (৮ জানুয়ারী, '৬৯) বাস্তবেও বাঙালীর স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনকে নস্যাৎ করেছিলো। অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের দ্বারপ্রান্ত থেকে ১১ দফা ভিত্তিক গণঅভ্যুত্থানকে 'ড্যাক' আইউব খানের গোল টেবিলে নিয়ে হত্যা করেছিলো (২৬ ফেব্রুয়ারী, ১০-১৩ মার্চ '৬৯)। এই ষড়যন্ত্রের সমগ্র পর্যায়ে প্রধান ভূমিকা ছিলো জামাতে ইসলামীর। শুধু তা-ই নয়, ছাত্রদের মধ্যেও সংঘাত সৃষ্টির কারণ ঘটিয়েছিলো জামাত। সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফার বিরুদ্ধে সে তার ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘকে দিয়ে উপস্থাপিত করেছিলো পৃথক ৮ দফা কর্মসূচী। এর ফলে আন্দোলনে বিভেদ সূচিত হয় এবং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সংঘর্ষে অসংখ্য ছাত্র অকালে মৃত্যুবরণ করে।

স্বায়ত্বশাসন ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা ঃ জামাত প্রসঙ্গে ওলামারা

১৯৬৯-৭০ সময়কালে বাঙালী স্বায়ত্বশাসন এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ভাবে অবস্থান গ্রহণকে জামাতে ইসলামী তার প্রধান কার্যক্রমে পরিণত করেছিলো। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পুনর্বহাল এবং পিডিএম ও ড্যাক-এর কর্মসূচীতে বর্ণিত কতিপয় কাগুজে দাবীর ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসনের পক্ষাবলম্বনের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জামাত এই আন্দোলনকে নস্যাতের কুশলী উদ্যোগ নিয়েছে, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের মতবাদকে প্রকাশ্যেই বলেছে ইসলাম বিরোধী। আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আখ্যাদানের পাশাপাশি মওলানা ভাসানী এবং বামপন্থীদের জামাত 'নাস্তিক' 'কাফের' এবং খোদাদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো। শেখ মুজিব এবং মওলানা ভাসানীর তীব্র সমালোচনা করে জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অস্থায়ী আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ বলেছিলেন (২৬ আগষ্ট,'৬৯) ঃ 'দেশের মানুষের মধ্যে সংহতি নষ্ট করে দেয়ার জন্য পাকিস্তানে সমাজতন্ত্রী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এখন অত্যন্ত তৎপর।' পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী রাজনৈতিক দল তথা ন্যাপ ও আওয়ামী লীগকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্যও দাবী জানিয়েছিলেন।

একই স্বরে আওয়ামী লীগ ও দুই ন্যাপ সম্পর্কে প্রাদেশিক জামাতের সেক্রেটারী আবদুল খালেক বলেছিলেন যে এ তিনটি দল পাকিস্তান ও ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী জনগণ ও তার দলের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার করছে। তিনি বলেন, (২৮ আগষ্ট '৬৯) ঃ দেশের মানুষ যখন কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আইন প্রণয়ন করতে উদ্যোগী হয় তখনই এই কুচক্রী মহল গণতন্ত্র ও জনগণের নামে হৈচৈ শুরু করে দেয়। দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের সহযোগে জামাত ইসলামী এখন দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম করছে এবং এ তিনটি দল এ যুক্ত আন্দোলনে বাধা দিয়ে আসছে।

জামাতে ইসলামীর এমনি ধরণের বক্তব্য এবং আক্রমণাত্মক ভূমিকার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় তো বটেই, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের ইসলামী শিবির থেকেও প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল। ৬০ জন ওলামা এক যুক্ত বিবৃতিতে 'নিরন্তর

ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের দায়ে' সামরিক আইনের অধীনে মওদুদীর শাস্তির দাবী করেছিলেন। ইসলামের অপব্যাখ্যা এবং মুসলমানদের ভাবাবেগ নিয়ে খেলা করার অভিযোগ উত্থাপন করে এই ওলামারা বলেছিলেন ঃ 'মওদুদীর পেছনে দাঁড়িয়ে কোনো সত্যিকার মুসলমানের নামাজ পড়া উচিত নয়।' ['পূর্বদেশ' ২৯ ডিসেম্বর '৬৯] একই সময়ে করাচীর 'শিহাব' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এবং লাহোর জামাতের প্রাক্তন আমীর (১৯৫৭-৬৫) মওলানা কাওসার নিয়াজী জানিয়েছিলেন যে জামাতে ইসলামী আরবের দেশগুলিতে অবস্থিত বিভিন্ন আমেরিকান তেল কোম্পানীর কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য লাভ করে আসছে। তিনিও ইসলাম সম্পর্কে মওদুদী ও জামাতের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছিলেন। ['পূর্বদেশ' ২৩ ডিসেম্বর, '৬৯] জমিয়তুল ওলামায়ে ইসলাম নেতা মুফতি মাহমুদ এবং মওলানা হাজারাভীসহ নেতৃবৃন্দও সে সময় একই ধরনের অভিযোগ তুলেছিলেন। ['পূর্বদেশ' ২১ মার্চ '১৯৭০]

সত্তরের নির্বাচন এবং জামাতের অন্তর্ঘাতী রাজনীতি

পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলাম রক্ষার উদ্দেশ্যে বাঙালী জাতীয়তাবাদ, 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রকে প্রতিহত করার কর্মসূচী নিয়ে জামাতে ইসলামী '৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলো। এই পর্যায়ে পূর্ব বাংলায় মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোকে জামাত আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে, নির্বাচনী প্রচারণার চাইতে অনেক বেশী শুরুত্বের সঙ্গে দলটি এদের বিরুদ্ধে অভিযানকে সর্বাত্মক করে তোলে। উল্লেখ্য যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীর কারণে ভুট্টো গঠিত পাকিস্তান পিপলস পার্টিকেও প্রথম থেকেই জামাত 'ইসলাম বিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো।

ব্যাপক প্রচারণা এবং বিপুল অর্থব্যয় করা সত্ত্বেও নির্বাচনে জামাতে ইসলামীকে মারাত্মকভাবে পরাস্থ হতে হয়। সারা পাকিস্তানে মনোনীত ২০০ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৪ জন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন, পূর্ব বাংলার অধিকাংশ আসনে জামাতীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। ঢাকার একটি আসনে ৮০ হাজারের বেশী ভোটের ব্যবধানে পরাজিত প্রাদেশিক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম 'যুক্তির চাইতে ভাবাবেগে পরিচালিত' নির্বাচনের ফলাফলে দুঃখ প্রকাশ করে এক অভিযোগে বলেছিলেন যে 'শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষেত্রেও' নির্বাচনী আইন প্রতিপালিত হয় নি। তিনি 'ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলন' অব্যাহত রাখার প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে বলেন ঃ 'প্রতিপক্ষ দলগুলির ঘৃণ্য প্রচারণা ও ভয়াবহ বিদ্বেষের মুখে প্রায় সব কয়টি আসনেই দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে জামাতের সফলতা গৌরবজনক।' [দৈনিক 'সংগ্রাম' ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০]

ওদিকে পাকিস্তান জামাতের সেক্রেটারী জেনারেল চৌধুরী রহমত এলাহী ঘোষণা করেছিলেন যে 'ইসলামী বিধিসম্মত দেশের অখন্ডত্বের সহায়ক এবং

কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক' না হলে আওয়ামী লীগ প্রণীত শাসনতন্ত্রকে তার দল প্রত্যাখ্যান করবে, কেননা, পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম ইসলাম এবং এর পরিপন্থী 'কোনো শাসনতন্ত্রই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।' [সংগ্রাম ৪ জানুয়ারী ১৯৭১]

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জামাতে ইসলামীর এমনিতর অবস্থান পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধক হয়েছিলো। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালী বিরোধী একই ভূমিকার নেতৃত্ব নিয়েছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো ঃ 'সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক সরকার পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়' বলে যুক্তি উত্থাপন করে তিনি 'দুই প্রদেশের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবী জানিয়েছিলেন। ভুট্টোর এই অবস্থান অচিরেই মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে স্বাধীনতার দাবীতে বাঙালী জাতি একযোগে সোচ্চার হয়ে ওঠে (১ মার্চ, '৭১)।

ভুট্টো-বিরোধী মনোভাবের সুযোগকে ব্যবহার করে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে নির্বাচনে প্রত্যাখ্যাত জামাত আবার পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে পা রেখেছিলেন। '৭১-এর মার্চে চলমান অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে জামাতী কার্যক্রমের পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে এর সর্বশক্তি নিয়োজিত ছিলো কেবল 'সমাজতন্ত্রী' ভুট্টোর বিরুদ্ধে ঃ বাঙালীর পক্ষাবলম্বনের চাতুরী গ্রহণের মাধ্যমে দলটি পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার পাশাপাশি নিজেকে দৃঢ়ভিত্তি সংগঠনে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছিলো। পূর্ব বাংলার সপক্ষে জামাত যে এসময় সামান্যও ভূমিকা নেয়নি, তার বড় প্রমান মওদুদীর এক বিবৃতি, এতে তিনি একই যোগে ভুট্টো এবং শেখ মুজিবের সমালোচনা করে আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ 'কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যারা শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাচ্ছেন, তাদের একথা জানা দরকার যে তেমন কোনো শাসনতন্ত্র সফল হবে না এবং সেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটিকেই দায়ী থাকতে হবে।' [পাকিস্তান অবজারভার, ১৭ ফেব্রুয়ারী, '৭১]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ 'শান্তি কমিটি' এবং গোলাম আযমের ভূমিকা

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাঙালী হত্যার অভিযান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে জামাতে ইসলামীর প্রকৃত উদ্দেশ্য উন্মোচিত হয়েছিলো। ৪ এপ্রিল প্রথম সুযোগেই ঘাতক জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গোলাম আযম পাকিস্তান রক্ষার প্রচেষ্টার 'পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের' কথা ঘোষণা করেছিলেন। ৬ এপ্রিল দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের পর তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে 'ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশ' আখ্যায়িত করে বলেন যে 'ভারতের এই অভিসন্ধি নস্যাৎ করার জন্য প্রদেশের জনগণ ও তার দল দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবে।' ['পূর্বদেশ' ৫ এপ্রিল, 'দৈনিক পাকিস্তান' ৭ এপ্রিল, ১৯৭১]

'দুষ্কৃতকারী' হিসেবে কথিত মুক্তিযোদ্ধাদের হিংসাত্মক ও রাষ্ট্রবিরোধী নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে সকল প্রকার সশস্ত্র বাহিনীকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'শান্তি কমিটি' গঠনের ব্যাপারে

জামাতে ইসলামী প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলো (১০–১৫ এপ্রিল, '৭১)। কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খয়েরুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত প্রাদেশিক 'শান্তি কমিটি'র তিন নম্বর সদস্য ছিলেন গোলাম আযম। 'শান্তি কমিটি'র প্রথম বৈঠকে পাকিস্তানের 'অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষা এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার 'শপথ করে গৃহীত এক প্রস্তাবে জনগণকে 'কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত করার'ও আহবান জানানো হয়েছিলো, যাতে তারা 'ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনদের মোকাবিলা করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে জেহাদে যোগ দেয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকেন।' ['পূর্বদেশ,' ১১ এপ্রিল দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ ও ২৩ এপ্রিল, '৭১]

এপ্রিলেই 'শান্তি কমিটি'র তৎপরতা শুরু হয়েছিলো ঃ এর সদস্যরা হানাদার সেনাবাহিনীকে বিভিন্নস্থানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো, স্বাধীনতাকামীদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিতো এবং সহযোগিতা করতো নারী নির্যাতনেও। 'শান্তি কমিটি'র এই উত্তম কাজের প্রশংসায় এমনকি জেনারেল টিক্কা খানও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, 'গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করার' এবং 'শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার' কাজে 'ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার' জন্য তিনি এর প্রশংসা করেছিলেন বিভিন্ন ভাষণে। টিক্কা খানের সুরে একই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন গোলাম আযমও, 'আজাদী দিবস'এর ভাষণে তিনি ১৪ আগষ্ট বলেন ঃ 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য শান্তি কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শান্তি কমিটি যদি দুনিয়াকে জানিয়ে না দিত যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশকে অখণ্ড রাখতে চায়, তবে পরিস্থিতি হয়তো অন্যদিকে মোড় নিত।···দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর, তাই মানুষকে বোঝানোর দায়িত্ব শান্তি কমিটির হাতে তুলে নিতে হবে।·····ঘরে ঘরে যেসব দুশমন সৃষ্টি হয়েছে তারা বাইরের দুশমনের চাইতে অনেক বেশী বিপজ্জনক···তাদেরকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে।' এই ভাষণে গোলাম আযম আরো বলেন ঃ 'পাকিস্তান টিকে থাকলে আজ হোক, কাল হোক বাঙালী মুসলমানদের হক আদায় হবে। কিন্তু আজাদী ধ্বংস হলে মুসলমানদেরকে শৃগাল কুকুরের মত মরতে হবে।' [দৈনিক 'পাকিস্তান,' ১৬ আগষ্ট, '৭১]

'রাজাকার ও বদর বাহিনী'র প্রতিষ্ঠা ঃ হত্যার রাজনীতিতে জামাত

স্বাধীনতা যুদ্ধকে নস্যাতের প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণের উদ্দেশ্যে জামাতে ইসলামী 'রাজাকার' ও 'আল-বদর বাহিনী' গড়ে তুলেছিলো। খুলনায় ৯৬ জন সদস্যের সমন্বয়ে মে মাসে 'রাজাকার' বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন জামাতের বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ, অন্যদিকে শিক্ষিত রোকন এবং ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মীরা ছিলো 'বদর বাহিনী'র সদস্য। মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং অগ্নিসংযোগসহ নির্যাতনের ক্ষেত্রে রাজাকাররা নিয়েছিলো প্রধান ভূমিকা, বদর বাহিনীর কার্যক্রমের মধ্যে ছিলো স্বাধীনতাকামীদের খুঁজে বের করে হত্যা করা, সেমিনার আয়োজন ও প্রচারপত্র বিতরণের মাধ্যমে

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাঙ্গালীদের 'পাকিস্তানী ও ইসলামী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী' জনগোষ্ঠিতে পরিণত করার চেষ্টা চালানো এবং প্রয়োজনে সশস্ত্রভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের মোকাবিলা করা। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিনগুলিতে বিশেষ করে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা বদর বাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন।

রাজাকারদের স্বল্পকালের মধ্যেই সরকার আধা-সামরিক বাহিনীতে রূপান্তরিত করেছিলো। 'দুস্কৃতকারী' মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে 'অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করার জন্য' টিক্কা খান এবং নিয়াজীর মতো জেনারেলরাও এদের প্রশংসা করেছেন, রাজাকারদের 'প্রসন্ন বদন, আত্মপ্রত্যয় ও উচ্চ মনোবল' দেখে তারা 'অত্যন্ত মুগ্ধ' হয়েছিলেন। গোলাম আযমও একই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, ১ সেপ্টেম্বর করাচীতে তিনি বলেন ঃ 'পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করার জন্য দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে রাজাকাররা খুবই ভালো কাজ করছে।' ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার হোটেল 'এম্পায়ার'-এর জামাতী সমাবেশে তিনি বলেন ঃ 'পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্যই জামাত রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ...জামাতে ইসলামীর কর্মীরা মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শ বির্সজন দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে রাজী নয়। তারা শাহাদাত বরণ করে পাকিস্তানের দুশমনদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা মরতে রাজী তবুও পাকিস্তানকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে রাজী নয়।' [দৈনিক পাকিস্তান, ২ ও ২৬ সেপ্টেম্বর, '৭১]

রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ইউসুফ এক রাজাকার সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ১১ অক্টোবর খুলনায় বলেছিলেন ঃ 'দুস্কৃতকারী ও ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের দমন এবং দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর যেকোন অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য আমাদের সাহসী জনগণ সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের পেছনে থাকবে।' [দৈনিক পাকিস্তান, ১৩ অক্টোবর, '৭১]।

'বদর দিবস' পালনোপলক্ষে ঢাকার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ইসলামী ছাত্র সংঘের সমাবেশে 'পাকিস্তানের অখন্ডতা ও সংহতি রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয়'-এর কথা ঘোষণা করা হয়েছিলো। ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে 'পূর্ব পাকিস্তান' শাখার সভাপতি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ 'দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্থানের নাম ও মানচিত্র মুছে ফেলা'সহ চার দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে বলেছিলেন ঃ 'এই ঘোষণা বাস্তবায়িত করার জন্য শির উঁচু করে, বুকে কোরআন নিয়ে মর্দে মুজাহিদের মতো এগিয়ে চলুন। প্রয়োজন হলে নয়া দিল্লী পর্যন্ত এগিয়ে আমরা বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করবো।' ইসলামী ছাত্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী 'বদর দিবসের শপথ' পাঠ করেছিলেন এবং এর ভিত্তিতে উচ্চারিত হয়েছিলো প্রধান কয়েকটি শ্লোগান ঃ 'আমাদের রক্ত পাকিস্তান টিকবে', 'বীর মুজাহিদ অস্ত্র ধর'—ভারতকে খতম কর,' 'ভারতের চরদের খতম কর' এবং 'মুজাহিদ এগিয়ে চল— কলিকাতা দখল কর।' উল্লেখ্য যে সমাবেশে ঢাকা শহর ছাত্র সংঘের সভাপতি মুহাম্মদ শামসুল হক সভাপতিত্ব করেছিলেন। [দৈনিক পাকিস্তান, ৮ নভেম্বর, '৭১]

স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরোধী ভূমিকাকে অবলম্বন করে জামাতে ইসলামী একই যোগে পাকিস্তানের রাজনীতি এবং কেন্দ্র ও প্রদেশ সমূহের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠালাভের উদ্যোগ নিয়েছিলো। কিন্তু 'সমাজতন্ত্রী' ভুট্টোর পিপলস পার্টি ছিলো পথটিতে প্রবল অন্তরায়। ৮৮ টি আসনের বিরুদ্ধে ৪টি আসনের অধিকার নিয়ে নিষ্ফল প্রতিযোগিতার ঝুঁকি নেয়ার পরিবর্তে তাই জামাত এগিয়েছিলো ভিন্ন পথে। দলটি এই মর্মে যুক্তি উত্থাপন করে যে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ায় 'পূর্ব পাকিস্তানে' নির্বাচনী ফলাফল অস্বীকৃত হয়েছে, আর তাই সমগ্র পাকিস্তানের ফলাফলও বাতিল করা উচিত। এই যুক্তির সূত্র ধরে জামাতের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল চৌধুরী রহমত এলাহী ২৩ মে করাচীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে সারাদেশে নতুন আদম শুমারীর ভিত্তিতে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করার দাবী জানিয়েছিলেন।

এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তাঁর অভিমত ছিলো 'পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় এলাকায় উপনির্বাচন হতে পারে।' জামাতকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন ঃ 'যারা নির্বাচনে হেরে গেছে, তাদের পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের সুযোগ নেয়া উচিত নয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সিদ্ধান্তও জামাতের বিরুদ্ধে গিয়েছিলো। ২৮ জুনের ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন যে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের 'নির্দোষ' প্রতিনিধিদের সদস্যপদ বহাল থাকবে এবং 'সংহতি বিরোধী'দের শূন্য আসনগুলিতে কেবল উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইয়াহিয়া তার ভাষণে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিয়েছিলেন ঃ ১) একদল বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে তিনি স্বয়ং একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন, সেটা সংশোধনীর জন্য শুধু জাতীয় পরিষদে পেশ করা হবে; এবং ২) পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে আগামী চার মাসের মধ্যে তিনি 'জনপ্রতিনিধিদের হাতে' ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

জামাতে ইসলামী ইয়াহিয়ার ফর্মূলাকে 'দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা' হিসেবে বর্ণনা করে উপনির্বাচনের প্রশ্নে বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছিলো। কেন্দ্রীয় অস্থায়ী আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন (২৩ জুলাই, '৭১) ঃ বিগত নির্বাচনে যারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন, তাদেরকেই শূন্য আসনগুলিতে নির্বাচিত ঘোষণা করা হোক।' গোলাম আযমের মতো তিনিও জামাতকে 'পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং অবিলম্বে 'রাষ্ট্রদ্রোহি তার' অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার ও শাস্তির দাবধ জানান। [দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ জুলাই, '৭১]

পাকিস্তান ভিত্তিতে ক্ষমতালাভের অনিশ্চয়তার পর জামাতে ইসলামী 'পূর্ব পাকিস্তানের' রাজনীতিতে আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রদেশের অবস্থাকে 'স্বাভাবিক' প্রমাণ করার লক্ষ্য নিয়ে একটি বেসামরিক মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হলে নিজেদের অবস্থানকে সংহত করার জন্য গোলাম আযমরাও তৎপরতা বাড়িয়ে দেন। এই প্রক্রিয়ায়

জামাত 'উদ্দীপনার সঙ্গে' পাকিস্তানের 'আজাদী দিবস' উদযাপন করে, কার্জন হলের এক সিম্পোজিয়ামে ১৪ আগষ্ট গোলাম আযম 'কায়েদে আজমের' উদ্ধৃতি উচ্চারণ করে বলেন ঃ 'পাকিস্তান টিকে থাকার জন্য এসেছে। তবে পাকিস্তানকে টিকে থাকতে হলে এর আদর্শকে পুরোপরি বাস্তবায়িত করতে হবে।' অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে 'আজাদী দিবস' পালিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন ঃ 'শত্রু ও মিত্রের মানদণ্ডে এবার পাকিস্তান যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছে।' [দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ আগষ্ট, '৭১]

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা 'বেসামরিক সরকার' প্রদর্শনের কৌশল হিসেবে ৩ সেপ্টেম্বর 'বাঙালী' ডাঃ এ, এম, মালিককে গভর্ণর নিয়োগ করে, তার নেতৃত্বে ১৭ সেপ্টেম্বর গঠিত মন্ত্রীসভায় জামাতের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান (শিক্ষা) এবং বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ (পূর্ত ও রাজস্ব) নিযুক্তি নিয়েছিলেন। অগণতান্ত্রিক পন্থায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রশ্নে ব্যাখ্যাদানকালে প্রাদেশিক আমীর গোলাম আযম বলেছিলেন ঃ 'প্রদেশের সক্রিয় জনগণ এখন দু'ভাগে বিভক্ত। একদল পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়, আর একদল পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। জামাতে ইসলামী শেষোক্ত দলভূক্ত।'

২৫ সেপ্টেম্বর দলীয় মন্ত্রীদের সংবর্ধনা উপলক্ষে হোটেল 'এম্পায়ার'-এর এক জামাতী সমাবেশে গোলাম আযম আরো বলেছিলেন ঃ 'যে উদ্দেশ্য নিয়ে জামাত রাজাকার বাহিনীতে লোক পাঠিয়েছে, শান্তি কমিটিতে যোগ দিয়েছে, সে উদ্দেশ্যেই মন্ত্রীসভায় লোক পাঠিয়েছে। সংহতি রক্ষা এবং দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা যে কাজ করছি সেই কাজে সাহায্য করার জন্যই দু'জনকে মন্ত্রীসভায় প্রেরণ করা হয়েছে।' অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় জামাতের ডেপুটি আমীর মওলানা আবদুর রহীম বিশ্বের মুসলমান, পাকিস্তানের জনগণ ও অখণ্ডতা এবং বিশেষ করে জামাতী মন্ত্রীদ্বয়ের জন্য দোয়া করে মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন। [দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ সেপ্টেম্বর, '৭১]

মন্ত্রিত্বলাভের পরপরই শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খান বাঙ্গালীদের 'পাকিস্তানী মুসলমান' বানানোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তার এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিলো দলীয় নির্দেশ ঃ 'কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক' শিক্ষায় বিশ্বাসী জামাত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই তৎকালীন পরিস্থিতির জন্য দায়ী মনে করতো। 'আজাদী দিবস'-এর ভাষণে গোলাম আযম বলেছিলেন ঃ গত ২৪ বছর যাবৎ পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে বলেই আজ ঘরে ঘরে পাকিস্তানের দুশমন সৃষ্টি হয়েছে এবং এরা পাকিস্তানের পহেলা নম্বরের দুশমন ভারতকে বন্ধু বলে মনে করছে। ...বর্তমান শিক্ষা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই এ জন্য দায়ী করতে হবে।' [দৈনিক পাকিস্তান ১৬ আগষ্ট, '৭১] *

---

* পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

একাত্তরের পরাজয় জামাতে ইসলামীকে বিপর্যয় কবলিত করেছিলো। বাংলাদেশে সংগঠনটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, ব্যাপক হারে জামাতী পলায়ন চলতে থাকে, আব্বাস ও ইউসুফসহ গ্রেফতার হন নেতাদের কেউ কেউ এবং গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়। সে অবস্থায় পাকিস্তানে অবস্থানরত গোলাম আযম 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার আন্দোলন'-এর নেতৃত্ব নিয়েছিলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে পাকিস্তানী জামাত ভুট্টো সরকারের বিরোধিতা করেছিলো। হজ্বের নামে সৌদি আরব গিয়ে বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য গোলাম আযম বাদশাহ ফয়সলের কাছে 'অনুরোধ' জানানোর পাশাপাশি এদেশের বিপন্ন 'মুসলমানদের পক্ষ থেকে সাহায্যও প্রার্থনা করেছিলেন। [জানুয়ারী, '৭৩; দেখুন, 'জননেতা গোলাম আযম', পৃ—২০] লণ্ডনকেন্দ্রিক প্রবাস জীবনে (১৯৭৩-৭৮) বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়েছিলো এবং এই সময়কালই তিনি দেশের অভ্যন্তরে জামাতের পুনরুত্থানের আয়োজনকেও সম্পন্ন করেছিলেন।

এদিকে '৭৬ সালের 'রাজনৈতিক দলবিধি'র সুযোগে গঠিত 'ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ'কে কেন্দ্র করে জামাতীদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন মওলানা আবদুর রহীম (২৩ অক্টোবর, '৭৭) '৭৮ সালের ১১ জুলাই অসুস্থ মাকে দেখার জন্য পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে আসার পর গোলাম আযম সংগঠনে সংঘাত ডেকে আনেন। জামাতে ইসলামীর নামটিতে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে আই ডি এল বিভক্ত হয়ে যায়, গোলাম আযমের নেপথ্য নেতৃত্বে আয়োজিত এক সম্মেলনে গঠিত হয় 'জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ' (২৫-২৭ মে, '৭৯)। '৭১-এ 'পূর্ব পাকিস্তানের' শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খানকে 'ভারপ্রাপ্ত আমীর ও রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও 'পূর্ব পাকিস্তানের' রাজস্বমন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফকে সেক্রেটারী জেনারেল পদে নির্বাচিত করা হয়, অঘোষিত 'আমীর' পদে বহাল হন গোলাম আযম। পাকিস্তান যুগের সকল নীতি ও কর্মসূচীকেই অব্যাহত রেখে সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয় ঃ 'আযাদ দেশ' বাংলাদেশে 'নতুন করে দাওয়াত ও কর্মসূচীর ভাষা দিলেও (জামাতের) মূল দাওয়াত ও কর্মসূচীর শাশ্বত রূপ বহাল থাকবে।' [বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী', সেপ্টেম্বর, ৭৯, পৃ—২৭]

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতার জন্য কেবল নয়, স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশ সম্পর্কিত মূল্যায়নের কারণেও প্রথম থেকে জামাতে ইসলামীকে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়। ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে আব্বাস আলী খান তার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন (৭ ডিসেম্বর '৮০) ঃ 'একাত্তরে আমরা ভুল করিনি।' শুধু তা-ই নয়, সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘোষণায় বলা হয়েছে ঃ 'পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক এটা অবশ্যই জামাত চায়নি।' কেননা, 'সে সময় জয় বাংলা ও সমাজতন্ত্রের শ্লোগানই প্রধান ছিল। নারায়ে তাকবীর—আল্লাহ আকবার তখন শুনা যায়নি।' আর এ জন্যেই 'তখন ভারতের আধিপত্যের ভয়ে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আতংকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইসলাম ও মুসলমানদের

জন্য মঙ্গলকর হবে বলে (জামাত) বিশ্বাস করতে পারেনি।' আত্মপক্ষ সমর্থনের লক্ষ্য নিয়ে এরপর দলটি বলেছে ঃ 'তাই বলে টিক্কা খানের সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে রক্ষা করার নামে যত অমানবিক কাজ করেছে তা কখনই জামাত সমর্থন করেনি।' সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রসঙ্গতঃ বলা হয়েছে ঃ '৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত জামায়াতের লোকদের নৈতিক মান যা ছিল আজও আল্লাহ্‌র রহমতে তা বহাল আছে।' [দেখুন, জামাতের আবেদন,' মে. '৮১, পৃ—৯ ও ১১]।

এমনি ধরনের উদ্ধৃত বক্তব্যের পাশাপাশি বাংলাদেশকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণাসহ জামাত ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা কর্মসূচী তুলে ধরে, কিন্তু বাস্তবে এর সমগ্র তৎপরতা আবর্তিত হতে থাকে গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটিকে ঘিরে। এই উপলক্ষে গঠিত 'নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার কমিটি'র এক সমাবেশে মওলানা ইউসুফসহ জামাতী নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন ঃ 'বেআইনী আইন বাতিল করা না হলে গ্রাম বাংলায় মিছিলের ঢল নামবে এবং তাতে শুধু নাগরিকত্ব নয়, ইসলামী বিপ্লবও সফল হয়ে যাবে।' প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে দেয়া স্মারকলিপিতে কমিটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিষয়টি 'এদেশের কোটি কোটি তৌহিদী জনতার আবেগ-অনুভূতির সাথে জড়িত।' [৬ মার্চ, '৮১, দেখুন 'জননেতা গোলাম আজম, পৃ—৫৫-৫৭]।

দেশপ্রেমিকদের সোচ্চার প্রতিবাদ উপেক্ষিত হয়ে, 'অজ্ঞাত মহলের সমর্থনে জামাতীরা তাদের কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়, ওদিকে গোলাম আযমও বেরিয়ে আসেন 'ভূতল নিবাস' থেকে। কখনো জানাজার নামে, কখনো বা ধর্মীয় জলসার নামে প্রকাশ্যে তার উপস্থিতি বিভিন্ন সময়ে সংঘাতের কারণ ঘটায়, বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে ক্রমাগত তাড়িয়ে ফিরতে থাকে। কিন্তু '৮২-র সামরিক শাসন সেদিনের দ্রুত অবণতিশীল আন্দোলনকে অবলম্বন করে জামাতে ইসলামী পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করে 'কেয়ার টেকার সরকার' গঠনসহ জনপ্রিয় কতিপয় দাবী মুখে নিয়ে জামাতীরা রাজপথেও নেমে পড়ার অবস্থা করে নেয়।

জামাতী আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উন্মোচিত হয়েছিলো '৮৪-র সংলাপকালে। ১০ এপ্রিল এর নেতারা গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবীটিকে প্রধান বিষয়ে পরিণত করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতিবাচক জবাব তাদের ক্ষিপ্ত করে, আবার তারা আন্দোলনে ফিরে যান। বিরোধী জোটগুলির সঙ্গে একযোগে আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়ে এরপর জামাত প্রথমবারের মতো জনগণের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেতে থাকে, সংগঠনও ভিত্তি পায় কোথাও কোথাও। এই পর্যায়ে সরকার-বিরোধীদের প্রশ্রয় জামাতকে সহযোগিতা দেয় এবং দরকষাকষির প্রক্রিয়ায় দলটি আওয়ামী লীগের অনুকরণে '৮৬-র সংসদ নির্বাচনে রাতারাতি অংশ নেয়। মিলিত সংগ্রামের সুফল হিসেবে জামাতের ১০ জন প্রার্থী জয়লাভ করেন, পরাজিত আব্বাস আলী খানরা তথাপি সংসদ নির্বাচন বাতিল করার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এর ভিত্তিতে জামাত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জন করে, সংসদের প্রথম অধিবেশনে যোগদান থেকেও দলীয় সদস্যদের বিরত রাখা হয়। সিদ্ধান্তটি অবশ্য আওয়ামী লীগের অনুকরণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে অচিরেই, কেননা, আন্দোলনের

অঙ্গন পরিত্যাগ করে অবশেষে তারা জাতীয় সংসদে প্রবেশ করেছেন (১ ফেব্রুয়ারী, '৮৭)।

'ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন' নস্যাৎ হওয়ার আশংকাচালিত কতিপয় রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়কে নির্ভর করে 'জনগণের সংগ্রামে' অংশ নেয়ার কৌশল অবলম্বন করলেও জামাতে ইসলামী তার আক্রমণাত্মক সংঘাতের নীতিকেই অব্যাহত রেখেছে। জামাতের প্রধান গোলাম আযম '৮৬-র নভেম্বরেও সংবাদ শিরোনাম হয়েছিলেন ঃ এবার তিনি কিশোরগঞ্জ গিয়েছিলেন ধর্মীয় জলসায় ভাষণ দিতে, ফিরেছেন নিগৃহীত হয়ে। এদিকে চট্টগ্রামে চলেছে জামাতী ছাত্র শিবিরের তৎপরতা। ছাত্র হত্যার ঘটনা ঘটেছে সেখানেও। আর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় জামাতের জন্য কোনো ঘটনাই কোনোদিন 'সর্বশেষ' হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না, এমনটি ঘটতেই থাকবে।

'৪৭-পরবর্তী জামাতে ইসলামী ঃ ধর্মান্ধতা, সংঘাত আর হত্যার রাজনীতি

বাংলাদেশের এই সব সংঘাত কিংবা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে জামাতে ইসলামীর সবাত্মক অবস্থান এবং তৎপরতা আসলে কোনো বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি নয়, পাকিস্তানযুগে জামাতী কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় এগুলির প্রতিটি নতুন নতুন অধ্যায়ের সংযোজন মাত্র। পাকিস্তানের রাজনীতিতে জামাতে ইসলামীর উত্থানই ঘটেছিলো সংঘাত আর হিংসাত্মক বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে, প্রতিষ্ঠালাভের কৌশল হিসেবে বিকৃত এই অমানবিক পন্থাকেই মওদুদী সুচিন্তিতভাবে বেছে নিয়েছিলেন। ফতোয়ার পর ফতোয়া ঘোষণা করে তিনি সংখ্যাহীন মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছেন, তিক্ততা এনেছেন সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, রাজনীতিকেও করেছেন মারাত্মকভাবে কলুষিত। ইসলাম এবং কোরআন ও সুন্নাহর নামে বিরামহীন মিথ্যাচার ও প্রতারণা, ঘোষিত অবস্থান থেকে সুবিধাবাদী বিচ্যুতি এবং নিয়তিত জনগণের স্বার্থবিরোধী অব্যাহত কার্যক্রম পাকিস্তানের সমগ্র সময়ব্যাপী জামাতের রাজনীতিকে প্রভাবিত রেখেছিলো। 'জন্মভূমির শয়তান' এবং 'নাপাকিস্তান' হিসেবে বর্ণিত পাকিস্তানকে মওদুদী তার 'দেহ ও প্রাণ' বানিয়েছিলেন, 'সারা দুনিয়াই এক দেশ, আমার আবাসভূমি' জাতীয় বাগাড়ম্বর পরিত্যক্ত হয়েছিলো। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম নস্যাতের পরিষ্কার উদ্দেশ্য নিয়ে ষাটের দশকে এসে '৫৬-র শাসনতন্ত্রের পুনর্বহালকেই দলের মূল দাবীতে পরিণত করা হয়েছে, জামাত যাকে কেবল 'মন্দের ভালো' হিসেবে মেনে নিয়েছিলো। [দেখুন, গোলাম আযম, 'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন', পৃ—৪৬]।

বিভিন্ন সময়ে জামাতের এমনি ধরনের ভূমিকা গণতন্ত্রের পথকে রুদ্ধ করার পাশাপাশি জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের সংগ্রামকেও বিভ্রান্ত করেছিলো। কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণার মধ্যে মানুষের কিভাবে কোন কল্যাণটি হতে পারতো, ভিন্ন সে প্রসঙ্গে না গিয়েও এখানে উল্লেখ করা দরকার যে এমন একটি

সময়েই জামাত দাঙ্গার ঘটনাটি ঘটিয়েছিলো, পাকিস্তানকে যখন যুদ্ধজোট ও সামরিক বিভিন্ন চুক্তিতে জড়ানোর সাম্রাজ্যবাদী পাঁয়তারা শুরু হয়েছিলো। সে জন্যই প্রয়োজন ছিলো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার এবং মওদুদী সুনিপুনভাবে সে দায়িত্বটি পালন করেছিলেন, দেশবাসীর দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে। পূর্ব বাংলা তো বটেই, এমনকি পাকিস্তানের জন্যও যুদ্ধজোট এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ কখনো মঙ্গলকর প্রমাণিত হয়নি, জামাত তথাপি এ প্রশ্নে কেবল অর্থবহ নিরবতাই পালন করেনি, বরং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নিয়েছিলো প্রবল পরিপন্থী অবস্থান। এই প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের মতবাদকে জামাতীরা আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিলো।

কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক অর্থনীতির হেঁয়ালীপূর্ণ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জামাত মানুষের মৌলিক প্রতিটি অধিকারকেই অস্বীকার করেছে, সামন্তবাদী শোষণবিরোধী নিম্নতম ভূমি সংস্কারকেও দলটি কখনো সমর্থন করেনি। বাঙালী জাতিগত বিকাশের লক্ষ্যাভিসারী আইউব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের মধ্যেও জামাত কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জনগণের 'আকাঙ্ক্ষা' আবিষ্কার করে সাম্প্রদায়িক উম্মাদনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো। [প্রাদেশিক সেক্রেটারীর পূর্বোল্লিখিত ২৮ আগষ্ট '৬৯-এর বিবৃতি দেখুন]

এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই স্বাধীনতা যুদ্ধকালে জামাতের বিপজ্জনক উত্থান ঘটেছিলো। অন্য ডানপন্থীদের তুলনায় শক্তিশালী এবং সুশৃঙ্খল সংগঠন থাকার সুবিধে কাজে লাগিয়ে দলটি খুব দ্রুত প্রাদেশিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছিলো, দলীয় সদস্যদেরও নামিয়েছিলো প্রত্যক্ষ বিরোধিতায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলিতে বাঙালী জাতিসত্তার স্থায়ী বিনাশ সাধন ছিলো প্রকৃত পক্ষে সকল জামাতী আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য। 'পূর্ব পাকিস্তানের' শিক্ষামন্ত্রী পদে নিযুক্তিলাভের পর থেকেই 'পাকিস্তানী আদর্শভিত্তিক' পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের জন্য আব্বাস আলী খান শিক্ষা ব্যবস্থার 'আমূল পরিবর্তনের' উদ্যোগ নিয়েছিলেন; ওদিকে 'সমাজতন্ত্রী' ভুট্টোকে প্রতিহত করার কৌশল হিসেবে 'পূর্ব পাকিস্তানের' পক্ষে অসঙ্গত কতিপয় দাবি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে গোলাম আযমও বাঙালী জনগোষ্ঠীকে জামাতী চিন্তাধারার অনুসারী বানানোর ধূর্ত চাতুরী নিয়েছিলেন।

এই সময়কালে গণতন্ত্র সম্পর্কেও জামাতের মনোভাব উন্মোচিত হয়েছিলো। 'বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত' হওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকার গোলাম আযম টাঙ্গাইল গিয়েছিলেন; তারপরও তারা 'প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের' হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে উচ্চকিত হতে লজ্জা বোধ করেননি। শুধু তা-ই নয়, শাসনতন্ত্র রচনার জন্য প্রেসিডেন্ট একদল বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর গোলাম আযমের নেতৃত্বে প্রাদেশিক মজলিশ-ই শুরা 'শুকরিয়া' জ্ঞাপন করেছে, ওদিকে মওদুদী প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, জাতীয় পরিষদের স্থলে ইয়াহিয়ার নিজেরই উচিত শাসনতন্ত্রটি রচনা করা।

গণতন্ত্র সম্পর্কিত এই স্বেচ্ছাচারী বিশ্বাস এবং হত্যা সংঘাত আর প্রতারণার পাকিস্তানী উত্তরাধিকার নিয়েই বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামাতে ইসলামীর পুনরুত্থান ঘটেছে; ওদিকে গোলাম আযমও এমন এক জন্মভূমির 'মহব্বতে'র আকর্ষণে ফিরে এসেছেন, যাকে তার 'আমীর' মওদুদী 'শয়তান' এবং 'জাতিপূজা' বলে আখ্যা দিয়ে গেছেন। পাকিস্তানের বিরোধিতা করেও মওদুদী যেমন ফতোয়া ঘোষণার পথে পাকিস্তানের 'আমীর' হতে চেয়েছিলেন, গোলাম আযমও তেমনটিই চাচ্ছেন। সরকারী ব্যর্থতার সূত্র ধরে তিনিও এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে ধর্মান্ধতাকে সংক্রমিত করছেন, সংঘাত ঘটানোর পরিষ্কার উদ্দেশ্য নিয়ে 'গাঁয়ে না মানা মোড়লের' মতো তিনি ক্রমাগত তত্ত্বের পর তত্ত্বের উপস্থাপনা করে চলেছেন। মানুষের কল্যাণ একে দিয়ে হওয়ার কোনো কারণ কখনো ঘটেনি, ফলে তার তৎপরতার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের অন্বেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সে প্রক্রিয়ায় দেখা যাবে, পাকিস্তানী এই নাগরিকটি কতো নিষ্ঠা আর নিপুণতার সঙ্গে তার দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে গোলাম আযমের কয়েকটি বক্তব্যের উল্লেখ করা হলো, এগুলি তার রচিত 'আমার দেশ বাংলাদেশ' এবং 'ইসলামী ঐক্য ও ইসলামী আন্দোলন' থেকে গৃহীত হয়েছে। 'বাংলাদেশ আন্দোলনের রাজনৈতিক তুফানে মুসলিম জাতীয়তাবোধ খতম হয়েছে বলে সাময়িকভাবে ধারণা সৃষ্টি হলেও এদেশের মুসলিম জনতা ঐ চেতনার বলিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছে।' এরপর তিনি আর একধাপ এগিয়ে বলেছেন ঃ 'বাংলাদেশ এখন আর 'বাঙ্গালী' জাতির বাসস্থান নয়।' এবং 'ইতিহাস আমাদেরকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে, বাংলাদেশের অস্তিত্ব বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধের বিরোধী।'

'আদর্শিক মানে আমরা মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত।' কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার পাশাপাশি 'মোড়লের' মতো তিনি বলেছেন ঃ 'বাংলাদেশকে একটি আযাদ দেশরূপে বাঁচিয়ে রাখতে হলে 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। ... বাংলাদেশের আযাদীর জন্য ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অত্যন্ত মারাত্মক। যে দ্বিজাতিতত্ত্ব পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল সে নীতিই বাংলাদেশের হেফাজত করতে পারে। ...আর ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাদেরই নতুন রূপ বাঙ্গালী জাতীয়তা।'

গোলাম আযম এরপর 'আযাদী' রক্ষার পথনির্দেশ করেছেন ঃ 'শুধু অস্ত্র দ্বারা দেশ রক্ষা হয় না। অস্ত্রের পেছনে সে মানুষটি কাজ করছে সে কোন জযবা ও উদ্দেশ্য নিয়ে তার হাতের অস্ত্র ব্যবহার করছে এরই উপর দেশরক্ষা নির্ভর করছে। যদি ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের রোগ দেশের জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মনমগজে স্থানলাভ করে তাহলে মানসিক দিক দিয়ে তারা ভারতের সাথে লড়াই করার কোন প্রেরণাই পাবেনা। ... এদেশের আযাদীর প্রকৃত রক্ষক তারাই যারা এদেশের মুসলিম জনতার আকীদা বিশ্বাসকে জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তি মনে করে। ... আল্লাহ্‌র দ্বীনের স্বার্থে আযাদী রক্ষার জন্য জীবন দিলে

শহীদের মহান মর্যাদা লাভ হবে বলে বিশ্বাস থাকলে ঐ চেতনা হাজার গুণে বেশী মজবুত হবে।' উপদেশের এই পর্যায়ে তিনি পরকালে 'সত্যিকার শহীদী জীবন' এর আশ্বাস দিয়ে হাজির করেছেন তার মূল কথাটি ঃ 'আযাদী রক্ষার জন্য ঐ শহীদী জযবা সৃষ্টি করতে হলে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে উন্নীত করতে হবে।'

বাংলাদেশের জামাতে ইসলামীর রাজনীতিও গোলাম আযমের বক্তব্যকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। তার নাগরিকত্ব তথা 'আমীর' হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠার দাবিটি ব্যতীত অন্য কোনো কর্মসূচীকেই জামাত জনগণের মুক্তির জন্য উপস্থাপিত করেনি। পাকিস্তানযুগে জামাতী রাজনীতির স্বরূপ দেখেছি, দেখেছি এর স্বাধীনতা যুদ্ধকালের ভূমিকাও এবং বড় কথা ঃ অপরাধ স্বীকারের ধারেকাছে না গিয়েও গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নে বলেছে যে 'কেবলমাত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতার কারণে' সিদ্ধান্তটি গ্রহণ 'অন্যায়' হয়েছে। গোটা বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন যেখানে বিজড়িত, লক্ষ লক্ষ মানুষ যার জন্যে জীবন দিয়েছে (এবং জামাতীদের হাতেও), সর্বাত্মক সেই স্বাধীনতা যুদ্ধকেও যে দলটি 'কেবলমাত্র' মনে করে, সে জামাতে ইসলামীকে দিয়ে বাংলাদেশ বা দেশবাসীর সামান্য মঙ্গলবিধানও সম্ভব নয় মনে করাটা কোনো দিক থেকেই অসঙ্গত নয়। অভিজ্ঞতার আলোকে বরং বলা যায়, সংঘাত আর সন্ত্রাসের রাজনীতিকেই জামাত অব্যাহত রাখবে এবং অত্যন্ত অন্যায় এই অমানবিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতেও তারা কথায় কথায় চলে যাবে ইসলাম এবং কোরআন ও সুন্নাহর আশ্রয়ে, অবমাননা ঘটাবে এগুলির। (সংক্ষেপিত)

১৩ মার্চ ১৯৮৭

৪

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা

শাহ আহমদ রেজা

জামাতে ইসলামীর অতীত ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক ও নৃশংসতাপূর্ণ অধ্যায়টি রচিত হয়েছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে, যখন তারা পাক হানাদার বাহিনীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দালাল হিসেবে নিয়োজিত ছিলো গণহত্যা, নারী ধর্ষণ ও লুন্ঠন কর্মে। এই অধ্যায়টি সঙ্গত কারণেই স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে। বিচিত্রায় প্রকাশিত শাহ আহমদ রেজার এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁরই লেখা বিচিত্রার অপর একটি প্রচ্ছদ কাহিনী 'পাকিস্তানের নাগরিক গোলাম আযম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' (১.৪.৮৮)

শেষোক্ত নিবন্ধটি এমন এক সময় প্রকাশিত হয়েছিলো যখন সরকার ঘোষণা দিয়েছিলো—ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যে সব বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে অবস্থান করছেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়া হলেও '৭১-এর ঘাতক পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমের ক্ষেত্রে রহস্যজনক কারণে সরকার এখন পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থানগ্রহণকারী কয়েকটি মাত্র রাজনৈতিক দলের মধ্যে সবচেয়ে উদ্ধত, সক্রিয় এবং নৃশংস দলটি ছিলো জামাতে ইসলামী। এই বিরোধিতা কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি ছিলো না, ১৯৪১ সালের প্রতিষ্ঠাকালীন নীতির সূত্র ধরেই জামাত তার একাত্তরের ভূমিকা নির্ধারণ করেছিলো। 'হকুমত-ই-এলাহিয়া' বা আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে জামাতে ইসলামী গঠনকালে এর জনক এবং তাত্ত্বিক ভিত্তির নির্মাতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী গণতন্ত্র এবং ভৌগোলিক বা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ধারণাকে ইসলাম-পরিপন্থী আখ্যা দিয়েছিলেন, তার মতে বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিলো ভারতীয় মুসলমানদের জন্য 'অনুচিত' এবং 'আত্মঘাতী'। অন্য কথায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসনকে তিনি সমর্থন করেছেন, ফলে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবি-সম্বলিত ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের দিকে চোখ পড়লেই তার আত্মায় 'মাতম' শুরু হয়ে যেতো।

পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও বৃটিশরা চলে যাওয়ার পর 'হিন্দু' ভারতের পাঠানকোট থেকে মওদুদী সদলবলে 'মুসলিম' পাকিস্তানের লাহোরে চলে আসেন, এসময় তার দলের ৫৩৩ জনের মধ্যে পাকিস্তানবাসী সদস্য

সংখ্যা ছিলো ৩০৬ জন। এরপর তার দৃষ্টি পড়ে পূর্ব বাংলার দিকে ঃ ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক শাখা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত জনৈক অবাঙালী জামাতী। বাংলাভাষীদের মধ্যে মওলানা আবদুর রহীম যুক্ত ছিলেন প্রথম থেকেই, উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে গোলাম আযম যোগ দেন ১৯৫৪ সালে, 'মুত্তাফিক' বা সহযোগী সদস্য থেকে সেক্রেটারী হিসেবে প্রাদেশিক নেতৃত্বে উন্নীত হন তিনি ১৯৫৬ সালে। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানেও জামাতে ইসলামী তার প্রতিষ্ঠাকালীন নীতিকে অপরিবর্তিত রাখে, ১৯৫২ সনে সংশোধিত গঠনতন্ত্র 'কোরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের' কর্মসূচী সংযোজিত হয়।

আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিনয়

পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ বিরোধিতার নীতি অব্যাহত রাখতে গিয়ে জামাতে ইসলামী প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের জাতিগত বিকাশের প্রশ্নটিকে অবদমনের প্রচেষ্টায় অংশ নেয়, ইসলাম এবং পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন হওয়ার আশংকা তুলে ধরে দলটি স্বায়ত্তশাসনের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের সরাসরি বিপক্ষে চলে যায়। এ প্রশ্নে পাকিস্তানী শাসকদের সেবাদাসের ভূমিকা রাখলেও বাঙালী বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পরিণতিকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে ধুরন্ধর 'বেঁটে মওলানা' আবুল আলা মওদুদী প্রকাশ্য-বিরোধিতার পরিবর্তে ভেতর থেকে ছুরিকাঘাতের অন্তর্ঘাতমূলক কৌশল বেছে নেন। ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন বলিষ্ঠতা পেতে থাকলে জামাতে ইসলামীও সময়ে সময়ে এতে অংশ নেয়ার ভনিতা দেখাতে শুরু করে। আন্দোলনের সাফল্যকে প্রতিহত করার পরিষ্কার উদ্দেশ্যে অন্য চারটি ডানপন্থী দলের সঙ্গে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে জামাত 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন' (পিডিএম) গঠন করে। মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফার পাল্টা কর্মসূচী হিসেবে পিডিএম-এর ৮ দফার মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের নামে পূর্ব বাংলার স্বপক্ষেও দাবী উত্থাপন করা হয়।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে ঘেরাও-এর মাধ্যমে মওলানা ভাসানী সামরিক একনায়ক আইউব বিরোধী সংগ্রামের সূচনা করলে অবশ্যম্ভাবী গণ-অভ্যুত্থানকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে যেতে না দেয়ার প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রে জামাতে ইসলামী সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারী গঠিত হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি'। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে প্রতিশ্রুত হলেও জামাতে ইসলামীর উদ্দেশ্য যে পূর্ব বাংলার স্বার্থে নিবেদিত ছিলো না তার প্রমাণ মেলে অচিরেই। সংগ্রামী ছাত্র সমাজের যে ১১ দফার ভিত্তিতে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান প্রচন্ডতা পেয়েছিলো তাকে নস্যাত করার উদ্দেশ্যে জামাত তার ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে পৃথক ৮ দফা কর্মসূচী। ফলে আন্দোলনে বিভেদ সূচিত হয়, পূর্ব বাংলার বিভিন্নস্থানে সংঘটিত সংঘর্ষে ইসলামী ছাত্র সংঘের আবদুল মালেকসহ নিহত হয় কেউ কেউ। ছাত্র-জনতার ত্যাগ এবং আন্তরিকতা সত্ত্বেও আন্দোলনের

নিশ্চিত সাফল্যকে আইউব খানের গোল টেবিলে বিসর্জন দেয়ার প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে, এই ষড়যন্ত্রের সকল পর্যায়ে প্রধান ভূমিকা রাখে জামাতে ইসলামী।

ভাসানী ও বামপন্থীদের বিরোধিতা ঃ অন্তর্ঘাতমূলক কৌশল

আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিনয় করে এমনিভাবে জামাতে ইসলামী পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এরই পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের জন্য অগ্রসরমান বামপন্থীদের বিরুদ্ধে দলটির ভূমিকা ছিলো নগ্নভাবে আক্রমণাত্মক। মুখে দাড়ি আর মাথায় টুপির ছদ্মাবরণ নিয়ে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর ধর্মপরায়নতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জামাতীরা বামপন্থীদের 'নাস্তিক', 'কাফের' এবং 'ইসলাম বিরোধী' আখ্যায় চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালায়, বিশেষ করে মওলানা ভাসানীকে পরিণত করে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থলে। গণচীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারার আমদানীকারক অর্থে মওলানা ভাসানীকে জামাতী পত্রিকাগুলি 'মাও-লানা' লিখতো (দেখুন সাপ্তাহিক জাহানে নও এবং দৈনিক সংগ্রাম)। '৬৯-এর মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তানের শাহীওয়ালে তারা ভাসানীকে শারীরিকভাবে আক্রমণ পর্যন্ত করেছিলো।

সত্তরের নির্বাচনে জামাতে ইসলামী পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অংশ নেয়, সারা পাকিস্তানে দলটির মনোনীত ২০০ প্রার্থীর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাত্র চারজন জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়। পূর্ব বাংলায় অধিকাংশ আসনে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়, প্রাদেশিক আমীর গোলাম আযম আওয়ামী লীগের জহিরুদ্দিনের ১১৬২০৪ ভোটের বিরুদ্ধে মাত্র ৩৫৫২৭টি ভোট লাভ করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর তৈরি জটিলতার প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার পর স্বাধীনতার দাবীতে পূর্ব বাংলায় দুর্বার আন্দোলন শুরু হলে আরো একবার অন্তর্ঘাতমূলক কৌশল নিয়ে এগিয়ে আসে জামাতে ইসলামী। এই সময়কালে দলটির কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে তাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত ছিলো কেবল ভুট্টোর বিরোধিতায়। 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' কর্মসূচীর কারণে পিপলস পার্টি আগেই তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলো, পূর্ব বাংলায় ভুট্টো-বিরোধী মনোভাবের সুযোগটি জামাতীরা তাই কাজে লাগিয়েছে সুচতুরভাবে।

পূর্ব বাংলার সপক্ষে জামাতে ইসলামী যে কোনো ভূমিকাই নেয়নি তার বড় প্রমাণ মওদুদীর এক বিবৃতি। এতে তিনি ভুট্টোর সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগেরও নিন্দা করে বলেন। 'কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যারা শাসনতন্ত্র তৈরী করতে চাচ্ছেন তাদের একথা জানা দরকার যে তেমন কোনো শাসনতন্ত্র সফল হবে না এবং সেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেই দায়ী থাকতে হবে।'[পাকিস্তান অবজারভার' ১৭ ফেব্রুয়ারী , ১৯৭১] ভুট্টোর তৎকালীন বক্তব্যের কাছাকাছি এই বিবৃতির অর্থটি ছিলো ভুট্টো এবং পূর্ব বাংলার মানুষের পরস্পর বিরোধী অবস্থানের উভয় ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জামাতে ইসলামীর ভিত্তিকে দৃঢ়তর করা, পাকিস্তানকে রক্ষাও ছিলো উদ্দেশ্যের অন্য একটি দিক। ভুট্টোর বিরোধিতার

অথই তখন ছিলো পূর্ব বাংলার পক্ষাবলম্বনের মতো; ভুট্টো বিরোধী বাঙালীদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ভণিতা করে রাজনৈতিক অস্থিরতার সেই দিনগুলিতে জামাতে ইসলামী পূর্ব বাংলার মসজিদের বেষ্টনী থেকে জনগণের কাছে যাওয়ার প্রতারণাপূর্ণ কৌশল নিয়েছিলো।

টিক্কা খানের সঙ্গে সহযোগিতা ঃ শান্তি কমিটি ও প্রাথমিক কর্মকাণ্ড

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাঙালী নিধন অভিযান শুরু করলে জামাতে ইসলামীর প্রকৃত উদ্দেশ্য নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়ে, নুরুল আমীনের নেতৃত্বে ৪ এপ্রিল প্রথম সুযোগেই খুনী জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গোলাম আযম অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। ['পূর্বদেশ', ৫ এপ্রিল, ১৯৭১] দুদিন পর ৬ এপ্রিল গোলাম আযম পৃথকভাবে টিক্কা খানের সঙ্গে আবার দেখা করেন। এই বৈঠকে অন্য দালালদের মতো গোলাম আযমও স্বাধীনতা সংগ্রামকে 'ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশ' হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন যে ভারতের এই 'অভিসন্ধি নস্যাত করার জন্য প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে।' [দৈনিক 'পাকিস্তান', ৭ এপ্রিল, ১৯৭১]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে অংকুরেই ধ্বংস করার পাশবিক প্রক্রিয়ায় সহযোগিতাদানের উদ্দেশ্যে ১০ এপ্রিল গঠিত 'শান্তি কমিটি'তে জামাতে ইসলামী প্রধান ভূমিকা রাখে। এবং ১৫ এপ্রিল গঠিত প্রাদেশিক শান্তি কমিটির তিন নম্বর সদস্য নির্বাচিত হন গোলাম আযম, আহবায়ক ছিলেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়েরুদ্দিন। ['পূর্বদেশ' ১১ এপ্রিল; দৈনিক 'পাকিস্তান', ১৬ এপ্রিল; ১৯৭১] উল্লেখ্য যে শান্তি কমিটির প্রথম বৈঠকে 'ভারতীয় ও অন্যান্য ইসলাম-বিরোধীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সময়োচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিলো। বৈঠকের এক প্রস্তাবে 'দেশপ্রেমিক নাগরিক, আইনজীবী, মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার মোদাররেসদের প্রতি জনসাধারণকে কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলার আহবান জানানো হয়, যাতে জনসাধারণ ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনদের মোকাবিলা করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে জেহাদে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন।' গোলাম আযমদের এই শান্তি কমিটি ২২ এপ্রিল এক বিবৃতিতে 'সকল দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানীর প্রতি রাষ্ট্রবিরোধী লোকদের হিংসাত্মক এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের এবং উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে সর্বরকমভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহবান' জানিয়েছিলো। [দৈনিক 'পাকিস্তান', ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১]

এপ্রিলেই যুদ্ধরত বাংলাদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি তার স্বাধীনতা-বিরোধী তৎপরতা শুরু করে, প্রতিটি জেলা ও মহকুমা পর্যায়েই জামাতে ইসলামী দখল করে এর নেতৃত্ব। পিডিপি ও মুসলিম লীগের সঙ্গে একযোগে জামাতের দালালরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে গ্রামে গ্রামে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো, মানুষের গরু-ছাগলসহ অর্থ সম্পদ লুট করতো, মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিতো, নারী নির্যাতনেও সহায়তা করতো। পাকিস্তান রক্ষায় তাদের এই ভূমিকা পাকিস্তানী

সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট করেছে, জেলা ও মহকুমা শহরগুলিতে 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য এমন কি জেনারেল টিক্কা খানের মতো খুনীও তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দু-একটি উদাহরণ পরিস্থিতি অনুধাবনে সহায়ক হবে। রাজশাহীতে গভর্নর হিসেবে টিক্কা খান সফরে গেলে শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয় যে 'সারা রাজশাহী বিভাগে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করা হয়েছে।' জবাবে টিক্কা খানও 'জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের উত্তম কাজের প্রশংসা করেন।' টিক্কা খান 'গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উপস্থিতির কথা কর্তৃপক্ষকে জানাবার জন্য তাদের আহবান জানান যাতে করে আইন ও শৃংখলা রক্ষাকারী এজেন্সীসমূহ তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।' [দৈনিক 'পাকিস্তান', ৬ জুলাই, ১৯৭১] অন্য এক উপলক্ষে রংপুরে 'গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের নির্মূল এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কাজে সহায়তা করার জন্য শান্তি কমিটি যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন' টিক্কা খান তার 'প্রশংসা' করেন। শান্তি কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে টিক্কা খান বলেন ঃ 'এগুলো প্রদেশে সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।' [দৈনিক 'পাকিস্তান', ১২ আগস্ট, ১৯৭১] পত্রিকার একই প্রতিবেদন জানাচ্ছে ঃ দিনাজপুরে 'শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট গভর্নরকে জানান যে সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টার সুফল পাওয়া গেছে।'

স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই দিনগুলিতে খুনী জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলো জামাতে ইসলামী। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের 'আজাদী দিবস' উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে গোলাম আযম বলেন ঃ 'কিন্তু এবার পাকিস্তানের ভেতরে হাজারো দুশমন সৃষ্টি হয়েছে। তাই এবারের সংকট কঠিন। কারণ বাইরের দুশমনের চেয়ে ঘরের যেসব দুশমন রয়েছে তারা অনেক বেশী বিপদজনক।' ১৬ আগস্টের দৈনিক 'পাকিস্তান' জানাচ্ছে ঃ 'সেনাবাহিনী ও শান্তি কমিটির মধ্যে যোগাসূত্র প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জামাত নেতা (গোলাম আযম) বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য শান্তি কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শান্তি কমিটি যদি দুনিয়াকে জানিয়ে না দিত যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশকে অখণ্ড রাখতে চায়, তবে পরিস্থিতি হয়তো অন্য দিকে মোড় নিত। তিনি বলেন, দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর, তাই দেশের মানুষকে বোঝানোর দায়িত্ব শান্তি কমিটির হাতে তুলে নিতে হবে। এছাড়া ঘরে ঘরে যেসব দুশমন রয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করার ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।'

যুদ্ধরত বাংলাদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি তার স্বাধীনতা-বিরোধী তৎপরতা শুরু করেছিলো অচিরেই। এর সদস্যরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে গ্রামে গ্রামে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো, মানুষের অর্থ ও সম্পদ লুট করতো, মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতো, সহায়তা করতো নারী নির্যাতনেও। প্রায় সব ক্ষেত্রেই শান্তি কমিটির নেতৃত্ব দখল করেছিলো জামাতে ইসলামী এবং গোলাম আযম দ্রুত এর প্রধান নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাকালে তিনি বলেছিলেন,

'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য শান্তি কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।'

রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠা ঃ 'পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্যই'

শান্তি কমিটির মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরোধী তৎপরতাকে সর্বাত্মক করার উদ্দেশ্যে গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন জামাতে ইসলামী একইযোগে সশস্ত্র বাহিনীও গড়ে তুলেছিলো। খুলনায় মে মাসে রাজাকারদের প্রথম দলটি গঠন করেন জামাতের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মওলানা এ কে এম ইউসুফ। স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলিতে হত্যা নির্যাতন এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাজাকাররা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিশ্বস্ত তল্পীবহক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে; শত্রু কবলিত বাংলাদেশের এমন একটি পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার সদস্যরা রাজাকারদের হত্যা, লুণ্ঠন এবং নির্যাতনের শিকার হননি। স্বাধীনতা বিরোধী এই ভূমিকার ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই রাজাকাররা সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছিলো, 'দুষ্কৃতকারীদের নাশকতামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করার কারণে টিক্কাখান এবং নিয়াজীর মতো জেনারেলরাও রাজাকারদের প্রশংসা করেছিলেন। জামাতে ইসলামী রাজাকার বাহিনীর প্রশ্নেও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলো। ১ সেপ্টেম্বর করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম আযম 'পাকিস্তান রক্ষা ও মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।' গোলাম আযম বলেন যে, 'কোন ভাল মুসলমানই তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থক হতে পারে না।' তিনি বলেন ঃ 'পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করার জন্য একমন ও দেশপ্রেমিক লোকেরা একত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। .....দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলার যে কোনো অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের পেছনে আমাদের দেশ প্রেমিক জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।'

২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার হোটেল 'এম্পায়ার'-এর এক জামাতী সমাবেশে গোলাম আযম বলেন যে, 'পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্যই জামাতে ইসলামী শান্তি কমিটি এবং রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।' গোলাম আযম বলেন, 'জামাতে ইসলামীর কর্মীরা মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে রাজী নয়। আর তাই জামাতের কর্মীরা শাহাদাত বরণ করে পাকিস্তানের দুশমনদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা মরতে রাজী, তবুও পাকিস্তানকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে রাজী নয়।' সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গোলাম আযম প্রসঙ্গত বলেন, 'সারা প্রদেশ সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পরও যে কয়েক হাজার লোক শহীদ হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই জামাতের কর্মী।[দৈনিক 'পাকিস্তান', ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

মোহাম্মদপুরে ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের রাজাকার বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শনকালে ১৭ সেপ্টেম্বর এক সমাবেশে গোলাম আযম বলেন, 'রাজাকার বাহিনী কোন দলের নয়, তারা পাকিস্তানে বিশ্বাসী সকল দলের সম্পদ। ...তোমরা দল মতের উর্ধ্বে উঠে পাকিস্তানে বিশ্বাসী সকল দলকে আপন মনে

করবে।...বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জামাতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেনি, বরং তারা ঢালাওভাবে আলেম ও ইসলামী দলের লোকদের খতম করেছে।' রাজাকাররা খুবই ভালো কাজ করছেন' বলে তিনি উল্লেখ করেন। নিহত রাজাকার রশীদ মিনহাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গোলাম আযম বলেন ঃ 'এই আত্মত্যাগের নিদর্শন থেকে তরুণরা উপকৃত হতে পারবে।' [দৈনিক 'পাকিস্তান', ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা নেতা মওলানা এ কে এম ইউসুফ ১১ অক্টোবর খুলনার জেলা স্কুল মিলনায়তনে এক রাজাকার সমাবেশে 'দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কার্যকলাপ দমনের জন্য' রাজাকারদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিপুল করতালির মধ্যে মওলানা ইউসুফ ঘোষণা করেন ঃ 'দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলার যে-কোন অপচেষ্টা নস্যাত করে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের পেছনে আমাদের সাহসী জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।' [দৈনিক 'পাকিস্তান', ১৩ অক্টোবর, ১৯৭১]

পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজীও একই আশা ব্যক্ত করেছিলেন। সাভারে রাজাকার বাহিনীর কোম্পানী কমাণ্ডারদের প্রথম দলের ট্রেনিং শেষের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন শেষে এক ভাষণে ২৭ নভেম্বর নিয়াজী বলেন যে, 'রাজাকারদের প্রসন্ন বদন, আত্মপ্রত্যয় ও উচ্চ মনোবল দেখে, তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছেন। রাজাকারদের ভূমিকা সম্পর্কে নিয়াজী বলেন ঃ 'একদিকে তাদের ভারতীয় চরদের সকল চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে এবং অপর দিকে বিপথগামী যুবকদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা করতে হবে।' [দৈনিক 'পাকিস্তান', ২৮ নভেম্বর ১৯৭১]

জামাতে ইসলামীর রাজাকার বাহিনী সাধারণভাবে পাকিস্তানপন্থী সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন পেয়েছিলো। পিডিপি প্রধান নূরুল আমীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ৬ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ও তাদের আরো অস্ত্র দেয়ার সুপারিশ করেন। কারণ, 'সেখানে রাজাকাররা খুব ভালো কাজ করেছে।' [দৈনিক 'পাকিস্তান', ৭ নভেম্বর ১৯৭১]

আল-বদর বাহিনীর প্রতিষ্ঠা ঃ 'মর্দে মুজাহিদের মতো এগিয়ে চলো'

স্বাধীনতা যুদ্ধকে নস্যাত করার লক্ষ্যে জামাতে ইসলামীর উল্লেখযোগ্য অপর এক প্রচেষ্টা ছিলো আল-বদর নামের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিষ্ঠা। শিক্ষিত জামাত ও ইসলামী ছাত্র সংঘের সমন্বয়ে গঠিত এই বদর বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধরত বাঙালী জনগোষ্ঠীকে পাকিস্তানী তথা ইসলামী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করা। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশে বদর বাহিনী সার্বিকভাবে জামাতে ইসলামীর নেতা গোলাম আযমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। এর প্রকাশ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বর্তমান জামাতে ইসলামীর সহ সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান নিযামী (সারা পাকিস্তান প্রধান), ঢাকা মহানগরীর আমীর আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ (প্রাদেশিক প্রধান), ঢাকা মহানগরীর নায়েবে আমীর মীর কাশেম

আলী (তৃতীয় নেতা) এবং কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (প্রধান সংগঠক)

স্বাধীনতাকামীদের খুঁজে বের করে হত্যা করা 'হিন্দুদের বলপূর্বক মুসলমান বানানো, সেমিনার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানী ও জামাতী চিন্তাধারার প্রচার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করা ছিলো বদর বাহিনীর তৎপরতার উল্লেখযোগ্য কতিপয় দিক। স্বাধীনতা যুদ্ধ অপ্রতিরোধ্যভাবে বিজয়াভিমুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদর বাহিনীও ক্রমাগত নৃশংস হয়ে উঠেছিলো। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাঙালী জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার উদ্দেশ্য নিয়ে এরা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিলো নির্বিচারে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে গবর্নরের উপদেষ্টা জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে বৈঠককালে গোলাম আযমই বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা পেশ করেছিলেন। রাও ফরমান আলীর অনুমোদনলাভের পর গোলাম আযমের তৎপরতা দারুণভাবে বেড়ে গিয়েছিলো। এ সময়ই তিনি মোহাম্মদপুরে বদর বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পরিদর্শনে গিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টিকারী ভাষণ দিয়েছিলেন (১৭ সেপ্টেম্বর '৭১)। জামাত ইসলামীর মুখপাত্র দৈনিক 'সংগ্রাম'ও সে সময় বদর বাহিনীকে উত্তেজিত করতে শুরু করেছিলো। ১৪ সেপ্টেম্বর 'আল-বদর' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে 'সংগ্রাম' লেখে ঃ 'আল বদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আল বদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল বদর সেখানেই। যেখানেই দুস্কৃতকারী আল বদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুস্কৃতকারীদের কাছে আল বদর সাক্ষাৎ আজরাইল।'

ওদিকে বদর বাহিনীর প্রকাশ্য নেতারাও একইযোগে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসাস্থ বদর বাহিনীর ক্যাম্পের এক সমাবেশে বদর বাহিনী প্রধান মতিউর রহমান নিযামী ২৩ সেপ্টেম্বর বলেছিলেন, 'যারা ইসলামকে ভালোবাসে শুধুমাত্র তারাই পাকিস্তানকে ভালোবাসে। এবারের উদ্‌ঘাটিত এই সত্যটি যাতে আমাদের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যেতে না পারে সে জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

জামাতে ইসলামীর আল-বদর বাহিনীর উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব সম্পর্কে পরিচিত করার মতো দৈনিক 'পাকিস্তান'-এর একটি প্রতিবেদন প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ঃ ঐতিহাসিক 'বদর দিবস' পালনোপলক্ষে ১৯৭১-এর ৭ নভেম্বর ঢাকার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত ইসলামী ছাত্র সংঘের এক গণ জমায়েতে সংঘের 'পূর্ব পাকিস্তান শাখার' সভাপতি আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ 'চার দফা ঘোষণা' প্রচার করেছিলেন। প্রথম ঘোষণায় বলা হয় ঃ 'দুনিয়ার বুক হিন্দুস্থানের কোন মানচিত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্থানের নাম মুছে না দেয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেবো না।' দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচারিত হয় লাইব্রেরীসমূহের উদ্দেশ্য ঃ 'আগামীকাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোন বই অথবা হিন্দুদের দালালি করে লেখা পুস্তকাদি লাইব্রেরীতে (কেউ) স্থান দিতে পারবেন না, বিক্রী বা প্রচার করতে পারবেন না। যদি কেউ করেন তবে পাকিস্তানে অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকরা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।' তৃতীয় দফায় বলা হয় ঃ 'পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকদের

সম্পর্কে বিরূপ প্রচার করা হচ্ছে। যারা এই অপপ্রচার করছে তাদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকুন।' চতুর্থ দফায় বলা হয় ঃ 'বায়তুল মোকাদ্দসকে উদ্ধারের সংগ্রাম চলবে।'

চার দফা ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানিয়ে আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ বলেন ঃ 'এই ঘোষণা বাস্তবায়িত করার জন্য শির উঁচু করে, বুকে কোরান নিয়ে মর্দে মুজাহিদের মতো এগিয়ে চলুন। প্রয়োজন হলে নয়া দিল্লী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আমরা বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করবো।'

জমায়েতে 'পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের' সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী 'বদর দিবসের শপথ' হিসেবে তিনটি কর্মসূচী তুলে ধরেন ঃ ক) ভারতের আক্রমণ রুখে দাঁড়াবো, খ) দুষ্কৃতকারীদের খতম করবো, গ) ইসলামী সমাজ কায়েম করবো।'

জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মুহাম্মদ শামসুল হক। তিনি 'বাতিল' শক্তিকে নির্মূল করার' শপথ নিয়ে 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের' কথা ঘোষণা করেন। জমায়েত শেষে অনুষ্ঠিত মিছিলের উল্লেখযোগ্য শ্লোগানগুলির মধ্যে ছিলো 'আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে', 'বীর মুজাহিদ অস্ত্র ধর,' ভারতকে খতম কর', 'মুজাহিদ এগিয়ে চল, কলিকাতা দখল কর' এবং 'ভারতের চরদের খতম কর।' [দৈনিক পাকিস্তান, ৮ নভেম্বর, ১৯৭১]

'বদর দিবস'-এর সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে বদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মতিউর রহমান নিযামী ১৪ নভেম্বর দৈনিক 'সংগ্রামে' লেখেন ঃ '.....বদর যোদ্ধাদের যেই সব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আল বদরের তরুণ মর্দে মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাল্লাহ সেই সব গুণাবলী আমরা দেখতে পাবো।.....সেদিন আর খুব দূরে নয় যেদিন আল বদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্থানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।'

বদর বাহিনীর অপর দুই প্রধান নেতা আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ এবং মীর কাশেম আলী তাদের ২৩ নভেম্বরের বিবৃতিতে 'সৈনিক হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার জন্য' সংগঠনের সদস্যদের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। এই সময়কালে প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে বলা হয়েছিলো যে 'শত্রু আশেপাশেই রয়েছে। তাই সতর্কতার সঙ্গে কাজ চালাতে হবে। মনে রাখবেন, আপনারা পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্যই কেবল যুদ্ধ করছেন না—এ যুদ্ধ ইসলামের। নমরুদদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য আমাদের আমীরের (গোলাম আযমের) নির্দেশ পালন করুন।'

পাকিস্তানের যুদ্ধকালীন রাজনীতিতে ক্ষমতার লক্ষ্যে জামাত

শান্তি কমিটি এবং রাজাকার ও আল-বদর বাহিনীর মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে নাশকতামূলক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি একই যোগে

জামাতে ইসলামী পাকিস্তানের রাজনীতিতে দলীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠারও প্রচেষ্টা নিয়েছিলো, তাদের লক্ষ্য ছিলো পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের ক্ষমতায় অংশ পাওয়া। যুদ্ধরত বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সপক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা 'পূর্ব পাকিস্তানে' তাদের অবস্থানকে দৃঢ়ভিত্তি দিয়েছিলো, প্রদেশে তাদের মন্ত্রিত্বলাভ হয়ে উঠছিলো সময়ের প্রশ্ন কেবল। এই মূলধনকে কাজে লাগিয়ে জামাত এরপর কেন্দ্র ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতার সিঁড়ির দিকে ধাবিত হতে থাকে।

কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং তার পাকিস্তান পিপলস পার্টি ছিলো জামাতে ইসলামীর খায়েশ পূরণের পথে প্রবল অন্তরায়। ৮৮টি আসনের বিরোধিতায় ৪টি আসনের অধিকারী জামাতের দাবীর কোনো আইনসম্মত বৈধতালাভের সম্ভাবনা ছিলো না। জামাতে ইসলামী তাই ডানপন্থী দলগুলির মোর্চা গঠনের উদ্যোগ নেয়, একই সঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তানে' আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে সত্তরের নির্বাচনেরও অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নটি আইনসম্মতভাবে উত্থাপন করতে শুরু করে। জামাতে ইসলামী এই মর্মে যুক্তি হাজির করে যে 'পূর্ব পাকিস্তানে' নির্বাচনী ফলাফল অস্বীকৃত হওয়ার ফলে গোটা পাকিস্তানের ফলাফলও স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হওয়া উচিত। পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল চৌধুরী রহমতে এলাহী ২৩ মে করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের সর্বত্র নতুন নির্বাচন দাবী করেন। শুধু তা-ই নয়, তার মতে 'এই নির্বাচন হতে হবে নতুন আদমশুমারীর ভিত্তিতে', কেননা, 'আদশ শুমারীর সময় আগেই হয়ে গেছে।' 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে সদ্য প্রত্যাগত জামাত নেতা প্রসঙ্গক্রমে 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দেশ-বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে সংকট থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করেন।' [দৈনিক 'পূর্বদেশ', ২৪ মে, ১৯৭১]

পিপলস পার্টি নেতা ভুট্টো এর বিরোধিতা করেন, কেননা 'সমাজতন্ত্রের জন্য' অগ্রসরমান এই দলটি জামাতে ইসলামীকে ক্ষমতার অংশ দেয়ার জন্য এত ষড়যন্ত্র আর পরিশ্রম করেনি। ভুট্টোর অভিমত ছিলো 'পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচন হতে পারে।' একই সঙ্গে তিনি একথাও জোর দিয়ে বলেন যে 'যারা নির্বাচন হেরেছে তাদের পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের সুযোগ নেয়া উচিত নয়। তাদের জনসাধারণের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হওয়াও উচিত নয়।' [দৈনিক 'পাকিস্তান', ২২ মে ও ২ জুন, ১৯৭১]

পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় জামাতে ইসলামী ঃ গোলাম আযমের সাফাই

পাকিস্তানভিত্তিতে নিরাশ হওয়ার পর 'পূর্ব পাকিস্তানের' জামাতীরা প্রদেশে ক্ষমতায় অংশলাভের তৎপরতাকে জোরদার করেছিলো। নিজেদের প্রমাণিত যোগ্যতাকে বলিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এসময়টিতেই জামাতে ইসলামী রাজাকার বাহিনীর পাশাপাশি বদর বাহিনীও গঠন করে। জামাতীদের উদ্যোগে সারা 'পূর্ব পাকিস্তানে' বিশেষ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের 'আজাদী দিবস' উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে কার্জন হলে আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে গোলাম আযম

বলেন ঃ 'এবার প্রাণ চাঞ্চল্যের সঙ্গে আজাদী দিবস উদযাপিত হয়েছে। কারণ যারা পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসেন, তারা এবার আন্তরিকতা ও জাঁকজমকের সঙ্গে আজাদী দিবস পালন করেছেন। শত্রু ও মিত্রের মানদণ্ডে এবার পাকিস্তান যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছে।' 'কায়েদে আযমের' উদ্ধৃতি দিয়ে গোলাম আযম বলেন ঃ 'পাকিস্তান টিকে থাকার জন্য এসেছে। তবে পাকিস্তান টিকে থাকতে হলে এর আদর্শকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে হবে।' [দৈনিক 'পাকিস্তান,' ১৬ আগস্ট ১৯৭১]

ওদিকে জাতিসংঘের আসন্ন অধিবেশনকে সামনে রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত বাংলাদেশকে 'স্বাভাবিক প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান' হিসেবে প্রমাণ করার জন্য পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে 'বেসামরিক সরকার' প্রতিষ্ঠার কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তারা 'বাঙ্গালী' ডাঃ এ এম মালেককে ৩ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর' হিসেবে নিয়োগ করে, ১৭ সেপ্টেম্বর শপথ নেয় মালেক সরকারের মন্ত্রিসভা ঃ এতে জামাতে ইসলামীর আব্বাস আলী খানকে শিক্ষামন্ত্রী এবং মওলানা এ কে এম ইউসুফকে রাজস্বমন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শপথ অনুষ্ঠানের পর গভর্নর মালেক বলেন যে তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের কেউ আগে কখনো মন্ত্রিত্ব করেননি, তবে তারা সবাই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। উল্লেখ্য যে দশ সদস্য বিশিষ্ট এই মন্ত্রিসভায় জামাতে ইসলামীর দুজন ছাড়াও কাউন্সিল মুসলিম লীগের ২ জন, আওয়ামী লীগের ২ জন এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টি' কনভেনশন মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামের ১ জন করে সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।

অগণতান্ত্রিক পন্থায় নিযুক্ত মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে 'প্রাদেশিক' জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের যুক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঢাকার হোটেল 'এম্পায়ার'-এ দলীয় মন্ত্রী দুজনের জন্য আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর বলেছিলেন ঃ 'বর্তমানে প্রদেশের জনসংখ্যার যে ২০ ভাগ লোক সক্রিয় রয়েছে তারা দুভাগে বিভক্ত। একদল পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়, আর একদল পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। জামাতে ইসলামী শেষোক্ত দলভুক্ত।'

পাকিস্তান রক্ষার 'জেহাদে' জামাতের কয়েক হাজার কর্মীর 'শাহাদাত বরণের' কথা উল্লেখ করে গোলাম আযম বলেন ঃ 'যে উদ্দেশ্য নিয়ে জামাত রাজাকার বাহিনীতে লোক পাঠিয়েছে, শান্তি কমিটিতে যোগ দিয়েছে, সে উদ্দেশ্যেই মন্ত্রিসভায়ও লোক পাঠিয়েছে। দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা যে কাজ করছি সেই কাজে সাহায্য করার জন্যই দুজনকে মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করা হয়েছে।' পরিশেষে গোলাম আযম বলেন, 'এই মন্ত্রী পদ ভোগের বা সম্মানের বস্তু নয়। আমরা তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি।'

১৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যা দৈনিক 'পাকিস্তান'-এর প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ অনুষ্ঠান শেষে পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর ডেপুটি আমীর মওলানা আবদুর রহীম 'বিশ্বের মুসলমান, পাকিস্তানের জনগণ, বিশেষ করে জামাতের মন্ত্রিদ্বয়ের জন্য দোয়া করে মোনাজাত করেন।'

বাঙালী জাতিসত্তা বিনাশের জামাতী উদ্যোগ

মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পর জামাতে ইসলামী প্রথমেই বাঙালীদের 'পাকিস্তানী মুসলমান' বানানোর পদক্ষেপ নিয়েছিলো। দলটি 'ইসলামী শিক্ষা' প্রবর্তনের নামে কখনো বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্বাস করতো না, তাদের মতে আধুনিক এই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলেই 'পূর্ব পাকিস্তানে' ইসলাম বিরোধিতা এত ব্যাপকতা পেতে পেরেছিলো। একাত্তরের 'আজাদী দিবসে' অধ্যাপক গোলাম আযম 'দুঃখ করে' বলেছিলেন ঃ 'গত ২৪ বছর যাবত পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। তাই আজ ঘরে ঘরে পাকিস্তানের দুশমন সৃষ্টি হয়েছে এবং এরা পাকিস্তানের পহেলা নম্বরের দুশমন ভারতকে বন্ধু বলে মনে করছে।' এজন্যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করে গোলাম আযম বলেন ঃ 'যারা পাকিস্তানে জন্ম নিয়ে দুশমন হয়েছে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। বর্তমান শিক্ষা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই এজন্য দায়ী করতে হবে। কারণ পাকিস্তানকে যারা ভালোবাসে তাদেরকে তৈরি হওয়ার সুযোগ দিলে তারা দেশের জন্যে জান কোরবান করতো।' [দৈনিক 'পাকিস্তান', ১৬ আগস্ট ১৯৭১]

আমীরের বক্তব্যকে নির্দেশের মর্যাদা দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী' জামাতে ইসলামীর আব্বাস আলী খান অচিরেই 'শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক ও পুরোপুরি পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা' তুলে ধরেন। ২১ সেপ্টেম্বর তিনি বলেন ঃ 'শিক্ষার প্রশ্নটিকে যদি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না দেয়া হয় তবে যুব সমাজ অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে যাবে এবং তাদের যে লক্ষ্যস্থল সেই পাকিস্তানের আদর্শ থেকে তারা বহু দূরে সরে থাকবে।' আব্বাস আলী খান বলেন ঃ 'ইসলামী অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা ছাড়া আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে পাকিস্তানের পটভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারবোনা।'

জামাতী শিক্ষামন্ত্রী বলেন ঃ 'বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের সকল ক্ষতির কারণ। বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ ও অর্থহীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন না করা হলে আমরা কিছুতেই আমাদের ধ্বংসকে রোধ করতে পারবো না।' আব্বাস আলী খান তার 'অভিমত' ব্যক্তকালে বলেন ঃ 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যাতে আমরা বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার গড়ে তুলতে পারবো, আর সেই সাথে গড়ে তুলতে পারবো খাঁটি মুসলমান। আমাদের রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি সবই অবশ্যই ইসলামের ভিত্তিতে হতে হবে।' বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ছেলে-মেয়েদের সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আব্বাস আলী খান বলেন ঃ 'এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ ব্যবস্থা অবশ্য-পরিত্যাজ্য।' ['পাক সমাচার', ১ অক্টোবর, ১৯৭১]

১৯ অক্টোবর 'রেডিও পাকিস্তান ঢাকা' থেকে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে ছাত্র সমাজকে নির্ভয়ে দেশে ফিরে আসার আহবান জানিয়ে আব্বাস আলী খান বলেন ঃ 'আমাদের কাছে সব ছাত্রই নির্দোষ। তাদের সকল অপকর্মের জন্য বিপথগামী নেতৃত্ব ও ভুল শিক্ষানীতিই দায়ী।' তাদের সরকার 'এই শিক্ষানীতি পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর' বলেও তিনি উল্লেখ করেন। [দৈনিক 'পাকিস্তান', ২০ অক্টোবর, ১৯৭১]

এই ঘোষণাকে বাস্তবায়নের উদ্যোগও নিয়েছিলেন আব্বাস আলী খান ঃ 'প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পর্যালোচনার' জন্য তিনি ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটির রিপোর্ট 'মন্ত্রিপরিষদ' ৮ নভেম্বর বিবেচনার পর অনুমোদন করে। দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ 'এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী আগামী শিক্ষাবর্ষ হইতে কিছু সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা হইবে এবং বাদবাকী বইগুলি ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের আদর্শগত ভিত্তি তুলিয়া ধরার জন্য ঢালিয়া সাজানো হইবে। [দৈনিক 'ইত্তেফাক' ১০ নভেম্বর, ১৯৭১]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালীদের ভাষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সমূলে উৎপাটনের যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টা চলে আসছিলো, একাত্তরে পাকিস্তান কবলিত বাংলাদেশে শেষবারের মতো তারই ধারাকে সম্প্রসারণের জন্য জামাতে ইসলামী এমনিভাবে প্রয়াসী হয়েছিলো। পাকিস্তানের সেনা বাহিনীর নিরংকুশ সমর্থনে জামাত সঠিকভাবেই সিদ্ধান্তটিতে এসেছিলো যে কোনো জাতিসত্তার বিনাশ করতে হলে তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপরই চূড়ান্তভাবে আঘাত হানতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একদিকে আলবদর ও রাজাকার বাহিনী দিয়ে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত বাঙালীদের হত্যা এবং অন্যদিকে প্রশাসনিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের প্রক্রিয়াকে সফল করা গেলে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আর কোনো দিন মাথা তুলতে পারবে না বাঙালীর উত্তরপুরুষেরা পরিণত হবে জামাতী চিন্তাধারার স্থায়ী আজ্ঞাবহে। জাতিসত্তা বিরোধী এই উদ্যোগ কখনো জনসমর্থনের জোরে নেয়া সম্ভব হওয়ার নয়, জামাতে ইসলামী তাই পাকিস্তানী সামরিক জান্তার তল্পিবাহক হিসেবে উদ্যোগটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছিল।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে মওদুদী ঃ স্বেচ্ছাচারী পন্থার সমর্থন

ওদিকে পাকিস্তান তার 'স্বাভাবিক অবস্থা' প্রমাণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছিল। এই প্রক্রিয়ায় পিডিপি-র মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নাম ঘোষিত হয় ৮ সেপ্টেম্বর, নির্বাচন কমিশন তার ২২ সেপ্টেম্বরের ঘোষণায় 'পূর্ব পাকিস্তানের' শূন্য ঘোষিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন সমূহে ১২ ডিসেম্বর থেকে নির্বাচনী সময়-সূচী নির্ধারণ করে। উল্লেখ্য যে 'বেআইনী ঘোষিত' আওয়ামী লীগের ৭৮ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের আসনসমূহকে আগষ্ট শূন্য ঘোষণা করা হয়েছিলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৮ সেপ্টেম্বরের ভাষণে 'নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে' তার 'অঙ্গীকারের কথা' পুনরায় ঘোষণা করেন। এই ভাষণেও ইয়াহিয়া খান সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেন যে 'পাকিস্তানের আদর্শের ভিত্তিতে' বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তিনি শাসনতন্ত্র তৈরী করেছেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে সদস্যদের সামনে তা সংশোধনীর জন্য পেশ করা হবে।

শাসনতন্ত্র রচনার এই অগণতান্ত্রিক পন্থার সমর্থনে জোরালোভাবে এগিয়ে এসেছিলো জামাতে ইসলামী। জামাতের আমীর মওলানা মওদুদী তার প্রতিক্রিয়া

জানাতে গিয়ে একই দিনে লাহোরে বলেন যে প্রেসিডেন্ট এই 'নয়া পদ্ধতিকে' তিনি 'অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত' মনে করেন। মওদুদী আরো বলেন যে তিনি সব সময়ই এই মত ব্যক্ত করে এসেছেন যে জাতীয় পরিষদকে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে বলার পরিবর্তে প্রেসিডেন্টের উচিত খসড়া, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে তাকে কেবলমাত্র সংশোধনের জন্য জাতীয় পরিষদে পেশ করা। [দৈনিক 'পাকিস্তান', ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১] উল্লেখ্য যে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়ার ফর্মুলা সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ থেকে এসময় বিরত থেকেছেন।

ইয়াহিয়া খান তার ১২ অক্টোবরের ভাষণে তিনটি প্রধান ঘোষণা দেন। ২০ ডিসেম্বর তিনি তার শাসনতন্ত্র প্রকাশ করবেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে ২৭ ডিসেম্বর এবং শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য পরিষদকে ৯০ দিনের সময় দেয়া হবে। প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণা 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছুকদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, ফাঁকা ময়দানে গোল দেয়ার সে দুর্লভ সুযোগ নিতেও জামাতে এগিয়ে আসে 'জোশ' আর উৎসাহের সাথে।

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে জামাত ঃ উল্লেখযোগ্য ১৫ জন

৭৮টি শূন্য আসনের প্রতিটিতে জামাতে ইসলামীর প্রার্থীরা দাঁড়িয়েছিলো 'পাকিস্তান রক্ষার জেহাদের অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। পরিস্থিতি এবার সত্তরের মতো 'বৈরী' ছিলো না, পিডিপি, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম সহ ইসলাম-পছন্দ দলগুলির সাথে যোগসাজশের ফলশ্রুতিতে ৫৮টি আসনেই বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' নির্বাচিত হন। ৯ নভেম্বর পর্যন্ত এমনিভাবে বিজয়ী জাতীয় পরিষদ সদস্যদের ভিত্তিতে দলগত অবস্থান ছিলো এরকম ঃ জামাতে ইসলামী ১৫ জন, পিডিপি ১২ জন, কনভেনশন মুসলিম লীগ ৭ জন, কাইউমপন্থী মুসলিম লীগ ৭ জন, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৬ জন, নেজামে ইসলাম ৬ জন এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৫ জন। [দৈনিক 'পাকিস্তান', ১০ নভেম্বর, ১৯৭১]

লক্ষণীয় যে 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রেও জামাতে ইসলামী তার প্রাধান্য বজায় রেখেছিলো। ইতিহাসে এই 'জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধিদের' নামের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন বলে জামাতীদের নামগুলি এখানে দেয়া হলো ঃ ঢাকার গোলাম আযম 'নির্বাচিত' হয়েছিলেন টাঙ্গাইল থেকে [এনই '৭১], অন্যরা ছিলেন বাখরগঞ্জের মওলানা আবদুর রহীম, বগুড়ার আব্বাস আলী খান, খুলনার এ কে এম ইউসুফ, কুষ্টিয়ার সাদ আহমদ ও আবদুল মতিন, ঢাকার অধ্যাপক ইউসুফ আলী, রংপুরের জবানউদ্দীন আহমদ, দিনাজপুরের মওলানা তমিজুদ্দিন ও আবদুল্লাহ আল কাফি, ময়মনসিংহের এস এম ইউসুফ, নোয়াখালীর সফিউল্লাহ, রাজশাহীর আফাজউদ্দিন আহমদ, পাবনার মওলানা আবদুস সোবহান এবং টাঙ্গাইলের অধ্যাপক আবদুল খালেক। [দৈনিক 'পাকিস্তান,' ২৩ অক্টোবর—১০ নভেম্বর, ১৯৭১] উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হওয়ার প্রেক্ষিতে ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার উপনির্বাচন স্থগিত ঘোষণা

করেছিল, না হলে জামাতে ইসলামীর সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতো।

'পূর্ব পাকিস্তানের' পক্ষে গোলাম আযমের উদ্যমী ভূমিকা

একাত্তরে পাকিস্তানের রাজনীতিতে জামাতে ইসলামী প্রায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং এর পেছনে ভূমিকা রেখেছিল 'পূর্ব পাকিস্তান' শাখার আমীর গোলাম আযমের 'গতিশীল' নেতৃত্ব। পরিস্থিতি অনুধাবনে এই সময়কালে আযম 'বিচ্ছিন্নতার' প্রমাণ দিতে থাকেন এবং সেই সাথে জামাতে ইসলামীকেও তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সফলতার সাথে। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি এবং নুরুল আমীনের বার্ধক্যের সুযোগ গোলাম আযম বিশেষ করে সেপ্টেম্বর থেকে 'পূর্ব পাকিস্তানের' প্রধান 'প্রবক্তা' হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করেন। 'পূর্ব পাকিস্তান' ও তার অধিবাসীদের দাবী একমাত্র তার মুখ দিয়েই উচ্চারিত হতে থাকে।

১ সেপ্টেম্বর গোলাম আযম 'পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য ৫ দফা পরিকল্পনার কথা' ঘোষণা করেন। তার প্রথম দফায় ঢাকায় সদর দফতর সহ 'পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনর্বাসনের জন্য অর্থনৈতিক কমিটি' নামে একটি সংস্থা গঠনের দাবি করা হয়, যার কাজ হবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করে প্রদেশের উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবন ও সুপারিশ পেশ করা।' দ্বিতীয় দফায় 'অর্থনীতিবিদদের দ্বারা বিভাগের ব্যবস্থা করার' দাবী জানানো হয়। তৃতীয় দফায় গোলাম আযম 'উন্নয়ন খাতে পৃথক প্রদেশ গঠনের কথা বলেন। শেষ দুটি দফায় 'পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী দুর্নীতি প্রতিরোধ' এবং 'বেকারদের চাকুরীর ব্যবস্থা' করার দাবী জানানো হয়।

জামাতে ইসলামীর কর্মী শিবিরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম আযম 'পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য' অভিযোগে মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ওয়ালী খানপন্থী ন্যাপ এবং ন্যাশনাল লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানান। কেননা, 'বিচ্ছিন্নতাবাদী এই দলগুলির কর্মীরা এখনো গোপনে সংহতি বিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছে।' তিনি এই দলগুলির নেতৃবৃন্দকে শাস্তি প্রদানেরও দাবি করেন। [দৈনিক 'পাকিস্তান,' ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১] উল্লেখ্য যে গোলাম আযমের ৫ দফার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত না হলেও ইয়াহিয়া খান এক আদেশে ন্যাপের উক্ত অংশকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ইয়াহিয়া তার এই আদেশে বলেন : 'যারা প্রথমেই পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা দাবী করেছিলেন, মওলানা ভাসানী তাদের অন্যতম এবং এখন তিনি আমাদের শত্রুদের মধ্যে বসবাস করছেন। [দৈনিক 'পাকিস্তান,' ২৭ নভেম্বর, ১৯৭১]

ইয়াহিয়া খান বিশেষজ্ঞদের দিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা ঘোষণা করলে অনেকের মতো গোলাম আযমও 'স্বাগত' জ্ঞাপন করেছিলেন। তার সভাপতিত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান' জামাতে ইসলামীর মজলিস-ই-শূরা ও অখণ্ড পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সমীপে ৭ দফা প্রস্তাব পেশ করে 'কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রণীত' শাসনতন্ত্র ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতি পি ডি এম-র ৮ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং 'পূর্ব পাকিস্তানের' প্রতি সংরক্ষিত অধিকারের

প্রতিহত করার আবেদন জানান। [দৈনিক 'পাকিস্তান,' ৪ অক্টোবর, ১৯৭১]

শেষদিনগুলিতে জামাত ও গোলাম আযম

উপনির্বাচনে 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' বিজয়ী সদস্য 'সমাজতন্ত্রী' ভুট্টোর মোকাবিলায় আইনসভায় শক্তির উৎস হওয়ার পর গোলাম আযমের সক্রিয় উদ্যোগে পাকিস্তান জামাতে ইসলামী জাতীয় পরিষদে সংযুক্ত কোয়ালিশন গঠনের প্রয়াস গ্রহণ করে। পিডিপি, জামাতে ইসলামী ও তিন মুসলিম লীগসহ সাতটি ডানপন্থী দলের সমন্বয়ে ১৫ নভেম্বর লাহোরে গঠিত হয় সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা এবং দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্য গঠিত এই কোয়ালিশনের নেতা নির্বাচিত হন নুরুল আমীন। কোয়ালিশনটি গঠনে গোলাম আযমের অবদান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় একই দিনে ঢাকায় উত্থাপিত তার এক দাবির প্রেক্ষিতে। এতে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদটি একজন 'পূর্ব পাকিস্তানীকে' দেয়ার কথা উত্থাপন করেছিলেন। [দৈনিক 'পাকিস্তান,' ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১] এ প্রস্তাবে ইয়াহিয়া খান গোলাম আযমের দাবির প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন। ৭ ডিসেম্বর তিনি নুরুল আমীনকে প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টোকে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য গোলাম আযমের ভাগ্যে কোনো মন্ত্রীত্ব জোটেনি।

নভেম্বরের প্রথম দিক থেকেই উপনির্বাচনে 'বিজয়ী' দলগুলির পক্ষ থেকে 'জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের হাতে' ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী উত্থাপিত হতে থাকে, গোলাম আযমও দাবীটি সমর্থন করেন। জাতীয় সরকারের নামে 'ঐক্যের সরকার' গঠনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ভুট্টো সার্বক্ষণিক উত্তাপ ছড়ালে তার বিরোধিতায়ও সোচ্চার হন গোলাম আযম। ২৩ নভেম্বর লাহোরে পৌঁছে তিনি 'রাজনৈতিক মতানৈক্য ভুলে গিয়ে কার্যকরভাবে ভারতীয় হামলা মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার' আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত ঃ তিনি ভুট্টোর সমালোচনা করে একথা বলেন যে, 'সারা পাকিস্তানে দেশের এই দুর্দিনে একজন মাত্র লোকই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য নগ্ন রাজনীতি করছেন।'

গোলাম আযম তার অভিমত ব্যক্তকালে বলেন যে 'দেশকে রক্ষার সবচেয়ে বড় কৌশল হলো আক্রমণ করা। আমি এ কথাটি বহুবার বলেছি এবং এখন এটা আরো বেশী সত্য।' ব্যাখ্যাদানকালে তিনি বলেন ঃ 'আত্মরক্ষার চেষ্টা সব সময় শত্রুকে আরো বেশী উৎসাহী ও শক্তিশালী করে তোলে' এবং তাই তিনি আক্রমণের পন্থা বেছে নেয়ার আহ্বান জানান। গোলাম আযম বলেন যে 'দুষ্কৃতকারীরা এখন খুবই সক্রিয়, ভারত প্রকাশ্যে তাদের সাহায্য ও অস্ত্র সরবরাহ করছে এবং ফলে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা খুবই উদ্বিগ্ন।' পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিনি জাতীয় সরকার গঠনের আবেদন জানান। [দৈনিক 'পাকিস্তান,; ২৪ নভেম্বর, ১৯৭১]

আবেদনটি তিনি একান্ত বৈঠকেও জানিয়েছিলেন। ১ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সত্তর মিনিটব্যাপী আলোচনাকালে গোলাম আযম 'নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে সত্যিকার অর্থে ক্ষমতা হস্তান্তর করার' অনুরোধ

জানান। প্রেসিডেন্টকে তিনি আরো বলেন যে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়াও 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য পররাষ্ট্র ও অর্থ দফতরের দায়িত্বও পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে দিতে হইবে।'

ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে গোলাম আযম বলেন ঃ প্রেসিডেন্টকে তিনি এই মর্মে পরামর্শ দিয়েছেন যে 'অতীতে যে সমস্ত অবিচার করা হইয়াছে সেগুলি দূরীভূত করা এবং পূর্ব পাকিস্তারের জনগণের আস্থা অর্জনই হইবে বর্তমানের প্রধান কর্তব্য। ইহাতে প্রেসিডেন্টের সাড়া 'উৎসাহব্যঞ্জক' বলে তিনি মন্তব্য করেন। গোলাম আযম বলেন, 'বর্তমানে জনগণের প্রধান কাজ হইতেছে দেশের প্রতিরক্ষা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় একত্রিত হওয়া।' তিনি এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে 'বর্তমান সংকট মোকাবিলা করার জন্য জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবেন।' 'তথাকথিত মুক্তি বাহিনীকে শত্রুবাহিনী রূপে আখ্যায়িত করিয়া গোলাম আযম বলেন ঃ তাহাদিগকে মোকাবিলা করার জন্য রাজাকাররাই যথেষ্ট।' এ প্রসঙ্গে তিনি রাজাকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি করার জন্য আহবান জানান। [দৈনিক 'ইত্তেফাক,' ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১]

কিন্তু ঘটনা প্রবাহ গোলাম আযমকে নিরাশ করেছিলো ঃ রাজাকার দূরে থাক, অনুগত গোলামের মতো তিনি পাকিস্তানের যে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ছিলেন উৎসর্গীত প্রাণ, তারাও বাংলাদেশের জনগণের সামনে মাথা নত করেছিলো মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে, পাকিস্তান 'টিকে থাকতে' পারে নি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্ধত বিরোধিতা ঃ 'আল্লাহ আকবার' ছিলো না বলে

এ পর্যন্ত উপস্থাপিত তথ্য ও ঘটনাবলীর ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে জামাতে ইসলামী কেবল বিরোধী অবস্থানই নেয়নি, একে সমূলে নস্যাতের জন্যেও দলটির প্রচেষ্টা ছিলো সর্বাত্মক। এই ভূমিকার পেছনে প্রেরণা হিসেবে ক্রিয়া করেছিলো জামাতের জন্মকালীন নীতি। 'হুকুমত-ই-এলাহিয়া' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' আন্দোলন পরিচালনার নাম বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে মাতৃভূমি ও তার অধিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের অস্বীকৃতি তথা জাগরণের বিরুদ্ধে শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার যে ন্যাক্কারজনক নীতি মওদুদী অবলম্বন করেছিলেন তা-ই পরবর্তীকালে জামাতে ইসলামীকে প্রভাবিত রেখেছিলো। এ কারণেই মওদুদীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমানদের 'আত্মঘাতী' আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট পাকিস্তানে জামাত 'টু-নেশন থিওরী'র উদ্ধত রক্ষক হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যেও তারা একই কারণে পেয়েছিলো 'ভারতীয় আধিপত্য' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের আতংক।' একাত্তরে দলীয় ভূমিকার কারণ ব্যাখ্যা করে ১৯৮১ সনের মে মাসে প্রকাশিত 'জামায়াতের আবেদন' পুস্তিকায় জামাতে ইসলামী বলেছে ঃ 'পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক এটা অবশ্যই জামায়াত চায়নি।' কেননা, 'সে সময় জয় বাংলা ও সমাজতন্ত্রের

স্লোগানই প্রধান ছিল। নারায়ে তাকবীর—আল্লাহ আকবর তখন শুনা যায় নি।' আর এজন্যেই 'তখন ভারতের আধিপত্যের ভয়ে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের আতংক স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে (জামাত) বিশ্বাস করতে পারেনি।' (পৃ-৯)

লক্ষণীয় যে জামাতে ইসলামী 'গা'য়ে না-মানা মোড়লে'র মতো ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের ধুঁয়া তুলে স্বদেশের নির্যাতিত ও শোষিত জনগণের স্বার্থের প্রশ্নটিকেই এড়িয়ে গেছে, যুক্তি হিসেবে প্রাধান্যে আনতে চেয়েছে 'রাজনৈতিক মতপার্থক্যের' বিষয়টি। এই দিকটিকে কেউ অস্বীকার করে না কিন্তু একথাও তো সত্য যে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারীদের সকলেই 'জয় বাংলা' স্লোগানটি দেয়নি, এটা ছিলো কেবল আওয়ামী লীগের স্লোগান। মওলানা ভাসানী সহ যে বামপন্থীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন তারা এই স্লোগানটির পক্ষে ছিলেন না, তাদের লক্ষ্য ছিলো সমাজতান্ত্রিক সেই সমাজব্যবস্থা—আওয়ামী লীগের অবস্থান ছিলো যার বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের মতের মিলটি ছিলো স্বদেশ ও স্বাধীনতার প্রশ্নে, দৃষ্টিভঙ্গীগত মতপার্থক্যকে অবদমিত করে তারা স্বদেশ ও জনগণের স্বার্থের প্রশ্নটিকে ওপরে তুলে ধরেছিলেন। 'নারায়ে তাকবীর—আল্লাহ আকবার' স্লোগান মুখে জামাতে ইসলামীও তাই আসতে পারতো স্বাধীনতার সপক্ষে এবং তাহলে আর 'মুসলিম জাতীয়তা বিনষ্ট' হওয়ার সম্ভাবনা থাকতোনা মোটেই। আসলে বাঙালী জনগোষ্ঠীর প্রতি জামাতের আদৌ মমত্ব ছিলো না, তারা চেয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক বিজাতীয় শাসক শোষকদের স্বার্থরক্ষা করার মধ্য দিয়ে তল্পীবহনের মওদুদীয় নীতিকে অব্যাহত রাখতে।

জামাতের যুদ্ধকালীন রাজনীতির বৈশিষ্ট্যের কতিপয় দিক

যুদ্ধকালীন পাকিস্তানে জামাতে ইসলামীর রাজনীতির দিকটিও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। জনগণের অধিকার এবং গণতন্ত্রকে অস্বীকারের নিন্দনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই সময়কালে জামাত সর্বতোভাবেই স্বৈরাচারকে সমর্থন জুগিয়েছে। মওদুদী প্রকাশ্যেই বলেছেন যে জাতীয় পরিষদ তথা জনপ্রতিনিধিদেরকে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে দেয়া ঠিক নয়, সামরিক একনায়ক প্রেসিডেন্টেরই উচিত শাসনতন্ত্র তৈরী করা। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সুযোগে সত্তরের নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অধিকারের ভিত্তিতে বিনা নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্যপদের প্রার্থনা এবং উপনির্বাচনের নামে 'ফাঁকা ময়দানে'র সুযোগ গ্রহণের মধ্য দিয়েও জনগণ এবং গণতন্ত্রের প্রতি জামাতের প্রকৃত মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিলো।

'পূর্ব পাকিস্তান' প্রশ্নে জামাতে ইসলামীর ভূমিকাও তার রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতারণাপূর্ণ চরিত্রকেই উন্মোচিত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর পদ, 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' এবং সংঘটিত অবিচারের প্রতিকার' প্রার্থনার মতো লোক দেখানো সস্তা কতিপয় আবেদন জানানোর মধ্য দিয়ে গোলম আযম যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার পেছনের সামান্যতম উদ্দেশ্যও 'পূর্ব পাকিস্তানের' কল্যাণে নিবেদিত ছিলো না। পাকিস্তান সম্পর্কে 'পূর্ব পাকিস্তানীদের' মনে 'আস্থা' ও জামাতের ভিত্তি তৈরীর পাশাপাশি প্রধান উদ্দেশ্যটি ছিলো জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বিপর্যস্ত করা। এর

কারণ, বাঙালী নিধনের প্রধান নায়কদের অন্যতম হলেও ভুট্টোর মুখে সমাজতন্ত্র উচ্চারিত হতো এবং নির্বাচনের মাধ্যমে নয় কেবল মারপিটের মধ্য দিয়েও ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের জামাতীদের 'ধাওয়া' করে বেড়াচ্ছিলেন। ভুট্টো এবং তার পার্টিকে নাজেহাল করার মাধ্যমে জামাতীরা পশ্চিম পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র বিরোধী মতবাদকে বলিষ্ঠতা দিতে চেয়েছিলেন, ওই সাথে ছিলো পাকিস্তানের ক্ষমতার আকর্ষণও। এই দ্বিবিধ লক্ষ্য হাসিল করার কৌশল হিসেবেই তারা 'পূর্ব পাকিস্তানের' দাবী নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো। বাংলাদেশের চলমান স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক ভূমিকা নিয়ে এবং মওলানা ভাসানী ও শেখ মজিবুর রহমান সহ বাঙালী নেতাদের বিচার ও শাস্তি দাবীর পাশাপাশি 'পূর্ব পাকিস্তানের' সপক্ষে অবস্থান গ্রহণের নামে জামাতীদের এই শঠতাপূর্ণ তৎপরতার আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারেনা। জামাতে ইসলামীর উদ্দেশ্যের এই দিকটি উন্মোচিত হয়েছিলো নূরুল আমীনের নেতৃত্বে 'সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি' গঠনের মধ্য দিয়েও, ভুট্টো যাকে 'তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন।

জামাতে ইসলামের স্বাধীনতা বিরোধিতার অন্তরালে

জামাতে ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতায় কেবল তথাকথিত 'রাজনৈতিক মতপার্থক্যের' মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, স্বাধীনতা যুদ্ধকে নির্মূল করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি জাতি হিসেবে বাঙালীদের সমূলে বিনাশেরও ভয়ংকর পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো । এ জন্যই রাজাকার ও বদর বাহিনী গঠিত হয়েছিলো, শান্তি কমিটিতে যোগদানসহ একারণেই জামাত পাকিস্তানের খুনী সেনাবাহিনীকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছিলো।

শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ-এবং সবশেষে বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েও জামাতের উদ্দেশ্যের উন্মোচন ঘটেছিলো। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিরঙ্কুশ সমর্থনে জামাত সঠিকভাবেই সিদ্ধান্তটিতে এসেছিলো যে, কোনো জাতিসত্তার বিনাশ করতে হলে তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপরই চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে। এই পরিকল্পনার সাফল্য বাঙালী জাতিকে জামাতী চিন্তধারার স্থায়ী আজ্ঞাবহে পরিণত করতো। কিন্তু জাতিসত্ত্বা বিরোধী কোনো উদ্যোগ কখনো জনসমর্থনের জোরে সফল হওয়ার নয়, জামাত নেতা গোলাম আযম তাই পাকিস্তানী সামরিক জান্তার তল্পিবাহক হিসেবে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অন্য কথায় বলা যায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশকে শোষণ ও শাসনের স্থায়ী পদানত অঞ্চলে পরিণত করার যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া চলে আসছিলো, ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তার নামে গোলাম আযম তাকেই চূড়ান্ত রূপদানের ভয়াবহ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

জামাতী রাজনীতি ঃ শোষকদের পদলেহন এবং জনগণ-বিরোধী নাশকতা

আলোচনার সমাপ্তি টানতে গিয়ে বলা যায় ঃ বাঙালী জাতিসত্তাকে জামাতে ইসলামী কোন সময়ই মেনে নিতে পারেনি, একাত্তরে তাই প্রথম সুযোগেই স্বাধীনতা বিরোধী অবস্থান নেয়ার সাথে সাথে জাতি হিসেবে বাঙালীদের সমূলে উৎখাতেরও সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় জামাত নিজেকে নিয়োজিত করেছিলো। ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দলটি জনগণ-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে অবস্থান গ্রহণের ধ্বংসাত্মক নীতিকে অব্যাহত রেখেছে। ইংরেজ থেকে শুরু করে পাকিস্তানী ক্ষমতাসীনদের পদলেহন ছিলো রাজনীতির নামে এর কর্মকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষ করে বাঙালী জাতিগত ঠিকানা এবং স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত সংগ্রামের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়েই জামাতীরা অত্যন্ত ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করেছে, তাদের নৃশংসতা এমনকি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকেও ছাড়িয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে।

শঠতা, সুবিধাবাদ এবং আত্মঘাতিমূলক নাশকতার নীতি সব সময় জামাতে ইসলামীর রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এসেছে। সময়ে সময়ে ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্য জামাতীরা এমনকি জনগণের অধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে জড়িত থাকারও অভিনয় করেছে। ভিন্ন ধরনের দাবী ও কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি এবং আত্মঘাতী কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বসময়ই তারা জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতির পথ থেকে সুচতুরভাবে সরিয়ে নিয়ে গেছে প্রতিক্রিয়ার অন্ধকার চোরাগলিতে।

'ইতিহাস সব কিছু শিক্ষা দেয়, এমনকি ভবিষ্যৎও, আর এজন্যেই বাংলাদেশে জামাতের রাজনীতি ও অবস্থানও প্রসঙ্গতঃ পর্যবেক্ষণের দাবী রাখে। একাত্তরের ভূমিকা প্রসঙ্গে মিথ্যে এবং পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রাখতে গিয়ে 'জামায়াতের আবেদন' পুস্তিকায় বলা হয়েছে ঃ 'তাই বলে টিক্কা খানের সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে রক্ষা করার নামে যত অমানবিক কাজ করেছে তা কখনই জামায়াত সমর্থন করেনি।' [পৃ-১১] জামাতের ভারপ্রাপ্ত আমীর এবং একাত্তরের 'পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খান ১৯৮৬ সনের ১৪ জানুয়ারী করাচীতে বলেছেন ঃ 'বাংলাদেশের জনগণ এখন পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদের কারণে অনুতপ্ত।' দলটির প্রকাশনী বিভাগ প্রচারিত 'বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী' জানাচ্ছে ঃ 'আযাদ দেশ' বাংলাদেশের নতুন করে দাওয়াত ও কর্মসূচীর ভাষা দিলেও (জামাতের) মূল দাওয়াত ও কর্মসূচীর শাশ্বত রূপ বহাল থাকবে। [পৃ-২৭, ১৯৭৯] এরপর জামায়াতের আবেদন' পুস্তিকার অন্য একটি বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য ঃ '৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত জামায়াতের লোকদের নৈতিক মান যা ছিল আজও আল্লাহ্‌র রহমতে তা বহাল আছে।' [পৃ-১১] আর এই জন্যেই ইতিহাসের সচেতন পাঠক হিসেবে জামাতী বক্তব্যের এদিকটির প্রতি সতর্ক মনোযোগ রাখা দরকার।

৫

গোলাম আযম ও জামাতের রাজনীতি
'৭১-এ আমরা ভুল করিনি'

বিচিত্রা প্রতিবেদন

১৯৭৯ সালের মে মাসে বাংলাদেশের মাটিতে স্বনামে আত্মপ্রকাশ করে জামাতে ইসলামী। সংগঠিত হওয়ার জন্য মাত্র দেড় বছর সময় লেগেছিলো তাদের। তারপরই তারা সুপরিকল্পিতভাবে হামলা চালায় মুক্তিযোদ্ধাদের উপর। '৭১-এ নিজেদের অবস্থানকে সঠিক বলে বর্ণনা করে প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে জামাত নেতা বলেন, 'একাত্তরে আমরা ভুল করিনি।' জামাত নেতার এই দম্ভোক্তির পর পরই মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো রুখে দাঁড়ায় জামাতী হামলার বিরুদ্ধে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত প্রতিরোধের কারণে সেই সময় জামাতীরা প্রকাশ্যে কোন সভা সমাবেশ করতে পারে নি। এমনই এক পরিস্থিতিতে বিচিত্রায় প্রকাশিত হয় জামাতে ইসলামের অতীত ও বর্তমান কার্যকলাপ সম্পর্কে এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। প্রথমবারের মতো এই ফ্যাসিস্ট দলটির সাংগঠনিক তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পেরে দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন।

সেই কালো শক্তি জামাতে ইসলামী এখন সর্বশক্তি নিয়ে সক্রিয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে। সক্রিয় ধর্মের নামে। ধর্মের নামেই '৭১ সালে জন্মলগ্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করতে সর্বাত্মক অপপ্রয়াস চালিয়েছিলো জামাত। সেই জামাত '৮১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে ঘোষণা করেছে। তাদের এই ঘোষণা এসেছে স্বাধীনতা অর্জনকারী মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর হামলার মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশে জামাতের সকল কার্যকলাপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জামাত কর্তৃক নিবাচিত কিন্তু অঘোষিত আমীর এবং পাকিস্তানী নাগরিক অধ্যাপক গোলাম আযম। '৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিরোধিতার অভিযোগে 'নাগরিকত্বহীন' অধ্যাপক গোলাম আযম-এর নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবীতে জামাত সংগঠিত হচ্ছে। অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে জামাতীরা তাদের তথাকথিত ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠায় রক্তাক্ত পথ অনুসরণের পক্ষপাতি। তারা শ্লোগান দিচ্ছে 'মরলে শহীদ, বাচঁলে গাজী' ইত্যাদি। কাফনের সাদা কাপড় পরে তারা বহু স্থানে মিছিল বের করেছে। কিন্তু এই জামাতী নেতা শুধু '৭১ সালেই নয়, '৭৩ সালেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন। '৭৩ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশকে

স্বীকৃতি দিতে চাইলে অধ্যাপক গোলাম আযমই ছিলেন অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক। এমন কি বহু মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে 'একঘরে' করে রাখার অপচেষ্টা করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যাতে স্বীকৃতি না দেয় সেজন্যে উল্কার মতো তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর ও তাঁর দলের সকল অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ আজো অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। যে দেশের স্বাধীনতা চাননি, সশস্ত্র বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হননি যিনি, স্বাধীনতার পর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এই ব্যক্তিটি এখন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্যে কেনো মরিয়া হয়ে উঠেছেন? এই প্রশ্ন এখন সকলের মনে। বাংলাদেশকে তিনি চান কি না, বাংলাদেশের অস্তিত্ব বা আদর্শে বিশ্বাস করেন কি না সে প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি! এই দেশকে তিনি 'রাষ্ট্র' হিসেবে এখনো গ্রহণ করেননি। তার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ 'একটা জমি, একটা মাটি,—আর কিছু নয়। তিনি বলেছেন — 'বাংলাদেশের আদর্শ কি—সে ধারণা আমার নেই। শুধু জানি, বাংলাদেশ একটা জমি, একটা মাটি—মাটির কোনো আদর্শ থাকে না। এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরাই ঠিক করবে কোন আদর্শের ভিত্তিতে দেশ চলবে।' তার এ-কথা '৭১ সালের ৩১ আগষ্টের কথার প্রতিধ্বনি। তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'কোনো ভালো মুসলমান তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থক হতে পারে না।' গোটা জাতি যেখানে স্বাধীনতার পক্ষে ছিলো সেখানে তিনি কেনো স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন? এ-প্রশ্নের উত্তর এখনো তিনি দেননি। তবে জামাত দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা অরাজকতা বিশৃংখলতার দিকে দেশকে ঠেলে দেবে বলে বিভিন্ন মহলের রাজনীতিকরা আতংকিত। ইসলামী ভাবাপন্ন দলগুলোও জামাতের ক্রিয়াকলাপে আশংকিত। জামাত দেশে আবার 'রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়ার নীল নকশা' তৈরী করছে বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। জামাতীরা কেবল নিজেদেরকেই 'মোমিন' মনে করে, তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আর সবাই 'কাফের'—হোক সে মুসলমান বা অন্য যে কোনো ধর্মের।

এই দেশের ধর্মপ্রাণ-ধর্মভীরু মুসলমানরা আর যাই হোক জামাতের দৃষ্টিতে মোমিন নয়। জামাতী হলেই তারা প্রকৃত মুসলিম হন। ধর্মকে সামনে রেখে জামাত এক সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়, সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন ঘটনাগুলো থেকে সকলের এ ধারণা হয়েছে।

অতীত ও বর্তমান

১৯৪১ থেকে ১৯৮১। ৪০ বছর। ইতিহাসের পাতা বদলের পালায় জামাতে ইসলামী। পাঞ্জাবের মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী জন্ম দিলেন জামাতে ইসলামী হিন্দের। বৃটিশ ভারত বিভাগ হল ১৯৪৭। দু-দেশের দুটি শাখা গঠন করে মওলানা মওদুদী অস্তিত্ব বজায় রাখলেন দলের।

প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলন তারপর রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন মওলানা ও তাঁর সংগঠন। ইসলাম ধর্মকে তার নিজস্ব ধ্যান ধারণার ছাচে ফেলে অসংখ্য বই পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করতে লাগলেন জামাত অর্থাৎ যুথবদ্ধ জীবন ও

ইসলামের প্রাথমিক শাসন পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের দর্শন। বিরোধ বাঁধল। প্রথমে মওলানা আলেমদের সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে তার নিজের ব্যাখ্যা নিয়ে এরপর সংঘাত পাকিস্তান প্রশ্নে।

মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলন নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

মওলানা মওদুদী বললেন, কেবলমাত্র জামাত ইসলামীর নেতৃত্বেই কায়েম হতে পারে মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম লীগের পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেতাদের হাতে নয়।

১৯৪৭-এ ভারত বিভক্তির পর ১৯৫৩ সালে মওলানা মওদুদী আবার বিতর্ক সূচনা করলেন কাদিয়ানী প্রসঙ্গে নিয়ে। তারা মুসলমান নয় এ ফতোয়া দেবার পর লাহোরে বেধে গেল রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য মওলানা মওদুদীর বিচার হল। ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা সত্বেও ক্ষমা পেয়ে গেলেন। এই ক্ষমায় বহিঃশক্তির হাত ছিলো বলে বিশ্বাস করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও জামাতের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আরো বিতর্ক বিরোধ চলল জামায়াতে ওলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম এবং অন্যান্য আলেমদের সঙ্গে।

১৯৬১ সালে আবার মওলানা মওদুদী জেলখানা থেকে বেরিয়ে বিতর্কের সূচনা করলেন। জন্মশাসন পরিকল্পনা ও মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে সারা পাকিস্তানব্যাপী বিক্ষোভ ও জন্ম শাসনের প্রচারণার সাইন বোর্ড ভাঙ্গার মাধ্যমে।

১৯৭১ সালে মওলানা মওদুদী যে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন তা রক্ষার জন্য হাত মেলালেন পাকিস্তানী সামরিক জান্তার সঙ্গে।

জন্ম হল পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর (প্রধান) অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে দলের সশস্ত্র শাখা আল-বদর সংগঠনের।

২২ নভেম্বর ১৯৭১। জেনারেল নিয়াজীর বাহিনীর পরাজয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে যাবার মুহূর্তে মওলানা মওদুদী তলব করলেন গোলাম আযম ও পাকিস্তান জামাতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর (সহ-সভাপতি) মওলানা আবদুর রহীমকে।

এক বিমানে তারা দুজন লাহোর পৌঁছালেন। ২৩ নভেম্বর পাকিস্তান রক্ষার সংগ্রামে তাদের ভূমিকার জন্যে সংবর্ধনা দেয়া হল।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন একটি রাষ্ট্র সংযোজিত হল। ঘাতকের অস্ত্র উপেক্ষা করে রক্তের ভিত্তির উপর জন্মগ্রহণ করল বাংলাদেশ।

বেঁচে গেলেন অধ্যাপক গোলাম আযম ও মওলানা রহীম। ১৯৭২ সালে পাকিস্তান ছেড়ে হজ্জ করার জন্য জেদ্দা গমন করলেন গোলাম আযম। সেখান থেকে দুবাই, আবুধাবী, কুয়েত, বৈরুত ও লিবিয়া সফর শেষে এপ্রিল ১৯৭৩ তিনি লন্ডনে চলে যান।

১৯৭৩ এ পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে মতামত আহবান করেন।

এ উপলক্ষে পাকিস্তানের জামাতে ইসলামীর মজলিশে শুরার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শুধু দুজন সদস্য—*মওলানা আবদুর রহীম ও চৌধুরী রহমতে এলাহী

বলেন স্বীকৃতি দেয়া যায়। বিরোধিতা করলেন অধ্যাপক গোলাম আযম ও অন্যান্য নেতারা।

মওলানা রহীম এরপর বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

জানা গেছে গোলাম আযমের উদ্যোগে ১৯৭২ সালে পাকিস্তানে যে 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার সপ্তাহ' পালিত হয় মওলানা রহীম তার বিরোধিতা করেন।

জামাতে ইসলামী স্বাধীন বাংলাদেশে ভিন্ন প্রেক্ষিতে পাকিস্তানী আমলের রাজনীতি বর্জন করে গড়ে তোলার প্রশ্নে ক্রমাগত দানা বাঁধতে থাকে।

এছাড়াও তিনি জামাতে ইসলাম নামে সংগঠনকে পুনর্জাগরিত করতে চাইলেন না বিশেষতঃ কালো অতীতের কারণে। জামাতের গোঁড়া রাজনীতিও তিনি এবং দলের অধিকাংশ কর্মীই চাইলেন না। তাঁরা অতীতের, বিশেষতঃ ১৯৭১-এ দলের ভূমিকা ভ্রান্ত বলে বিশ্লেষণ করে মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। ফলে জামাতের চরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে চলতে থাকে। শংকিত গোলাম আযম দেশে আসার সিদ্ধান্ত নেন। জামাতে ইসলামী পুনর্জাগরিত করার ব্যাপারে কর্মীদের ইচ্ছা না থাকলেও গোলাম আযম বাধ্য করেন তার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে। দলের প্রতি সুশৃংখল অনুগত কর্মীরা নীরবে মেনে নিলেও অনেকেই এ সময় দল ছেড়ে যান।

জামাতকে পুনর্জাগরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও অনেকেই মওলানা রহীমকে নেতৃত্বে দেখতে চান। তারা বলেন, যেহেতু গোলাম আযম দেশের নাগরিক নন তাকে দলের নেতৃত্বে দেয়া ঠিক হবে না।

এরপর গোলাম আযমের নির্দেশে মওলানা রহীমের এবং তার সঙ্গের অনেকের নাম পর্যন্ত দল থেকে খারিজ করে দেয়া হয়।

গোলাম আযম লণ্ডন থেকে শুরু করেন ফেলে যাওয়া দলের সাথীদের সংগঠন প্রক্রিয়া। মওলানা রহীম তার অবর্তমানে দায়িত্ব নেন বাংলাদেশে জামাতে ইসলামীকে পুনর্গঠনের। গোপন ভাবে কাজ চলতে থাকে। লন্ডনে এসময় জড়ো হতে থাকেন ১৯৭১-এ পালিয়ে যাওয়া দলের নেতা ও কর্মীরা। পূর্ব পাকিস্তান জামাতের মুখপাত্র দৈনিক সংগ্রাম, সাপ্তাহিক হিসেবে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে, এপ্রিল ১৯৭২ তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে। ১৯৭৬ এর ১৮ জানুয়ারী বাংলাদেশ সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয় যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারেন। গোলাম আযম সঙ্গে সঙ্গে লন্ডন থেকে নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্যে দরখাস্ত করেন। ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ তিনি আবার দরখাস্ত করেন। ২০ মার্চ ১৯৭৮ সরকার তাকে নাগরিকত্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। ১১ জুলাই ১৯৭৮ তিনি পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে তিন মাসের ভিসায় ঢাকায় আসেন। ভিসার আবেদনে উল্লেখ করেন তার মাতা অসুস্থ। অসুস্থ মাতাকে দেখার সুযোগ দেবার জন্যে মানবিক কারণে তাকে ভিসা প্রদান করা হয়।

আট বছর পর এলেন তিনি। কিন্তু বসে থাকতে পারলেন না। দলকে পুনর্গঠনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের এক পুনর্মিলনী সভায় অতিথিদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর নারায়ণগঞ্জ। সভা করতে পারেন নি প্রতিরোধের মুখে। জামালপুরে সভা করতে

পারেন নি। এরপর ফরিদপুরে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে তাঁর জেলা প্রবেশে বিধি নিষেধ আরোপিত করা হয়। তবুও গোপনে তার কার্যকলাপ চলতে থাকে।

এর আগে মওলানা আবদুর রহীম গোপনে দলের কাঠামো বজায় রেখে 'ইসলাম পসন্দ' ছয়টি দক্ষিণপন্থী দলের সমবায়ে ২৪ আগষ্ট ১৯৭৬ গঠন করেছিলেন ইসলামিক ডেমক্রেটিক লীগ। প্রাক্তন নেজামে ইসলাম নেতা মওলানা সিদ্দিক আহমদকে এ দলের সভাপতি নির্বাচিত করে মওলানা রহীম হন প্রথম সহ-সভাপতি। অবশ্য জামাতের নেতৃত্বে প্রাক্তন পি, ডি, পি, খেলাফত রব্বানী, ডেমক্রেটিক পার্টি ইত্যাদির সমবায়ে এ মোর্চা গঠনের প্রক্রিয়ায় এ দলগুলোও বিভক্ত হয়ে যায়।

মওলানা রহীম জামাতকে সংগঠিত করলেও প্রবাসী গোলাম আযমের সঙ্গে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। দলের চরম পন্থীরা বাংলাদেশকে মেনে নেয়ার প্রশ্নে মওলানা রহীমের যৌক্তিকতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। মওদুদীর অধিকাংশ বইয়ের অনুবাদক ও দলের অন্যতম তাত্ত্বিক মওলানা রহীমকে তারা অভিযুক্ত করতে থাকেন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে 'আঁতাতের' জন্যে।

এমনি পরিস্থিতিতে মওলানা সিদ্দিক আহমদ ও অন্যান্য অজামাতপন্থী দলগুলো বেরিয়ে যান জামাতের হস্তক্ষেপের কারণে ২৩ অক্টোবর ১৯৭৭।

গোলাম আযম ফিরে আসার পর মওলানা রহীমের সঙ্গে সংঘাত বেড়ে যায়। ১৯৭৯ সালের পার্লামেন্টারী নির্বাচনের পর আই, ডি, এল-এর ছয়টি আসন লাভের পর গোলাম আযম অনুভব করেন দলকে স্বকীয় রূপে নিয়ে আসতে হবে।

তাছাড়া মওলানা রহীমের সঙ্গেও তার বিরোধ তীব্র হতে থাকে। এমনকি দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার পরিচালনা নিয়ে মারপিটও ঘটে। সম্পাদক আখতার ফারুককে পিটিয়ে বের করে দেয়া হয়।

২৫, ২৬, ২৭ মে ১৯৭৯ ঢাকায় জামাতে ইসলামীর বাংলাদেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। গোলাম আযমকে গোপনে আমীর নির্বাচিত করা হয় নাগরিকত্ব লাভ সাপেক্ষে। প্রকাশ্যে ইয়াহিয়া খানের শেষ গভর্ণর আবদুল মালিকের অন্যতম মন্ত্রী আব্বাস আলী খানকে অস্থায়ী আমীর নির্বাচিত করা হয়।

ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ দলের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী সাংগঠনিক পক্ষ পালন করা হয়। পাশাপাশি গোলাম আযমের নাগরিত্ব পূনবর্হাল কমিটিও দাড় করানো হয়। সারা দেশব্যাপী পোষ্টার প্রচারপত্র ও স্বাক্ষর অভিযান চালানো হয় গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী করে।

১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ প্রথম বারের মতো বায়তুল মোকারমে জামাতে ইসলামীর জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ডিসেম্বর ১৯৮০ দলের পক্ষে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে আব্বাস আলী খান ৫ দফা দাবীনামা পেশ করেন। এ সাংবাদিক সম্মেলনে আব্বাস আলী খান বলেন '১৯৭১ সালে দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য যা করেছি ঠিকই করেছি, ভারতীয় আগ্রাসনের হাত থেকে জনগণকে হেফাজত করার জন্যে'। এ বক্তব্য নাড়িয়ে দেয় দশ বছর আগেকার কালো অতীতকে নতুন করে দেশবাশীর দৃষ্টি আবদ্ধ হয় জামাতের উপর।

১ মার্চ ১৯৮১ বায়তুল মোকাররমে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' কায়েমের লক্ষ্যে

'ইসলামী বিপ্লব'-এর ৭ দফা পেশ করেন আব্বাস আলী খান।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ২৫ মার্চ '৮১ প্রদত্ত বক্তৃতায়—'স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজন হলে বাংলাদেশের মানুষ আবার অস্ত্র তুলে নেবে' এবং 'কতিপয় লোক স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তাদের আমরা ভালভাবে চিনি। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা বিরোধীরা কিছুই করতে পারেনি। আজ যারা বিদেশী অনুপ্রেরণায় স্বাধীনতাকে দুর্বল করতে চাচ্ছে তারাও কিছু করতে পারবে না, বাংলাদেশের মানুষ তাদের ধ্বংস করে দেবে।' এ বক্তব্যের পূর্বাহ্নেই ২১ মার্চ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ১ মে থেকে 'রাজাকার আলবদর প্রতিরোধ' সপ্তাহ পালনের ডাক দেয়। এর উত্তরে রংপুরে জামাত আক্রমণ করে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস। সারা দেশ হয়ে উঠে প্রতিবাদ মুখর। এরপর ২৯ মার্চ আব্বাস আলী খান এক সাংবাদিক সম্মেলনে আবার '৭১ এ আমরা যা করেছি ঠিকই করেছি' এবং 'একাত্তরে বাংলাদেশের কনসেপ্ট সঠিক ছিল না' বলে পুনরায় তাদের অতীত ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

এই প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জের পর বিভিন্ন স্থানে ঘটতে থাকে মুক্তিযোদ্ধা ও জামাতের সঙ্গে সংঘর্ষ।

মূলতঃ ৪০ বছরে জামাতে ইসলামী প্রতি দশ বছর পর পর বিভিন্ন বক্তব্যে জনগণের সঙ্গে কনফ্রনট্রেশনে আসছে।

এ পরিস্থিতিতে তারা দলের ভবিষ্যত অতীতের নিরিখে কি নিরীক্ষা করবেন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাস্তবতার ভিত্তিতে না পুরানো অতীতকে নিয়ে আসবেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে এটাই ১৯৮১-র প্রশ্ন।

'৭১-এর ২৬৬ দিনে গোলাম আযমেরা কি করেছিলেন?

২৫ মার্চ। ১৯৭১। মধ্যরাতে হঠাৎ গর্জে উঠলো বন্দুকের হিংস্রতা। এমন হিংস্রতা, ধ্বংসলীলা, হত্যাযজ্ঞ এই নীরব নিভৃত সবুজ-শ্যামল দেশ আর কখনো দেখেনি। এ সব চলেছে শুধু ধর্মের নামে, যে ধর্মকে এদেশের মানুষ প্রাণের চেয়ে বড়ো বলে জেনেছে। কেবল ধর্মের নামে শোষণ-বঞ্চনা অব্যাহত রাখতে এদেশের মানুষের ওপর পরবর্তী ২৬৬ দিন চলেছিল অমানুষিক বর্বরতা, যা নাদির খান-চেঙ্গিস খানের রক্তলোলুপতাকে ম্লান করে দিয়েছিলো।

এই ২৬৬ দিন গোলাম আযম নাকি এ-দেশের মানুষের জান-মালের হেফাজত করেছিলেন। এ-কথা বলেন জামাতীরা। তারা স্বাধীনতা যুদ্ধকে বলেন গৃহযুদ্ধ। তারা নাকি শুধু ভারতের বিরোধিতা করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বিরোধ নেই। কিন্তু বাংলাদেশকে 'তথাকথিত' ও মুক্তিযোদ্ধাদের 'দুষ্কৃতকারী' বলে ২৬৬ দিন চালিয়েছিলেন জুলুম-হত্যা-ধর্ষণের অকথ্য বর্বরতা (এরা নাকি এসব করেছিলেন ইসলাম রক্ষার জন্যে)। দক্ষিণপন্থী দলগুলোর মধ্যে জামাত সবচেয়ে সংগঠিত অংশ হিসেবে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীকে শুধু সমর্থনই নয়, জনবল দিয়ে সহায়তা করেছে। জামাতের এদেশীয় এজেন্টরা ছিলো সবচেয়ে ভয়ংকর। তাদের সদস্য রাজাকার, আলবদর ও আলশামস পাক সেনাদের নিয়ে যেতো জনপদে। 'মুক্তি' ধরার নামে চালাতো জুলুম, হত্যা। রাজাকার বাহিনীতে দলের বাইরের

লোক বেশী থাকায় জামাত আলবদর ও আলশামস বাহিনী গঠন করে। এরা কাজ করে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে। এবং এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা চরম নৃশংসতায় বহু কলংকিত চিহ্নও রেখেছে। এদেশে পাকিস্তানের সূর্য অস্তমিত হওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জামাতীরা আদর্শ ভূমি 'পাকিস্তানকে' অখন্ড রাখার সকল প্রচেষ্টা বা নীচতা হীনতা হিংস্রতা দেখিয়েছে। ১৬ ডিসেম্বরে সকালেও এরা রাজধানীতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে গেছে যাদের লাশ পাওয়া যায় বিভিন্ন বধ্যভূমিতে.....।

'৮১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে যখন জামাতীরা বলেন, '৭১ সালে তাদের ভুমিকা সম্পর্কে জনগণের কোনো বিজার্ভেশান নেই। বা গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার কমিটি '৭১ সালে গোলাম আযমের ভূমিকা সম্পর্কে যখন বলে ঃ 'ভীত-সন্ত্রস্ত জনতার মাঝে জীবনের নিরাপত্তাবোধ এবং দেশে আইন-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্যে অধ্যাপক গোলাম আযমের সেদিনের বলিষ্ঠ ভূমিকা সর্বজনবিদিত। নিরীহ জনতার উপর টিক্কা খানের সামরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম সোচ্চাব কন্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন।' তখন রাজনৈতিক মিথ্যা ভাষণ ছাড়া আর কিছুই মনে হতে পারে না। বক্তৃতা বিবৃতিই নয়—আলবদর-আলশামস সৃষ্টি করে সর্বস্তরের জনগণকে হত্যার ভয়াবহ স্মৃতিই মনে পড়ে। '৭১ সালের ১৪ আগষ্টও গোলাম আযম এক পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন। সেদিন এক বিবৃতিতে তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব জোরদার করতে আন্তরিক চেষ্টার আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'জাতি যে চরম সংকটের মধ্যে দিয়ে অগ্রসব হচ্ছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এবারের স্বাধীনতা দিবস পালন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের আদর্শের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতাই জাতীয় সংকটের মুল কারণ।'

এর চারদিন পরের বিবৃতিতে বোঝা যায় গোলাম আযম মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর কি পরিমাণ রুষ্ট ছিলেন। ১৮ আগষ্ট লাহোরে তিনি বলেন, ভারত দুস্কৃতকারীদের ('৭১ সালে পাকিস্তানীদের ভাষায় মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন দুস্কৃতকারী) সাহায্য করছে। তাই পাকিস্তানের উচিত কাল বিলম্ব না করে ভারত আক্রমণ করা এবং আসাম দখল করা।

স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে ২৩ আগষ্ট গোলাম আযম লাহোরে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা ভারত ও তার চরদের ষড়যন্ত্রেরই ফল। একমাত্র ইসলামের শক্তিই দেশের অখন্ডতা রাখতে পারে।

গোলাম আযম বলেন, 'যারা জামাতে ইসলামীকে দেশ প্রেমিক সংস্থা নয় বলে আখ্যায়িত করছে তারা হয় জানে না বা স্বীকার করার সাহস পায় না যে, ইসলামের আদর্শ তুলে ধরা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরোধিতা করার জন্যেই কেবল পূর্ব পাকিস্তানে জামাতের বিপুল সংখ্যক কর্মী দুস্কৃতকারীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে।'

জামাতের এই অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক জীবন ধারা পুনরুদ্ধার, মিলিতভাবে দুস্কৃতকারীদের নির্মূল করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আবেদন জানায়।

তাই '৮১ সালেও গোলাম আযম 'এক পাকিস্তান' না 'স্বাধীন

বাংলাদেশে' বিশ্বাস করেন তা নিয়ে সন্দেহগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। জামাতের কাউন্সিলের পর '৭১ সালের ২৮ আগষ্ট গোলাম আজম পেশোয়ারে বলেন—শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শেই দেশের (পাকিস্তানের) দুই অংশের ঐক্য বজায় রাখতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জামাত নেতা পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন।

গোলাম আযম এরপর পাকিস্তানের রাজনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, মন্ত্রীসভা গঠন, পাকিস্তানের শত্রুদের খতম করা ইত্যাদিতে তার ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। গোলাম আযমের এ-পর্যায়ের ভূমিকা শুরু হয় আগষ্ট থেকে যখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কান্নার রোল, রাস্তা-ঘাট-নদী খালে স্বাধীনতাপ্রিয় নারী পুরুষের লাশ, নির্জন জনপদ, সর্বত্র বিরাজমান ভয়-ভীতি সন্ত্রাসের ছাপ।

'৭১ সালে কতজন জামাতী মারা গিয়েছিল?

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে মাত্র ২৭ জন রোকন মারা গেছে। রোকন জামাতে ইসলামীর সবুজ কার্ডধারী সদস্যের নাম। এরাই পার্টির মূল সদস্য। জামাতের ভাষায় ঃ তাঁরা শহীদ হয়েছে। ১৯৭৭ সনের শেষ দিকে জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ ব্যাপী এক জরিপ চালায়। জরিপের উদ্দেশ্য ছিল ঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের কতজন মুত্তাফিক, কর্মী ও রোকন মারা গেছে তা জানা। তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে এই জরিপ পরিচালনা করে। জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে এই জরিপ পরিচালনায় সহায়তা করে বর্তমান মুত্তাফিক, কর্মী ও রোকনগন। দীর্ঘ এক বছর গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে ভ্রাম্যমাণ জরিপ টিম যে রিপোর্ট পেশ করে তা প্রায় চারশ পৃষ্ঠার। কেন, কখন, কিভাবে এবং কারা হত্যা করেছে বা মারা গেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ এতে স্থান পায়। মুত্তাফিক, কর্মী ও রোকনরা মারা যাবার পর তাদের লাশ দাফন হয়েছে কিনা বা লাশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল কিনা তাও লিপিবদ্ধ রয়েছে। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এই রিপোর্টে। জামাতের একটি সূত্র জানায় ঃ বর্তমানে এই রিপোর্ট নিয়ে চলছে পর্যালোচনা। অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে নভেম্বর (৮০) মাসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মৃত মুত্তাফিক, কর্মী ও রোকনদের পরিবারের সদস্যদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রতি মাসে এ সমস্ত পরিবারের সদস্যরা ভাতা পাবেন।

রিপোর্টের এক স্থানে বলা হয় ঃ 'আমাদের বীর সাথীরা জীবন দিয়েছে তবু তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের (জারজ সন্তান) কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।' কুষ্টিয়ার গ্রামে তথাকথিত এক রোকনের মৃত্যু সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয় ঃ 'আমাদের দুজন সাথীর বিশ্বাসঘাতকতার দরুন জারজ সন্তানরা হত্যা করতে পেরেছে না হলে সেটা সম্ভব হতো না। বিস্তারিত বিবরণে জানা যায় ঃ এই রোকন ঐ এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যকারী দুই ব্যক্তিকে দিনে-দুপুরে হত্যা করে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল—পাশের গ্রামেই ছিল বীর মুক্তিযোদ্ধারা। খবর পেয়ে তারা এই রোকন (জামাত সদস্য) কে ঘেরাও করে হত্যা করে।

এই হত্যাকাণ্ডের জন্য জামাতের কতিপয় সদস্যকে দায়ী করা হয়। ১৯৭১ সনে যারা রোকন ছিল তাদের অনেকেই রোকন সদস্যপদ হারিয়েছেন এই রিপোর্টের ভিত্তিতে। রিপোর্ট পাবার পর কেন্দ্র থেকে নির্দেশ গেছে এদের সদস্যপদ খারিজের। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ তারা এলাকার জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না এবং দলের নির্দেশমত কাজ করে না।

রিপোর্টে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর নাম স্থান পেয়েছে। কোন দল কিভাবে কাজ করছে এবং কোন দলের অবস্থা কিরকম তারও উল্লেখ রয়েছে। সরাসরি রাজনীতি করেন না অথচ রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের তালিকা রয়েছে এই '৭৭ সালের রিপোর্টে।

লণ্ডনের একটি বাড়িতে

১৯৭৪ সনের প্রথম দিকে পূর্ব লণ্ডনের একটি বাড়ীতে গোলাম আযম বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতার নীল নকশা পেশ করেন। এই বৈঠকে কয়েকজন পাকিস্তানী নাগরিকও উপস্থিত ছিলেন। লণ্ডন থেকে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবর ঃ এই বৈঠকে এ টি সাদী, তোয়াহা বিন হাবিব, আলী হোসেন, ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দিন, মেহের আলী ও ডঃ তালুকদার প্রমূখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানী নাগরিকদের মধ্যে মাহমুদ আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। বৈঠকে গোলাম আযম বলেন ঃ লণ্ডনে বসে আমাদের কাজ চালানো কঠিন হবে। তাই দেশে যেতে হবে কাউকে। ঝুঁকি নিতে হবে—তা না হলে কিছু হবে না। অবশ্য আপনারা দেশে গেলে লোক পাবেন—আমি যোগাযোগ করেছি। সবই ঠিক আছে। একটা 'ছাপানো লিফলেট সকলের হাতে দিয়ে বলেন ঃ এই লিফলেট গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের সঙ্গে জনগণ রয়েছে। এই লিফলেটে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের কথা উল্লেখ ছিল বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। লিফলেটসহ কয়েক ব্যক্তি সে সময় ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জে ধরা পড়েছিল বলে জানা যায়। লিফলেটের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু জানা যায় নি তবে একটি সূত্র জানায় ঃ এই লিফলেটে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য মসজিদে মসজিদে তৎপরতা শুরু কববার আহ্বান ছিল। গোলাম আযম সে বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ও পাকিস্তানের সহযোগিতার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ টাকার কোন অভাব হবে না। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আপনারা কাজ করে যান। কিভাবে কাজ করতে হবে তার একটি পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ ঃ বুদ্ধিজীবী মহল 'জামাতের' সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে, ইসলামী বইপত্র ছাপাতে হবে, জনগণের যে কোন আন্দোলনে সমর্থন দিতে হবে, প্রয়োজনে টাকা-পয়সা দিয়ে আন্দোলনকে ব্যাপক করতে হবে।

দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হয় যে, দুজন সদস্য কাগজ-পত্র ও প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা নিয়ে বাংলাদেশে ফিরবেন। এই দুজন সদস্যর পরিচয় নিশ্চিত করে জানা যায় নি তবে এদের কেউ কেউ এখন 'ভাল পজিশনে' সমাসীন আছেন বলে জানা যায়। এরা বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার দাবী জানান।

জানা গেছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে বিধ্বস্ত মসজিদ পুনর্গঠনের দাবী জানিয়ে গোলাম আযম ৪৫ লক্ষ রিয়াল সংগ্রহ করেন। এ টাকার একটি অংশ দিয়ে গোলাম আযম যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারের ১ নং এ্যাকস্ব ষ্ট্রীটে একটি বাড়ি কেনেন। বর্তমানে এ বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তারই পুত্র ইঞ্জিনিয়ার মেহদী হাসান।

মধ্যপ্রাচ্যের সে দেশটি ছেড়ে যাবার সময় গোলাম আযম সেখানে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করে যান কুমিল্লার চাঁদপুরের তোয়াহা বিন হাবিবকে।

১৯৭৭ সালের ৩০ জুলাই এরা লণ্ডনের হোলি ট্রিনিটি চার্চ কলেজে আবার মিলিত হয়। সেখানে গোলাম আযমই ছিলেন প্রধান বক্তা। এ সভায় গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহালের দাবী জানিয়ে বক্তৃতা করেন নোয়াখালীর লক্ষীপুরের মওলানা নাসিরুদ্দীন আহমেদ। '৭১ সালে তাকে পাকিস্তান সরকারের খরচে বিদেশে পাঠানো হয় বাংলাদেশ বিরোধী জনমত সংগ্রহে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ইনি লণ্ডনে এসে আস্তানা গাড়েন।

প্রায় একই সময়ে গোলাম আযমের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন পাকিস্তানের এককালীন তথ্যমন্ত্রী আলতাফ গওহার ও তৎকালীন পি, পি, আই প্রধান মোয়াজ্জেম আলী। এদের প্রেরণায় '৭৭ সালের মে মাসে বিবৃতি দিয়ে গোলাম আযম ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ হজ্ব প্রতিনিধি দলের দু'জন সদস্য বিচারপতি বাকের ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ বারী সৌদী আরবে গোলাম আযমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলে জানা যায়।

ডকুমেন্টেশন সেন্টার নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার কাজ চালানো হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন জনৈক ডঃ তালুকদার। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশ বিরোধী খবরের কাটিং এক সঙ্গে করে ছাপিয়ে বের করাই ছিল উদ্দেশ্য। এই সমস্ত কাটিং সমৃদ্ধ কাগজ-পত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন বার লাইব্রেরীতে পাঠানো হতো। জাতীয় প্রেস ক্লাবেও কয়েকবার এসেছে। লণ্ডন ষড়যন্ত্রের সাথে আরো যারা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন মওলানা মান্নান, মাওলানা ইউসুফ, খাজা খয়ের উদ্দিন ও কাজী কাদের প্রমুখ। এদের কেউ কেউ দেশেও ছিলেন।

জামাত একটি ফ্যাসিষ্ট শক্তি

জামাত দয়ামায়াহীন একটি ফ্যাসিষ্ট শক্তি। জামাতের ৪০ বছরের ইতিহাসে ফ্যাসিজমের অজস্র প্রমাণ রয়েছে। ইসলামই দলটির আদর্শ-এ কথা প্রচার করা হলেও, মহান শান্তির ধর্ম ইসলামের উদারতা, বিশালতা, সহনশীলতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন এদের কার্যকলাপে পাওয়া যায় না যখন তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করে। বিরোধী শক্তি ইসলামী-অনৈসলামী যাই হোক, তারা জামাতের ভাষায় 'কাফের'। এবং কাফের খতম করা মোমিনের পরিচয়। পরমত সহিষ্ণুতা এ দলের রাজনৈতিক অভিধানে নেই। ইসলামের নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, ইসলামী বিপ্লব এবং ইসলামী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এ দলের লক্ষ্য হলেও—জামাতের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে রাজতান্ত্রিক শক্তি। রাজতান্ত্রিক শক্তিগুলো এ দলকে অঢেল পেট্রো-

ডলারই নয় সব ধরনের সহায়তা দেয়। শুধু তাই নয়, রাজতান্ত্রিক কিছু দেশ জামাতে কার্যকলাপ নির্বিঘ্ন করার জন্যে নানা ধরনের চাপও দেয়। অথচ ইসলাম রাজতন্ত্র বিরোধী ধর্ম। তাই স্বাভাবিক কারণে প্রশ্ন জাগে জামাতে ইসলামী কি সত্যিকারের ইসলাম পন্থী? তারা কি ইসলামী প্রজ্ঞা, বিজ্ঞানমনস্কতা, উদারতা, সহনশীলতা, ইত্যাদি গুণাবলীর প্রবক্তা? এ প্রশ্নের যে কোনো জামাত কর্মী তখুনিই জবাব দেবেন—'হ্যাঁ।' কারণ, জামাতের রাজনৈতিক শিক্ষায় ইসলামী দর্শন চর্চার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাহলে জামাত নিজ ধর্মের ভ্রাতার হত্যাকারী, ভাই-বোনের ওপর জুলুমকারী হচ্ছে কেনো? এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলাম পন্থী দলগুলোরই মন্তব্য ঃ এ দলের স্রষ্টা মওলানা মওদুদী ইসলামের বিকৃত-কুৎসিত ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। '৫১ সালে জামাতের ইতিহাসে ফ্যাসীবাদী তৎপরতায় কলংকিত। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান বা বর্তমান পাকিস্তান জামাত 'আহমদিয়া'দেরকে অমুসলিম বা কাফের আখ্যায়িত করে নির্বিচারে হত্যা করেছিলো। '৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা পাক-বাহিনীর নির্মমতা-নৃশংসতাকেও ম্লান করে দিয়েছিলো। বদর যুদ্ধের মোজাহিদদের স্মরণে গড়া আলবদরের নাম এখনো আতংক সৃষ্টি করে। জামাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে আলবদর বাহিনী গড়া হয়। হত্যাই ছিলো আলবদরের একমাত্র ও শেষ নীতি। নারী নির্যাতনের অজস্র করুণ ঘটনা শুনে কান্না আসে চোখে। এ সমস্ত বর্বর ফ্যাসীবাদী নৃশংসতা জামাত করেছিলো ধর্মেরই নামে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আলবদর, আলশামস বাহিনী গা ঢাকা দেয়। স্বাধীনতার বিরোধিতার অভিযোগে অন্যান্য দলের সঙ্গে জামাতও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মাত্র একজন অজামাতী রাজাকারের বিচার হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। গা ঢাকা দেওয়ার পর জামাতীরা নিষ্ক্রিয় ছিলো না। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত বহু নাশকতামূলক ঘটনার সঙ্গে এরা জড়িত ছিলো বলেও সাধারণ্যে সন্দেহ বিদ্যমান। এ সময়ে জামাত ইসলামপন্থী বিভিন্ন দলের ওপর নানা ধরনের জুলুম করে। '৭৬ সালের পর তাদের জুলুমের নানা ধরনের ঘটনা আরো ব্যাপকভাবে জানা যায়। '৮০ সালে আলীয়া মাদ্রাসায় জামাতীদের হামলার পরিণতিতে একজন ছাত্র নিহত হয়। খুব বেশী দিনের কথা নয় নোয়াখালীতে সর্বজনমান্য বুজুর্গ হযরত মওলানা হাফেজ মোহাম্মদউল্লাহ'র (হাফেজ্জী হুজুর)-এর এক সভায় জামাতীরা হামলা চালায়। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতিরোধের ফলে তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সাম্প্রতিককালে জামাতীরা আরো সাহস সঞ্চয় করে দেশের রংপুর, রাজশাহী, বরিশালসহ বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর হামলা চালায়।

জামাতীদের বর্তমান রাজনৈতিক তৎপরতা ও মতলব সম্পর্কে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম—বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক মওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী ১১ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'জামাতীরা ইরানের খোমেনী ষ্টাইলে বিপ্লব ঘটিয়ে এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও রাজনৈতিক কর্মীদের রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করার নীল-নকশা তৈরী করছে।' এ অভিযোগ করে সর্বস্তরের মানুষের সতর্ক থাকার জন্যে আহবান জানান।

বিবৃতিতে তিনি জামাতে ইসলামী তথা মওদুদী পন্থীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত

না হওয়ার জন্যে দেশবাসীদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেছেন, যে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে এরা এবারও ধর্মের নামে পুরোনো পদ্ধতি অবলম্বনে ত্রুটি করছে না। এতে তারা লাভবান হোক বা না হোক—এ বিতর্কে না গিয়েও বলা চলে যে এতে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর জামাতে ইসলামীদের হামলা প্রসঙ্গে দু'পক্ষ ও বিভিন্ন মহলের বিবৃতি পাল্টা বিবৃতির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এ কথা জানিয়ে তিনি বলেন যে, প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কেউ কেউ জামাতের লোক ও আলেম সমাজসহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধানটুকু সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখেন না। ফলে জামাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আলেম সমাজ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনেও অনেকে আঘাত দিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'জামাতে ইসলামী সম্পর্কে আমাদের নতুন করে কিছু বলার নেই। এই দলটি ইসলামের নামে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে। আসলে ইসলামের সঙ্গে এদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।' এরা পাঞ্জাবে মওদুদীর বিকৃত চিন্তাধারার ধারক ও বাহক বলে মন্তব্য করে তিনি জানান যে এদের সম্পর্কে এ দেশের সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম বার বার তাদের মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, জামাতে ইসলামী যখনই অন্য কোনো দলের সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তখনই তারা সেটাকে 'ইসলাম ও কাফেরের লড়াই' রূপে প্রকাশ করার অপচেষ্টা করেছে। বর্তমানেও তারা এই পুরোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে ত্রুটি করেনি।

তিনি আরো বলেন, জামাত ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো যে চরমপন্থী এও কোনো নতুন কথা নয়। এরা যে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে শুধু তাই নয়। এরা ভিন্নমত পোষণকারী আলেমদেরকে ফ্যাসীবাদী কায়দায় জব্দ করার চেষ্টার ত্রুটি করে না।

তিনি বলেন, 'এদেশের মানুষ ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার সর্বদা প্রস্তুত-এটা সকলের জানা। তবে ইসলামী আদর্শের নামে এদেশে মওদুদীবাদ কিংবা খোমেনীবাদ প্রতিষ্ঠা করতে দেবেন না জনগণ।'

প্রকৃতপক্ষে গত কয়েক মাসে জামাতীদের কার্যকলাপ ছুরিতে শান দিতে দিতে '৭১ সালের মত ধ্বংস যজ্ঞ শুরুর আলামত বলেই মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো

জামাতের সংগঠন সম্পর্কে বাইরের লোকজনের ধারণা খুব সীমিত। একটি ফ্যাসিষ্ট পার্টির মতই জামাত অত্যন্ত সংঘবদ্ধ এবং নিবেদিত সংগঠন। সুচতুর কৌশলে, টার্গেট নির্ধারণ করে, প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে এরা সদস্য সংগ্রহের কাজে হাত দেয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এরা 'টার্গেটের মন জয় করার চেষ্টা করে। শুরুতেই সংগঠনের সদস্য হওয়ার প্রস্তাব দেয় না। কেননা

তাতে হিতে বিপরীতের সম্ভাবনা থাকে।' একবার এ কাঠামোর ভেতর ঢুকে গেলে আর বেরুনোর উপায় নেই। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের ইতিহাসে তাই মাত্র একবার জামাত দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। তাও বাংলাদেশে। অপর দিকে জামাত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে এর শাখা রয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ জামাতের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ পায় না। আনুগত্যের একটা পর্যায় শেষে এদের বলা হয় মুত্তাফিক বা সহযোগী সদস্য। দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে রোকন বা পূর্ণাঙ্গ সদস্য। পরবর্তী পর্যায় সদস্য, মজলিশে সুরা।

প্রায় একই অবস্থা ছাত্র সংগঠনেও। সেখানে পর্যায়গুলো হচ্ছে সমর্থক, কর্মী, সাথী, সদস্য।

পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ লাভের পর সদস্যরা সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে সংগঠনের কাজ করেন। এজন্যে তারা সংগঠন থেকে মাসিক মাসোহারাও লাভ করেন। পাকিস্তান আমল থেকেই এ নিয়ম চালু আছে। বর্তমানে এ নিয়ম ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। কেন্দ্র থেকে শুরু করে থানা পর্যায়ের কর্মীরা মাস শেষে বেতন পান। ঢাকা থেকে এই বেতন পাঠানো হয়। যারা 'রোকন' তাদের বেতন বেশী। জেলা পর্যায়ে এখন চারশ টাকা করে কর্মীদের বেতন দেয়া হয়। কোন কোন জেলায় এই বেতনের পরিমাণ আরো বেশী।

বর্তমানের প্রেক্ষিতে জামাতে ইসলামী তরুণ ও ছাত্রদের ওপর ভর করেছে। এরা মনে করে তরুণদের দলে টানতে পারলেই ভবিষ্যতে ফায়দা লুটা যাবে।

এই লক্ষ্য সামনে নিয়েই ১৯৭৬ সালে জামাতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত করে ছাত্র সংগঠন—ইসলামী ছাত্র শিবির। শিবিরের পক্ষ থেকে বলা হয় এ সংগঠন নতুন সংগঠন, তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে ইসলামী ছাত্র শিবির তৎকালীন ছাত্র সংঘের উত্তরসূরী এবং ভিন্ন নামের দুটি সংগঠনই জামাতের সহযোগী ছাত্র সংগঠন। বিভিন্ন তথ্য মেলালেই তার প্রমাণ মিলবে।

'৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ছিলেন আলী আহসান মুহাম্মদ মোজাহিদ। উনি বর্তমানে ঢাকা নগর জামাতের সাধারণ সম্পাদক। সে সময় সংঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মীর কাশেম আলী, বর্তমানে রাবেতাতে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত। এদের দুজনের নেতৃত্বেই '৭১ সালে আলবদর বাহিনী সংগঠিত হয়।

আলবদর বাহিনী প্রথম সংগঠিত হয় ময়মনসিংহে কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে। ১৯৭৯ সালে কামরুজ্জামান ছিলেন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সভাপতি এবং বর্তমানে ঢাকা জামাতের যুগ্ম সম্পাদক। '৭৪—'৭৫ সালে আত্মগোপনকারী ছাত্র সংঘের সভাপতি আবু নাসের বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশের ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূতের ব্যক্তিগত সহকারী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জামাতে ইসলামী বা এর সহযোগী সংগঠনগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, শুধু আত্মগোপন করেছিল।

বর্তমানে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সভাপতি আবু তাহের ছিলেন আলবদর কমাণ্ডার এবং ১৯৭১ সালে ইসলামী ছাত্র সংঘের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান এই ছাত্র নেতা আবু তাহের বর্তমানে ঢাকার

মধুবাজারে বিরাট অংকের বিনিময় বাসা ভাড়া থাকেন।

কিন্তু টাকা জোগায় কে? কেননা এই সংগঠনের সদস্য চাঁদা বলে কিছু নেই। টাকার উৎস সম্পর্কে জামাতীরা কেউ কথা বলতে চায় না। একটি সূত্র আভাষ দিয়েছে বিদেশে লোক পাঠানোর মধ্য দিয়ে টাকা আসে। গত এক বছর ধরে গোলাম আযমের ব্যক্তিগত অনুমোদন ছাড়া কেউ মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে যাওয়ার ভিসা পর্যন্ত পায় না। এর অনেক প্রমাণ আছে। সম্প্রতি দু'জন বাংলাদেশী সাংবাদিক ইসলামী সংবাদ সংস্থায় চাকরি পেয়েও এ কারণে ভিসা পান নি। জানা গেছে ঐ দেশটি থেকে প্রতিমাসে জামাতের অনুসারীরা ১০ লাখ টাকা চাঁদা পাঠায়। এ কারণেই সম্ভব হয়েছে ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি সমাপ্ত ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আয়োজন করা।

জামাতীরা '৭১ সালের মত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলছে। জানা গেছে এদের ট্রেনিং দেয়া হয় ঝিনাইদহ ও নাটোর এলাকায়। এবং এই ট্রেনিং পরিচালনা করেন নড়াইলের আলবদর কমাণ্ডার জনৈক সুলায়মান। জানা গেছে পূর্বে এদের দু'টি দল মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে অস্ত্রের ট্রেনিং গ্রহণ করে।

জামাতের কর্মীদের জন্য অন্য কোন দলে যোগদান বা অনুপ্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ। এ কারণেই এদের দলের কেউ বিগত বছরগুলোতে অন্য দলে যোগ দেয় নি।

রাজনৈতিকভাবে সর্বত্র কাজ করা সম্ভব নয় বলে জামাত বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন গড়ে তুলেছে। সংগঠনের পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন মুখপত্র, যেমন সোনার বাংলা, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা ডাইজেস্ট প্রভৃতি। সংগঠনগুলো হচ্ছে ইসলামী এডুকেশন সোসাইটি, ইসলামী সমাজ কল্যাণ সমিতি, আধুনিক প্রকাশনী, মসজিদ মিশন, ফালাহ্ আম ট্রাষ্ট, বাদশাহ ফয়সল ইনসটিটিউট ও গুলশানের মানারত প্রভৃতি। এসব সংগঠনগুলো লোক সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়, যদিও প্রকাশ্যে এর সঙ্গে জামাতের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ চট্টগ্রামে যে ইসলামী সমাজ কল্যান পরিষদ রয়েছে তার সভাপতি হচ্ছেন মওলানা শামসুদ্দীন, যিনি চট্টগ্রাম শহর জামাতের আমীর।

জামাতের একটি প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রকাশনী সম্পর্কে বিচিত্রা তথ্যানুসন্ধান চালিয়েছিল। বিচিত্রা রিপোর্টার তার তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টে বলেছেন ঃ

> দশই এপ্রিল। রাত আনুমানিক ৯টা। ২৫, শিরিষ দাস লেনের আধুনিক প্রকাশনীর প্রধান কার্যালয়। বিরাট প্রেস। আলো নিভে গেছে। লোহার দরজায় টোকা দিতেই বেরিয়ে এলেন একজন লোক। পরিচয় জানতে চাইলে বললেন, সিকিউরিটি গার্ড। ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইলে বললেন, প্রবেশ নিষেধ। তারপর জানতে চাইলেন কেন? বললাম আমার একজন পরিচিত কম্পোজিটরের সঙ্গে কথা বলবো। তবু ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিলেন না। বরং ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, না আমি ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিতে পারবো না। সেখান থেকে ফিরে এলাম। তখন আমাকে অনুসরণ করলো তিনজন অল্প বয়স্ক যুবক। জানতে চাইলো, কাকে খুঁজছি। বললাম, আমার এক পরিচিত কম্পোজিটরকে।

কিছু সময় পরে এলাম আধুনিক প্রকাশনীর বিক্রয় কেন্দ্র, ১৩/৩ পেয়ারী দাস রোডে। তখন দোকানটি বন্ধ। আবার এলাম, শিরিষ দাস লেনের প্রেসে। একজন সার্ট-প্যান্ট পরা যুবক বললেন, বার বার কাকে খুঁজছেন? বললামতো কম্পোজিটররা কেউ নেই। তবু ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখতে পেলাম বাড়িটির এক কোনায় একটি টেবিলে ভাতের প্লেট সাজানো রয়েছে।

ভেতরে ঢুকতেই একজন যুবক বললেন, হাঙ্কি পাঙ্কি রাখেন। বিনীত স্বরে বললাম, আমি একটু মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি বললেন, কোন মালিক নেই। কথা বলতে পারবেন না। এ প্রতিষ্ঠান বোর্ড অব ট্রাস্টি পরিচালিত। আরেকজন বললেন, বার বার বিরক্ত করবেন না।

বাংলা বাজারে বেশ কয়েকটি লাইব্রেরীর লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু কেউ বলতে পারেন না, কে মালিক? প্রতিদিনই একটি বিদেশী দূতাবাস থেকে লোকজন এসে খোঁজ খবর নেন প্রেসের। এই পেয়ারী দাস রোডে যারা ধর্মীয় পুস্তকের ব্যবসা করেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তারা সকলেই হতাশা প্রকাশ করে বললেন, আমাদের পুস্তক ব্যবসা লাটে উঠবার পথে। আমতা আমতা সুরে বললেন, আধুনিক প্রকাশনী আমাদের ব্যবসা শেষ করে দিয়েছে। ধর্মের নামে রাজনীতি নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে। আর টাকা পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ থেকে।

পেয়ারী দাস রোডের এই বইয়ের দোকানটি চালু হয়েছে '৭৮-এর দিকে। আগে ছিলো মদিনা প্রকাশনীর। এরপর '৭৭ সালে তারা দোকানটি ভাড়া দিয়ে দেয়। বছর খানেক পরে বিক্রয় কেন্দ্র খুলে বসেন আধুনিক প্রকাশনী। এ ছাড়া এই প্রকশনীর আরেকটি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে বায়তুল মোকাররমে। এর পর থেকে তারা সাড়ে তিনশ'রও বেশী বই প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বিশাল আয়তনের বইও। কোন কোন পুস্তকের মুদ্রণ সংখ্যা একলাখ পর্যন্ত। এ দেশের কোন প্রকাশনীই একই সংস্করণে এতো বই প্রকাশ করতে পারেনি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাদ দিলে ঢাকার সবগুলো প্রকাশনী মিলেও সাড়ে তিনশ' ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করতে পারে নি।

'৭৮ সালের দিকে আধুনিক প্রকাশনীর বিক্রয় কেন্দ্র চালু হলেও শিরিষ দাস লেনের প্রেসটি চালু হয়েছে বছর খানেক আগে। ছাপানো হচ্ছে বই। কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা। আধুনিক প্রকাশনীর ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান। বিক্রয় কেন্দ্রে কাজ করছেন মোঃ ইউনুছ। আধুনিক প্রকাশনী সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি কিছুই বলতে পারবো না। আধুনিক প্রকাশনীর বাড়ী ও প্রেস মিলিয়ে সম্পত্তির মূল্য হবে এক কোটি টাকারও বেশী।

শিরিষ দাস লেনের প্রেসে থাকছে বহু লোক। প্রতিদিন নতুন

লোক আসছে। এ প্রেসের কর্মচারীরাও জানে না এর মালিক কে? অথচ ঐ এলাকায় প্রেস সম্পর্কে জনশ্রুতি মধ্য প্রাচ্যের একটি দেশের প্রেস। আর জামায়েতে ইসলামীর আন্দোলন আর কর্মধারার কার্যবিবরণী প্রকাশিত হচ্ছে এখান থেকেই। তাই আধুনিক প্রকাশনী আসলে একটি রাজনৈতিক আখড়া। খুচরা বিক্রেতারা এই প্রতিষ্ঠানের বই বিক্রি করছে শতকরা ৩০ টাকা কমিশনে। প্রকাশনীর পুস্তিকায় লেখা রয়েছে, পাইকারী ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। কেবল ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। বাংলা বাজারের কোন কোন পুস্তক ব্যবসায়ী বলেছেন, আমরা নামে মাত্র দামে শতকরা ৬০ টাকা কমিশনে আধুনিক প্রকাশনীর বই কিনেছি। তবু আমরা এই বই বিক্রি করতে উৎসাহী নই। কারণ ধর্মীয় পুস্তক ব্যবসা নিয়ে রাজনীতি চলছে।

ধর্মীয় পুস্তকের ব্যবসা নিয়ে যখন কথা বলছিলাম তখন একটি লোক আমার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, বহুত অইছে। এদিকে আহেন আমি আপনারে সকল তথ্য দিয়ে দিমু। তিনি আমাকে একটি নির্জন গলি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে, আমি বললাম, জনপদ প্রেসে আমার একজন লোক রয়েছে। তারা আমাকে আসতে দিতে চাইলেন না। তবু আসলাম। দৈনিক জনপদ পত্রিকার দোতলায় উঠে গেলাম। পেছন থেকে তারাও কেটে পড়লো। আমি জানি না তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের আচরণ আমার কাছে মনে হয়েছিল বড়ই রহস্যময়। এরা কারা? আধুনিক প্রকাশনীকে পাহারা দিচ্ছে? একজন বললেন আধুনিক প্রকাশনীর ব্যবসা মধ্য প্রাচ্যেও রয়েছে।

একজন ধর্মীয় পুস্তকের লেখক বললেন, ১৩/৩ পেয়ারী দাস রোড, বাংলা বাজারের আধুনিক প্রকাশনী বাংলা বাজারের পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছে একটি বিস্ময়। কারণ এর দাপটে ধর্মীয় বইয়ের ব্যবসা আজ লাটে উঠেছে। একজন প্রভাবশালী পুস্তক ব্যবসায়ী বললেন, '৭০ সাল পর্যন্ত আমাদের বইয়ের সংখ্যা ছিল ৮৩টি। বর্তমানে রয়েছে ৯টি বই। অদূর ভবিষ্যতে বই প্রকাশের তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ ধর্মীয় বইয়ের জগতে ঢুকেছে রাজনীতি।

তাদের এখন প্রধান রাজনৈতিক আদর্শ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। তিনি ইসলামকে ধর্ম নয়, একটি আন্দোলন হিসেবে দেখেছেন। সেই আদর্শের বিপ্লবী যোশ আনার জন্য আধুনিক প্রকাশনী বেশ কয়েকটি বিপ্লবী বই প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে—ইসলাম ও সামাজিক বিপ্লব, সমাজ সংস্কারে নামাজের ভূমিকা, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ইসলামের অর্থনৈতিক বন্টন ইত্যাদি। এধরনের বই পড়ে বহু ধর্মপ্রাণ মুসলিম ক্ষুন্ন হয়েছেন।

এদেশে ইসলামের নামে সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর আদর্শকে প্রচার করছে আধুনিক প্রকাশনী। এই প্রকাশনী মওদুদীর ১৩

খন্ড তাফহীমুল কোরআন প্রকাশ করেছে। আরো ৮ খন্ড প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রকাশিত এই ১৩টি বইয়ের গড় মূল্য কুড়ি টাকারও বেশী। আধুনিক প্রকাশনীর একজন কর্মচারী বলেছেন, বইগুলোর প্রতিটি খন্ডের প্রথম সংস্করণ ৫০ হাজার ছাপানো হয়েছে। চল্লিশ হাজার কিনে নিয়েছে একটি বিদেশী দূতাবাস।

দিনকে দিন প্রেস সম্প্রসারিত হচ্ছে। '৮১ সালের জানুয়ারী মাসে বসানো হয়েছে দুটি ইষ্টার টাইপ মেশিন। অথচ কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। এক তারিখে বেতন পাওয়ার কথা থাকলেও তারিখ পিছিয়ে যায়। অনেক মানসিক চাপের মধ্যে কাজ করতে হয় বলে এই প্রেসের একজন কর্মচারী জানান। আরেকজন কর্মচারী দুঃখ করে বললেন, মধ্যপ্রাচ্যে যাবার জন্য এই প্রেসে কাজ নিয়েছিলাম। বহু লোককে পাঠানো হয়েছে। হচ্ছে। কিন্তু আমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েনি। তাই দুশ্চিন্তার ভেতর সময় কাটাচ্ছি।

জামাতে ইসলামীর আরেকটি অঙ্গ সংগঠন, ফালাহ আল ট্রাষ্ট। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে বিচিত্রার রিপোর্টার লিখেছেন, 'এই ট্রাষ্ট গঠন করা হয়, ষাটের দশকের শেষ দিকে। কয়েকজন পাকিস্তানী ধনী তাদের বাঙ্গালী দোসরদের নিয়ে এই ট্রাষ্ট গঠন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর নতুনভাবে সে ট্রাষ্ট গঠন করা হয়।

পুনরুজ্জীবনের পর এই ট্রাষ্টে ছিলেন জনৈক এ, আর, লস্কর, জনৈক এইচ, এম, হুমায়ুন, জনৈক মৌলানা আবদুল খালেক। এই তিন জনের মধ্যে একজন মারা গেছেন; পরবর্তীতে আরো কয়েকজনকে ট্রাষ্টী নিয়োগ করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বর্তমান ট্রাষ্টীদের মধ্যে রয়েছেন জামাতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান, মৌলবী এ কে এম ইউসুফ, দেওয়ান টেক্সটাইল মিলের মিঃ দেওয়ান, এ আর লস্কর, এইচ এম হুমায়ন প্রমূখ। সব মিলিয়ে সদস্য সংখ্যা ১২। পাক আমলে ট্রাষ্টীদের একজন ছিলেন চক বাজারের হেলাল ট্রেডিং-এর অবাঙ্গালী মালিক।

জানা গেছে, এই ট্রাষ্ট পঁচিশ লাখ টাকা ব্যয়ে (কারো কারো মতে ৪২ লাখ টাকা) মগবাজারে একটি বিরাট বাড়ি ক্রয় করেন। অথচ বর্তমান ট্রাষ্টীদের অনেকেই সুনির্দিষ্ট আয়ের কোন পথ নেই।

অভিজ্ঞ মহল জানান, পার্টির মুখপত্র দৈনিক সংগ্রামের মালিকানা দখল করার জন্য এই ট্রাষ্ট পুঁজি বিনিয়োগ করতে থাকে। কিন্তু অন্যান্য অংশীদাররা ট্রাষ্টের নামে শেয়ার কেনার কথা বললে তারা তা করতে রাজী হয়নি। বরং বিভিন্ন ব্যক্তির নামে শেয়ার বিক্রির জন্যে চাপ দিতে থাকেন। অংশীদাররা তাদের পুঁজির উৎস জানতে চাইলে ট্রাষ্ট বা জামাত তা জানায়নি।

এই ট্রাষ্ট বর্তমানে বহু সম্পত্তির মালিক। অভিযোগ আছে ট্রাষ্ট বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে যাকাতের (!) অর্থ সংগ্রহ করেন। বর্তমানে এই ট্রাষ্টের সুরম্য অট্টালিকায় দৈনিক সংগ্রামের কার্যালয়। এই ট্রাষ্টের প্রেস থেকেই সংগ্রাম ছাপা হয়। অভিযোগ আছে এই ট্রাষ্টের অর্থেই পার্টি চালানো হয়।

আরো জানা গেছে ২৬টি চ্যানেলে জামাতে ইসলামী ঢাকায় বিভিন্ন সূত্র

থেকে অর্থ লাভ করেন। এ অর্থ দিয়ে ব্যাপকভাবে সংগঠন চালানো হয়। যার ভেতরে রয়েছে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিটি ইউনিটের পরিচালনাধীন মেস ব্যবস্থা। প্রতিটি মেসে ৫-১০ জন ছাত্র থাকেন। এ অর্থ দিয়ে কর্মীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে যানবাহনও কিনে দেয়া হয়েছে।

জামাতের আরেকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে শতাব্দী প্রেস। এটি ছাত্র শিবিরের প্রকাশনী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। এ ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয় শতাব্দী ডাইরী।

গোলাম আযম বলেন—

'নাগরিকত্ব না পেলেও আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। শুধু অসুবিধা এটাই সরকার নাগরিকত্ব স্বীকৃতি না দিলে আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া অসুবিধা হচ্ছে।' জামাতের মুখপাত্র একটি দৈনিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক গোলাম আযম এ কথা বলেছেন।

নাগরিকত্ব সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে গোলাম আযম বলেন ঃ 'আমি আরো কিছু সময় অপেক্ষা করে দেখব। আমি সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে চাই না। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে। আমার পক্ষে এভাবে ঘরে বসে তামাসা দেখা সম্ভব নয়।'

একটি সাপ্তাহিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি গৌজামিল দিয়ে কথা বলার লোক নই। যা ফ্যাক্ট তাই বলব। যা বিশ্বাস করেছি, তাই বলেছি এখনও যা বিশ্বাস তাই বলব। আমার সৎ সাহস আছে। আমি তো গোপনে কোন কাজ করিনি যে গৌজামিল দিয়ে আগেকার ভূমিকা আড়াল করার জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলব।'

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন এরও উত্তর নাগরিকত্ব পেলে দেবো তবুও তিনি উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন আদর্শ নিয়ে—আবার উত্তর দিয়েছেন নিজেই। 'বাংলাদেশের আদর্শ কি সে ধারণা আমার জানা নেই।'

আলবদর, আল-শামস গঠন ও কেন নাগরিকত্ব গিয়েছিল এবং বিদেশে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা সম্পর্কিত প্রশ্নে জবাবও এড়িয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন—বলব সবই বলব আগে নাগরিকত্ব হোক।

তথাকথিত নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল জব্বার বলেন ঃ আমরা আরো এক বছর বা দেড় বছর ধৈর্য ধরব—যদি এই মধ্যে না হয় তাহলে আমরা চূড়ান্ত কর্মসূচীতে যাব।

স্বাধীন বাংলাদেশে জামাতের অভ্যুদয়

জামাতকে হযরত সুলেমানের বোতলে পোরা দৈত্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। '৭১ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশ ধর্ম রাজনীতি ব্যবসার মৃত্যু ঘটিয়েছিলো। কিন্তু রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যাই মৃত জামাতের

পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। স্বাধীনতার পর রাজনীতি ক্ষেত্রে অপরিনামদর্শিতা, একশ্রেণীর রাজনীতিকের দূর্নীতি, প্রগতিশীল রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক শূণ্যতা ও হতাশা জামাতের পুনরুত্থানে সহায়তা করে।

"'৭১ সাল থেকে '৮১ সাল পর্যন্ত জামাতই একমাত্র দল যার মধ্যে বড়ো ধরনের ভাঙ্গন ঘটে নি। বরং সুপরিকল্পিতভাবে সমাজের-প্রশাসনের সর্বস্তরে সদস্য সংগ্রহ বা সদস্যদের স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে গোপনে গোপনে। আর সব দল ভেঙ্গে একাধিক হয়েছে নীতি, আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রশ্নে। আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে জাসদ, ডেমোক্রেটিক লীগ, জনতা পার্টি, আওয়ামী লীগ (মিজান), গণআজাদী লীগের সৃষ্টি হয়। জাসদ ভেঙ্গে আরেকটি টুকরো বাসদ হয়েছে। ভাসানী ন্যাপ ভাংতে ভাংতে বহু নামের মধ্যে এখন নিশ্চিহ্ন। মোজাফফর ন্যাপের অবস্থাও তাই। মনি সিংয়ের কমিউনিষ্ট পার্টি এখন কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পিকিং পন্থী দলগুলো বহুধা বিভক্ত ও প্রায় নিশ্চিহ্ন। রাজনীতির ক্ষেত্রে এসব ঘটনা দেশের সর্বাপেক্ষা সচল এবং নির্ধারণী শক্তি ছাত্র সমাজের মধ্যেও প্রতিফলিত। বি এন পি সরকারী দল হিসেবে প্রবল হলেও একাই রাজনীতির সব নয়। মুসলিম লীগ, জমিয়তে উলামা, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি ইসলাম-পছন্দ দলগুলো বলতে গেলে নিক্রিয়। ফলে দেশের রাজনীতির অঙ্গনে ব্যাপক শূন্যতা। আর এ শূন্যতা থেকে নৈরাজ্য। এ শূন্যতা ও নৈরাজ্যই জামাতের চালিকা শক্তি, এ শক্তির ওপর নির্ভর করে জামাত নিজেকে প্রসারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

এদেশের লোক ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু। এটাকেই ভিত্তি করে জামাত এগোতে চাইছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অধিকাংশ লোককে অদৃষ্টবাদী করে ফেলেছে—এটা জামাতে ধারণা। দলকে বিকশিত করার এখনই সুবর্ণ সময়। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে জামাতের '৭১ সালের ভূমিকা নিয়ে। স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জামাত বাংলাদেশকে সম্বোধন করেছে 'তথাকথিত' বলে আর মুক্তিযোদ্ধাদের 'দুস্কৃতকারী' বলে। জামাত '৮১ সালেও বলছে ঃ '৭১ সালে যা করেছি, তা সকলের জানা, আমরা ভুল করিনি। এখানেই জামাত থেমে নেই, জামাত নেতারা বলছেন ঃ আমাদের '৭১ এর ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কোনো রিজার্ভেশান আছে বলে মনে করি না। তাই তারা স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছেন বললেও জামাতের রাজনীতি সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। আসলে জামাত কি চায়? আবার পাকিস্তান না কনফেডারেশন? পাকিস্তানে ভূট্টোর পতন এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের জামাতের সরাসরি প্রভাব সর্বজনবিদিত। তবে জামাত 'ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ' চায়—এটা অবশ্য সরাসরি বলছে। তারপরও জামাতের মতলব পরিস্কার নয়। কারণ, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব জামাতের দর্শন মোতাবেক একটি অস্থায়ী বা অনিত্য অস্তিত্ব। তাই ভারতের মোকাবেলার নামে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশকে প্রথমে পরোক্ষ এবং পরে প্রত্যক্ষভাবে একই রাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতরে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা '৭১ সালের জামাতের রাজনীতির ভিত্তিতে বিশ্বাস করা যায়।

ধর্মের ভিত্তিতে জামাত ভারতের বিরোধিতা করে লাভবান হতে চাইছে। এদেশের লোক ভারতের স্বার্থবাদী মহলের বিরোধী, ভারতবাসীর নয়। কিন্তু জামাত এই বিরোধিতাকে সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত করার অপপ্রয়াস নিচ্ছে।

জামাতের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনলে নেতারা সানন্দে বলেন, 'আল্লাহ্‌র পক্ষে বলা যদি সাম্প্রদায়িকতা হয়, তাহলে আল্লাহ্‌ই সাম্প্রদায়িক।' দেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভবকে ব্যবহার করার জন্যে জামাত সক্রিয়। রংপুর ও দিনাজপুরে মসজিদের ভেতরে হঠাৎ কোরআন শরীফ পোড়ানো আর কারো কাজ নয়, জামাতীদেরই কাজ এটা সকলেরই সন্দেহ।

সাম্প্রতিককালে জামাত তার অঘোষিত আমীর ও পাকিস্তানের নাগরিক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্যে জোর আন্দোলন করছে। গত ১৬ মার্চ নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার কমিটি প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছে, আর আবেদন নিবেদন নয়, এবার থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

মুক্তিযোদ্ধাদের উপর জামাতীদের আক্রোশ কেন?

মুক্তিযোদ্ধাদের উপর হামলায় সারাদেশ এখন প্রতিবাদের সোচ্চার। স্বাধীনতা সূর্য যারা আনলো, তাদের উপর জামাতীদের হামলা আকস্মিক ঘটনা নয়, সুপরিকল্পিত। মুক্তিযোদ্ধাদের উপরই জামাতীদের সবচেয়ে বেশী আক্রোশ। এই 'দুস্কৃতকারীরাই' '৭১ সালে পাকসেনা ও জামাতীদের জুলুমের প্রতিবাদ করেছে সশস্ত্র ভাষায়। মুক্তিযোদ্ধা না থাকলে দেশ স্বাধীন হতো না। পাকিস্তানও ভাঙতো না। মুক্তিদের জন্যেই '৭১-এ তথাকথিত উপ-নির্বাচনে জয়ী হয়েও বেতমারা হাত কাটার শাসন কায়েম করতে পারলো না। শুধু তাই নয় মুক্তিযোদ্ধারাই স্বাধীন বাংলাদেশে জামাতের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। প্রকাশ্য প্রতিবাদ তারাই করছে। জামাতকে এখনো তারাই বাধা দিচ্ছে আন্তরিকভাবে। তাই মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকারী '৭১-এর আলবদররা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের নিশ্চিহ্ন করার ওপরই নির্ভর করছে জামাতের সফলতা। প্রথমে তারা '৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সুপরিকল্পিতভাবে দুর্নাম রটনার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। ধীরে ধীরে সে ফাঁকে সংঘবদ্ধ হয়ে জামাতীরা মুক্তিযোদ্ধাদের একে একে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বর্তমান সময় তাদের জন্যে সুযোগের দরজাও খুলে দিয়েছে। কারণ, বিভিন্ন দল-উপদলে মুক্তিযোদ্ধারা বিভক্ত এবং আত্মসংঘাতে লিপ্ত। মুক্তিযোদ্ধাদের গায়ে হাত দিচ্ছেন একদিকে, অপরদিকে মুখে জামাত নেতারা বলছেন, জামাতের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো বিরোধ নেই। '৭১ সালে নির্বিচারে তারা যাদেরকে হত্যা করেছেন, তারা এখন জামাতীদের কথায়—মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সম্পদ। আমাদের তাদের সংরক্ষণ করা উচিত।' সে সঙ্গে তারা আবার বলছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে। তারা পাল্টা প্রশ্ন করেন; 'দশ বছর পরও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ টিকিয়ে রাখার কি দরকার?' শুধু তাই নয় জামাতীরা মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা প্রশ্ন তুলে দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করতে চান। স্বাধীনতা বিরোধীদের সমালোচনা করায় এমনকি মুক্তিযোদ্ধা প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিরুদ্ধেও 'জাতিকে বিভেদের দিকে ঠেলে দেয়ার' অভিযোগ করেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা জানেন যে, জামাতীরা দেশে 'গৃহযুদ্ধের' একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশকে আবার 'পাকিস্তান' বানানোর ষড়যন্ত্র করছে। এখানেই জামাতীদের ক্রোধ। তাদের ইচ্ছে ও স্বপ্নের সামনে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা মুক্তিযোদ্ধারা।

১৭ এপ্রিল ১৯৮১

(সংক্ষেপিত)

৬

জামাতে ইসলামী ও গোলাম আযমের পুনরুত্থান

শাহরিয়ার কবির

জামাতে ইসলামীর পুনরুত্থানের জন্য অতীতের আওয়ামী লীগ ও বি এন পি সরকার যতটা দায়ী বর্তমান এরশাদ সরকারও কম দায়ী নয়। এই সরকার পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমকে বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে উপহাস করার রাজনীতিতে তৎপর হওয়ার সুযোগ দিয়ে আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সন্তুষ্টির জন্য সচেষ্ট। একই সঙ্গে প্রধান বিরোধী দলগুলি জামাতে ইসলামীর সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেছেন সেই ৮৩ সাল থেকে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে জামাতের ফ্যাসিস্ট চরিত্র সম্পর্কে সেই সময় অধিকাংশ বিরোধী নেতা হয় অজ্ঞ ছিলেন অথবা জেনেও না জানার ভান করেছিলেন, কিম্বা কৌশলের দোহাই দিয়ে নিজেদের ভ্রান্ত নীতিকে যৌক্তিকতা প্রদানের চেষ্টা করেছিলেন। বিচিত্রার এই প্রচ্ছদ কাহিনীতে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অধিকাংশ বিরোধী নেতা নিজেদের দেউলিয়াপনাকে প্রকটভাবে তুলে ধরেছেন যদিও বুদ্ধিজীবীরা জামাত সম্পর্কে প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণে সাহায্য করেছেন সাংবাদিক ফজলুল বারী।

'.....আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধূলিতে অভিশাপ দিচ্ছি।
আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ দিয়েছিলো সেটে,
মগজের কোষে কোষে যারা
পুঁতেছিলো আমাদেরই আপনজনের লাশ দগ্ধ রক্তাপ্লুত,
যারা গণহত্যা
করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে,
অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়েও অধিক
পশু সেই সব পশুদের।'
.....
অভিশাপ দিচ্ছি এতটুকু আশ্রয়ের জন্যে, বিশ্রামের
কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে
দ্বারে দ্বারে ঘুরবে ওরা প্রেতায়িত
সেই সব মুখের ওপর—
দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে পৃথিবীর প্রতিটি কপাট।
অভিশাপ দিচ্ছি।

অভিশাপ দিচ্ছি,
অভিশাপ দিচ্ছি.....

(অভিশাপ দিচ্ছি/ শামসুর রাহমান)

ইতিহাসের চির অভিশপ্ত সেই ঘাতকের দল, '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধে যারা ছিলো হানাদার বাহিনীর প্রত্যক্ষ দোসর, সেই জামাতীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মাথাচাড়া দিয়েছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বলে, থাবার ভেতর হিংস্র নখগুলো লুকিয়ে রেখে।

বর্তমান সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে '৮৩ সালের জানুয়ারীতে ছাত্ররা যে বনিষ্ঠ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন বহু টানাপোড়েন ও ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে সেই আন্দোলন বর্তমানে এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ছাত্রদের পাশাপাশি শ্রমিকরাও আন্দোলনে নেমেছেন। বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তিজীবীরা আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন। আন্দোলনে নেমেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। আন্দোলনের প্রয়োজনে গঠিত হয়েছে ১৫ দলীয় এবং ৭ দলীয় জোট। এই দুটি রাজনৈতিক দলের জোট আবার ৫ দফা সাধারণ দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যমতে উপনীত হয়ে রচনা করেছে ২২ দলের কাঠামো, যার চাপ সামরিক সরকার প্রধান জেনারেল এরশাদও উপেক্ষা করতে পারেননি।

গোটা দেশব্যাপী আন্দোলনের এই অনুকূল পরিবেশ লক্ষ্য করে মাঠে নেমেছে '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর প্রধান সহযোগী, ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যার নেপথ্য নায়ক জামাতে ইসলামীরা। অবশ্য মাঠে তারা আগেও ছিলো, তবে এবার কৌশল পাল্টেছে। আগে তারা রাজনীতি করতো গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক শক্তির সরাসরি বিরোধিতা করে, এবার তারা মাঠে নেমেছে গণতন্ত্রের আন্দোলনকে সহায়তা করার কথা বলে। জামাত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম, বাস্তবে যিনি কিনা এখনো পাকিস্তানের একজন বিশ্বস্ত নাগরিক, যাঁর হাতে এখনো লেগে আছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের দাগ, নর-পিশাচ আলবদর আল-শামসদের সেই অভিশপ্ত অধিনায়ক থাবার ভেতর '৭১-এর হিংস্র ধারালো নখ লুকিয়ে রেখে কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করছেন সামরিক শাসনে গণতন্ত্র বিপন্ন বলে। কাগজে বিবৃতি দিয়ে গণতন্ত্র কায়েমের কথা বলছেন। গণতন্ত্রের জন্য তাঁর মায়াকান্নায় মুগ্ধ হয়ে ২২ দলের নেতারাও তাকে নিজেদের দোসর বলে ভাবতে শুরু করেছেন। যদিও এরই ভেতর কোন কোন মহল থেকে প্রতিবাদ এবং আসন্ন বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারী বাক্য উচ্চারিত হয়েছে, আহবান এসেছে গোলাম আযম ও জামাতকে প্রতিহত করার জন্য কিন্তু রাজনৈতিক মহল এব্যাপারে বিস্ময়জনক নীরবতা প্রদর্শন করছে। আর জেনারেল এরশাদও রাজনৈতিক মহলের মনোভাব লক্ষ্য করে জামাতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে সংলাপের টেবিলে বসে তাদের আশ্বাস দিয়েছেন গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি নাকি তিনি ভেবে দেখবেন। অথচ মাত্র বছর তিনেক আগে মুক্তিযোদ্ধারা যখন গোলাম আযম ও জামাতের পুনরুত্থানকে প্রতিহত করার জন্য দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে জেনারেল এরশাদ সেই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন।

পুনরুত্থানের পটভূমি

'৭১-এর নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে এটা তো মীমাংসিত সত্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে—জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক যে অস্বাভাবিক ও বিকলাঙ্গ রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিলো তার মৃত্যু ঘটেছে। এই সত্যই এদেশে কবর রচনা করেছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরও। এ সত্য তাদের কাছেও স্পষ্ট ছিলো যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে ২৩ বছর এদেশের মানুষকে শোষণ-পীড়ন করেছে এবং যারা তাদের সহযোগিতা করেছে মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তেও। তাই তারা মরণ কামড়ের নীল নকশাটি (বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা) এঁকে পালিয়ে গিয়েছিলো তাদের পিতৃভূমি পাকিস্তানে। গোলাম আযম দেশ থেকে চলে গেলেও রেখে গিয়েছিলেন তার শ্বাপদ-বাহিনীকে আলবদর আল-শামস প্রভৃতি ঘাতক বাহিনীর ভেতর সংগঠিত করে। তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়েছে তাদের পিতৃভূমির জন্য। পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হত্যা করেছে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের।

গোটা জাতির জন্য এটা দুর্ভাগ্যজনক যে স্বাধীনতার এক বছর অতিক্রান্ত না হতেই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করে কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন তাবৎ রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের, যাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলো জামাতে ইসলামী। মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে এবং সংবিধানে তা লিপিবদ্ধ করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ও সরকার প্রধান শেখ মুজিবর রহমান টুপি মাথায় চাপিয়ে ধর্মীয় জলসা, মাদ্রাসা ইত্যাদিতে দাওয়াত রক্ষা করতে গেলেন এবং ছাড়া পাওয়া জামাতীরা দল করতে না পারলেও মহা উৎসাহে 'আজিমুশশান জলছা' আয়োজন করে ওয়াজের নামে ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা নিন্দিত, অভিশপ্ত মওদুদীর মতবাদ প্রচার করতে লাগলো।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জিয়াউর রহমান গদিতে বসে ৫ম সংশোধনীর দ্বারা সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা মুছে ফেললেন এবং রাজনৈতিক দলবিধি জারী করে জামাতে ইসলামীকে রাজনীতি করার অবাধ সুযোগ দিলেন। সুযোগ ও মওকা বুঝেই পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযম এসে বাংলাদেশে পাকাপোক্ত আস্তানা গেড়ে বসলেন।

'৮১-র আস্ফালন

অসুস্থ মাকে দেখার কথা বলে তিন মাসের ভিসা নিয়ে পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযম ঢাকা এসেছিলেন '৭৮-এর ১১ জুলাই। ৮ বছর পর বাংলাদেশে এসেই জামাতকে সংগঠিত করার কাজে ঝাঁপ দিলেন। অতিথি হিসেবে দু'একটি পুনর্মিলনী ধরনের সভায় যোগ দিয়েছিলেন বটে তবে জনসভা করতে গিয়ে জনতার রুদ্ররোষের শিকার হয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিলো তাকে।

১৯৮১'র ১ জানুয়ারী বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত প্যালেস্টাইনের মুক্তিযোদ্ধা শহীদ দু'জন বাংলাদেশী নাগরিকের জানাজায় কোন ফাঁকে যেন ঢুকে কাতারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন এই লোক। জানাজা শেষ হওয়া মাত্র উপস্থিত জনতা

তাঁকে চিনে ফেলে। চেনামাত্র শুরু হয় জুতোপেটা। কোন রকমে সে যাত্রাও পালিয়ে বাঁচেন।

জনতার হাতে বার বার লাঞ্ছিত হওয়ার পর গোলাম আযম তার দলের শ্বাপদবাহিনীকে লেলিয়ে দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে। জামাত নেতা আব্বাস আলী খান সাংবাদিক সম্মেলন (২৯/৩/'৮১) করে বললেন '৭১-এ আমরা ভুল করেনি।' গোলাম আযমও পত্রিকান্তরে সাক্ষাৎকার বললেন। '৭১-এ যা ঠিক মনে করেছি তাই করেছি, এখনও তাই করবো।' পাকিস্তানী নাগরিকটি এই দম্ভোক্তি করলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে বসে, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, যে রক্তে এখনো লাঞ্ছিত এই ঘাতকের দুই হাত।

'৮১ সালে গোলাম আযম ও জামাতের ভয়াবহ আস্ফালনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহবান জানালেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতারা। তাঁরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুললেন, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে। সংসদে নেতারা ঘোষণা করলেন, গোলাম আযমদের এদেশের মাটিতে রাজনীতি করতে দেয়া হবে না। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হলো গোলাম আযম ও জামাতের রাজনীতি শীর্ষক আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রচ্ছদ কাহিনী, যেখানে উন্মোচিত হলো এই ফ্যাসিস্ট সংগঠনটির চরম ঘৃণিত ও অভিশপ্ত চেহারা। দেশব্যাপী প্রবল জনমত গড়ে উঠলো জামাতীদের বিরুদ্ধে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানও স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। তদন্ত কমিটিও গঠন করলেন। কিন্তু এর অল্প কিছুদিন পরই তিনি নিহত হলেন। তাঁর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি যে জড়িত ছিলো এ বিষয়ে আজ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

'৮৪-র পুনরুত্থান

জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যখন সংলাপ শুরু করার কথা প্রথম ঘোষণা করেছিলেন তখন অনেকগুলো রাজনৈতিক দল সংলাপে অংশগ্রহণ করলেও ১৫ ও ৭ দলীয় জোট ৫ দফার পূরণের পূর্বশর্ত দিয়ে সংলাপে যোগদান থেকে বিরত থাকে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ২২ দলের অনুকূলে থাকার প্রথম দফায় যারা সংলাপে গিয়েছিলেন তাঁরা খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। জেনারেল এরশাদও বুঝেছিলেন ২২ দলকে সংলাপের টেবিলে আনতে না পারলে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না। পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনা করে জামাতে ইসলামও ধূর্ততার সঙ্গে প্রথম দফার সংলাপ বর্জন করে। ভাবখানা ছিলো এই যে, তারা ২২ দলের আন্দোলনের সমর্থক। আর ২২ দলও আন্দোলনের মুখোশ পরা জামাতের আসল চেহারা বেমালুম ভুলে গিয়ে—'আছে থাক' এমন একটা ভাব দেখাতে লাগলো জামাতের প্রতি। এমনকি ৭ দলীয় জোটের কোন কোন শরীক জামাতকে তাদের জোটে ঢোকানোর ব্যাপারেও উৎসাহী ছিলো। অন্যরা এই ভেবে বিরোধিতা করেছে—জামাতকে জোটে ঢোকালে ১৫ দলের সঙ্গে সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক ব্যাহত হবে। তবে ৭ এবং ১৫ উভয় জোটের বেশির ভাগ শরীক জামাতকে তাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে মিত্র ভেবে বসে আছে।

জামাতীরা অবশ্য বেশিদিন থাবার ভেতর নখ লুকিয়ে রাখতে পারেনি। গত ১১ এপ্রিল ১৫ দল জেনারেল এরশাদের সঙ্গে প্রথমবার সংলাপে বসে যখন রাজশাহীর ছাত্রনেতাদের দণ্ডাদেশ বাতিল করিয়ে নেয়, তখনই জামাতীদের কদর্য চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে। জামাতের অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির পরদিনই বিবৃতি দিয়ে ১৫ দলও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আদায়কৃত এই দাবীর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। বিবৃতিতে তারা প্রকৃত ঘটনাকে এমনভাবে বিকৃত করে যাতে মনে হতে পারে সামরিক আইনে দণ্ডিত ১৪ জন ছাত্রনেতা আসলেই অপরাধী ছিলেন। শিবির নেতারা বিবৃতিতে বলেছেন—'৮২ সালের ১১ই মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের নবাগত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়ে শিবিরের চারজন কর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আহত করা হয় অর্ধ-শতাধিক শিবির কর্মীকে। এ নৃশংস ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে গোটা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় জেঁকে বসা সামরিক জান্তা দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরও এর কোন বিচার করেনি। অবশেষে এর বিচার হয়। কিন্তু বিচারের এ রায়কে কার্যকর করার পরিবর্তে টালবাহানার আশ্রয় নেয়া হয় এবং পরিশেষে সরকার তার নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেই দণ্ডাদেশ মওকুফ করে দেয়। আমরা মনে করি অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জান্তার পক্ষ থেকে দণ্ডাদেশ মওকুফের ঘোষণা আর একটি জঘণ্যতম অপরাধ এবং শিক্ষাঙ্গনে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করারই সামিল। তাই সামরিক জান্তার এ অন্যায় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত ঘটনার প্রকৃত বিবরণ যাঁরা জানেন না তাদের জন্য শিবিরের এই বিবৃতি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগজনক মনে হবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা জানা থাকলে বোঝা যাবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে নির্জলা মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচারের ক্ষেত্রে জামাতীদের মত ধূর্ততা আর কেউ প্রদর্শন করতে পারবে না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ঘটেছিলো?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতাদের দণ্ডাদেশ বাতিলের জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদই শুধু আন্দোলন করেনি, দেশের গণতন্ত্রকামী প্রতিটি মানুষ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। বিবৃতি দিয়েছেন রাজনৈতিক নেতারা, বুদ্ধিজীবীরা, আন্দোলনে নেমেছেন ছাত্ররা—নিশ্চয়ই কয়েকজন 'খুনী'কে সমর্থন করার জন্য নয়। হত্যার দায়ে যেখানে অভিযুক্ত করা উচিত জামাতীদের সেখানে প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সামরিক আদালতে বিচার করে দণ্ড প্রদান সুগভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

ঘটনা সম্পর্কে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন একটি তথ্যপূর্ণ দলিল প্রকাশ করে। এর অংশ বিশেষ আমরা উদ্ধৃত করছি—

'১৯৮২ সালের ১০ই মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধাচারণকারী এবং আলবদর-রাজাকার ঘাতক বাহিনীগুলির মূল সংগঠক জামাতের লেজুড় ইসলামী ছাত্র শিবিরের একটি আপত্তিকর প্রচারপত্র বিলিকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

চত্বরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কিছু পাণ্ডার সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডার সূত্রপাত হলে শিবিরের পাণ্ডারা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমাণ্ডার নূরুল হক সহ সাধারণ ছাত্রদের উপর আক্রমণ চালায়। এই একতরফা আক্রমণের ফলে মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র নাজমুল আহত হয়। এই ঘটনায় সঙ্গত কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

'ছাত্র শিবিরের এই ন্যাক্কারজনক হামলার প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পরের দিন ১১ই মার্চ সকাল ন'টায় বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (মু-হা), ছাত্রলীগ (ফ-চ) ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনারে এক প্রতিবাদ সভা আহবান করা হয়। এই প্রতিবাদ সভায় যখন বিভিন্ন হল থেকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এসে জমায়েত হচ্ছিল এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এসে উপস্থিত হলেন, ঠিক তখনই প্রায় চার-পাঁচশ ছাত্রনামধারী সশস্ত্র গুণ্ডা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে এক সাথে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হাতে ছিল লাঠি, ছোরা, হকিস্টিক এবং আক্রমণের অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। এখানে উল্লেখ্য যে, যারা এই সশস্ত্র আক্রমণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়, তাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়, বহিরাগত ও ভাড়াটে গুণ্ডা। শিবির ও ছাত্র নামধারী এই ভাড়াটে গুণ্ডারা আগের রাতে এসে মসজিদে অবস্থান নিয়েছিল ছাত্রদের উপর সংগঠিত ও অতর্কিত হামলা চালাবার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে।

'এরপর তারা আমতলার দিকে ধাওয়া করে এবং সেখানে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে যারা ঘোরাঘুরি করছিল, কিংবা ক্লাসে যাচ্ছিল তাদের উপরও হামলা চালায়। শিবিরের পূর্ব-পরিকল্পিত এই সকল হামলায় অসংখ্য নিরীহ ছাত্র আহত হয়।

'এদিকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের বেপরোয়া আক্রমণের ফলে নিরীহ ছাত্র ছাত্রীদের আহত হওয়া এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতির খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর জনাব কিউ, এম, হারুন ও ছাত্র উপদেষ্টা জনাব মনিরুজ্জামান, অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক জনাব ইউনুস, হবিবুর রহমান হলের প্রোভোস্ট এবং ডঃ শহীদুল ইসলাম ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং তাঁরাও শিবিরের ছাত্রনামধারী গুণ্ডাদের নারকীয় তাণ্ডবনৃত্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা সশস্ত্র হামলাকারীদের আক্রমণ ও হামলা থেকে বিরত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেখা গেলো, হামলাকারীরা তাদের কথায় কর্ণপাত তো করলোই না, উল্টো শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের উপরই হামলা চালাতে উদ্যত হয়েছে।

'এই অবস্থায় সাধারণ ছাত্ররা নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী হয়নি। তারা ইসলামী ছাত্র শিবিরের ভাড়াটে গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসে। এই প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ফলে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ছাত্রনামধারী গুণ্ডারা পিছু হটতে এবং সবশেষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

'এখানে উল্লেখ্য, সাধারণ ছাত্রদের এই প্রতিরোধের মুখে ছাত্রনামধারী হামলাকারীরা মরিয়া হয়ে যে হামলা চালায় তাতে রাকসুর ভি-সহসভাপতি ও

বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা অনিলচন্দ মরণ, রাকসুর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির রানা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য বজলার রহমান ছানাসহ অনেক ছাত্র আহত হয়। এই সময় সশস্ত্র হামলাকারীদের বহন করা ছুরিতে তাদের দুষ্কর্মের তিনজন সঙ্গী প্রথমে আহত ও পরে মারা যায়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়, যারা মারা যায়, তারা কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। অর্থাৎ, ইসলামী ছাত্র শিবির সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো উদ্দেশ্যেই যে বহিরাগতদের সংগঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিয়ে এসেছিল, তা এই হামলাকারীদের বেপরোয়া হামলার শিকার তিনজনের পরিচয় থেকেই সকলের কাছে পরিস্কার হয়ে যায়।

'এখান প্রশ্ন হলো, ইসলামী ছাত্র শিবিরের পরিকল্পিত হামলার শিকার তিনজন বহিরাগতের দুঃখজনক মৃত্যুর জন্য দায়ী কারা? নিশ্চয়ই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা কিংবা ছাত্র নেতৃবৃন্দ নন। এই ঘটনার যদি উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ বিভাগীয় তদন্ত হতো এবং তার ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত স্বাভাবিক আইনে এর বিচার হতো তাহলে প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান সম্ভব হতো। আমরা বার বার সে দাবীই জানিয়ে এসেছি। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের মতলব থেকেই সামরিক সরকার তা করেনি।

'ঐদিন ঘটনার পর পরই রাকসুর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির রানা বহিরাগতদের দ্বারা আক্রান্ত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টরের মাধ্যমে থানায় একটি এজাহার দেন। ইসলামী ছাত্র শিবিরও নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দকে আসামী করে একটি পাল্টা এজাহার দেয়।

'কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঢাকাস্থ একটি বিদেশী দূতাবাসের চাপের মুখে সর্বোচ্চ সরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ সাধারণ ছাত্রদের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত এজাহারের অভিযোগের কোন তদন্তই করেনি। পক্ষান্তরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের দায়ের করা মিথ্যা এজাহারের ভিত্তিতে কোন তদন্ত ছাড়াই ১৭ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে '

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে কি বলেছিলেন?

এই ঘটনার দুইদিন পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য প্রফেসর মোসলেম হদার অনুমতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার ঘটনা সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একট বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিটি দেশের সকল জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রেজিস্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সেই বিবৃতিতে বর্ণিত ঘটনার বিবরণই দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, (এক) ইসলামী ছাত্র শিবিরের পাণ্ডারাই এই ঘটনা এবং তিনজন বহিরাগতের দুঃখজনক মৃত্যুর জন্য দায়ী। (দুই) ইসলামী ছাত্র শিবির এবং তাদের রাজনৈতিক মুরুব্বিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা, নৈরাজ্য ও অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে ছাত্র নামধারী সশস্ত্র বহিরাগতদের ঘটনার আগের দিন গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিয়ে আসে

এবং বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে লাঠি, ছোড়া, হকিস্টিক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে এবং পবিত্র মসজিদকে '৭১ সালের মতো দুষ্কর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। (তিন) পুলিশের কাছে প্রদত্ত এজাহারে তারা রাকসুর কর্মকর্তা ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ এনেছে তা মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এই ঘটনার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দেয় তাতেও ইসলামী ছাত্র শিবির ও তাদের মুরুব্বিদের অপরাধ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। শিক্ষক সমিতির বিবৃতিতে এই ঘটনার জন্য দায়ী এবং প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবী জানানো হয়েছিল। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সে দাবীর প্রতিও তৎকালীন সরকার কিংবা পরবর্তীকালের শাসক সামরিক জান্তা কর্ণপাত করেনি।

মামলাটি সাজানো ও হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের কাছে প্রদত্ত ইসলামী ছাত্র শিবিরের এজাহারে আসামী হিসেবে যাদের নাম দেয়া হয়, ঘটনার দিন তাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। ছাত্রলীগ (মু-হা)-এর শ্যামল কুমার রায়, সাংগঠিক সম্পাদক আজিজার রহমান আজু, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের এনায়েত হোসেন (যিনি ঘটনার অনেক আগেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন), রাকসুর সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ—এরা কেউই ঘটনার দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন ছাত্র টাঙ্গাইলের সিরাজুল ইসলামকে এই মামলায় আসামী করা হয় এবং পরে বাদীপক্ষ ছাত্র শিবিরই কোর্টে এ্যাফিডেভিট করে নাম এজাহার থেকে খারিজ করার ব্যবস্থা করে।

মামলাটির কতটা হীন উদ্দেশ্যপ্রসূত ও মিথ্যা তা এই সব ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ সমগ্র বিষয়টি নিয়ে যারা বিচার প্রহসন করেছেন—তারা এসব যুক্তি কখনই বিবেচনায় আনাও প্রয়োজন মনে করেননি।

পক্ষান্তরে, যারা ইসলামী ছাত্র শিবিরের সেদিনের পরিকল্পিত হামলায় আহত ও আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদেরই বিরুদ্ধে বিচার প্রহসন করে সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে। যে ১৭ জন নেতার বিরুদ্ধে পুলিশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে চার্জশীট দিয়েছিল, বগুড়ার বিশেষ সামরিক আদালত তাদের ১৪ জনকেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে।

জামাত পানি ঘোলা করছে

'গণতন্ত্র', 'আন্দোলন' এসব কথা বলা রাজনীতির জোয়ারে খানিকটা গা ভাসিয়ে, ২২ দল আর জেনারেল এরশাদের প্রশ্রয় পেয়ে জামাত তার স্বভাব অনুযায়ী পানি ঘোলা করছে কাঙ্ক্ষিত মাছটি ধরার জন্য। জামাত আন্দোলনের জন্য একটি অপরিহার্য্য শক্তি একথা প্রমাণ করতে পারলে গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব

প্রদানের বিষয়টি সামরিক সরকারের কাছে 'গণতন্ত্রকামী' বিরোধী দলের দাবী হিসেবে জনগণের কাছে প্রতীয়মান হবে। তাছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তরের জামাতী ফর্মূলার অন্তর্নিহিত রূপটি এখন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিজেদের পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা এবার তারা এভাবেই করার কথা ভাবছে।

২২ দলের নেতারা মনে হয় জামাতের শক্তিকে সব সময় বাড়িয়ে দেখছেন। শ্রেণী হিসেবে যাঁরা জামাতকে মিত্র মনে করেন কিংবা যারা একই গুরুর শিষ্য হিসেবে জামাতকে গুরুভাই মনে করেন তাদের কথা আমরা বলছি না। তাঁরা জামাতের আপদে বিপদে জাতীয় ঐক্যের ধুঁয়া তুলে জামাতকে রক্ষা করবেন, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দিতে বলবেন—তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার কথা বলেন, যারা মনে করেন মুক্তিযুদ্ধের ইজারাদারিত্ব এখনও তাদের আছে, তারা কেন জামাতের ভেতর ইতিবাচক দিক খোঁজার জন্য উদগ্রীব এটা আমাদের বোধগম্যের বাইরে। খেঁকী কুকুরের মাথায় উকুন হলে যাকে তাকে কামড়াতে চায় বটে কিন্তু সেটা শক্তির পরিচায়ক নয়। '৮১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে জামাতীদের কুকুর তাড়া করেছিলেন সেটা কি ২২ দলের নেতারা ভুলে গেছেন? কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা যদি সারমেয় দমনে যথেষ্ট শক্তিশালী হন তবে কেন সেইসব আঁস্তাকুড়ের কুকুরদের সঙ্গে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বলে ২২ দলের নেতাদের এক থালায় ভাত খেতে হবে? ২২ দলের আস্কারা না পেলে একজন পাকিস্তানী নাগরিক কি করে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে নাক গলাবার সাহস পায়? এই ঘাতকের নাগরিকত্ব দাবী করার সাহস পায় কোত্থেকে? কিভাবে তারা আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করা দাবীকে বলতে পারে 'সামরিক সরকারের চক্রান্ত।'

জামাত পানি ঘোলা করছে, ২২ দলের নেতারা তাদের সাহায্য করছেন। সব নেতা না হলেও বেশিরভাগ নেতা জামাতকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। জামাত চায় '৭১ সাল আবার ফিরে আসুক। দেশের ছাত্র-শ্রমিক-জনতা যখন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবীতে সোচ্চার হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন জামাত চায় সেই মুহূর্তে এমন কিছু ঘটনা সৃষ্টি করতে যাতে আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়, যাতে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন পরিচালিত হয় এক গৃহযুদ্ধের লক্ষ্যে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জের টেনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর শিবিরের হামলা তারই এক বাস্তব উদাহরণ।

জামাত ২২ দলকে তাদের বিরোধিতা থেকে বিরত রেখেছে ২২ দলের আন্দোলনকে সমর্থন করার কথা বলে। জেনারেল এরশাদকে চাপ দিচ্ছে ২২ দলের সমর্থনের কথা বলে। তারা জানে মুক্তিযোদ্ধারা আগের মতো সংগঠিত নয়। আন্দোলনের যে জোয়ার এসেছে সেখান থেকে যতটুকু ফায়দা তোলা যায় জামাত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেটুকু করে চলেছে। যার ফলে পানি ক্রমশ ঘোল হচ্ছে। জনগণের আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ক্রমশ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

২২ দলের আন্দোলন ও জামাতে ইসলামী

ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ৫ দফা ভিত্তিতে যে আন্দোলন শুরু করেছে জামাতে ইসলামীও সেই আন্দোলনকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেছে। ২২ দলের অধিকাংশ শরীক নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বলে দাবী করে। স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে বক্তৃতার বিবৃতিতে এইসব দলের নেতারা অনেক কথাই বলেন। তবে কার্যক্ষেত্রে তারা স্বাধীনতার চিহ্নিত শত্রুদের কতটুকু বিরোধিতা করেন বিশেষ করে জামাতে ইসলামীর মতো ফ্যাসিষ্ট পার্টি সম্পর্কে তাঁদের বর্তমান মূল্যায়ন কি—বিষয়টি জানা দরকার। আমরা ২২ দলের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে প্রশ্ন করেছিলাম ২২ দল বর্তমান সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালাচ্ছে এক্ষেত্রে জামাত ইসলামী পার্টির ভূমিকাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন?

আমাদের প্রশ্নের জবাবে বাকশাল নেতা কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী বলেছেন—'জাতীয় রাজনীতিতে জামাতের অবস্থান আমাদের জানা আছে এবং সেখানে আমাদের সঙ্গে তাদের রাজনীতির মৌল বিষয়সমূহে প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে তাদের বিতর্কিত অবস্থানের কারণেই তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এখনো আছে। সম্ভবতঃ সে কারণেই সামরিক শাসন বিরোধী জাতীয় ঐক্যমত যা ১৫ দল এবং ৭ দলের তথা জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে—সেখানে সামরিক আইনের প্রশ্নে তারা কিছু ইতিবাচক প্রশ্ন জনগণের সামনে তুলে ধরেছে এবং এর মাধ্যমেই তারা জনগণের সাথে যে বিচ্ছিন্নতা আছে তা কাটিয়ে উঠতে চায়।'

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন—'জামাতে ইসলামীর বর্তমান রাজনৈতিক ভূমিকা গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে সহায়তা করছে।'

জাসদ নেতা শাহজাহান সিরাজ বলেছেন—'আমার ধারণা জামাতে ইসলামীর রাজনীতিতে একটা নতুন চৈতন্য এসেছে। তারা মনে করছে পুরনো কায়দায় সামরিক শাসন বা স্বৈরতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন করে—জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে রাজনীতিতে টিকে থাকা সম্ভব না। সম্ভবতঃ সে কারণেই তারা সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থান সংহত করার চেষ্টা করছে।'

৭ দলীয় জোটের শরীক গণতান্ত্রিক পার্টির নেতা সিরাজুল হোসেন খান বলেছেন—'৫ দফার আন্দোলন চলছে। ৭ দলীয় ঐক্যজোট ও ১৫ দল তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এর বাইরেও অনেক রাজনৈতিক দল ৫ দফা দাবী ও আন্দোলনকে সমর্থন করছে। বিশেষ করে সামরিক শাসনের অবসান করে সার্বভৌম জাতীয় সংসদ এর নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর-এর ইস্যুটি হচ্ছে ৫ দফার মূল দাবী। এ দাবীর প্রশ্নে আজ একটা অপ্রতিরোধ্য ঐক্যমত (কনসেন্স) গড়ে উঠেছে। এ কনসেন্সাসকে জামাতে ইসলাম দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে এবং নিজ অবস্থান থেকে

আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ আন্দোলন আমার মতে ৫ দফা আন্দোলনের সহায়ক। অবশ্য জামাতে ইসলামীর নিজস্ব সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে।'

বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান বলেছেন—'শুধু জামাতে ইসলামী পার্টি বলে কথা নয়, একটা স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে কোন শক্তি—তা তাদের ভাবাদর্শ, শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি এবং লুকানো উদ্দেশ্যের যতই ক্ষতিকারক দিক থাক না কেন এবং জনসাধারণকে সতর্ক করার বিষয়গুলো যত গুরুত্ব নিয়েই অবস্থান করুক না কেন, তারা অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সমর্থন দিতে পারে। উক্ত বিষয়সমূহকে ঠিক ঠিকভাবে আদর্শগত ও সাংগঠনিক উভয়ক্ষেত্রে উন্মোচিত এবং পরাস্ত করা গেলে এই ধরনের অংশগ্রহণ এবং সমর্থন স্বৈরাচারী বিরোধী আন্দোলনের কার্যকারিতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আজকের দিনে স্বৈরাচার, বিশেষ করে আমাদের দেশে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন কৌশলে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিকে সুড়সুড়ি দিয়ে এবং পশ্চাদপদ সকল ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল ও শক্তিসমূহকে তাদের সামাজিক সমর্থনের ভিত হিসেবে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিবাদী শক্তি ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। সেদিক থেকে বর্তমানে সামরিক স্বৈরশাসন বিরোধী মনোভাব ও প্রচারসহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি জামাতে ইসলামীসহ আরও কতিপয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল ও শক্তিসমূহের সমর্থনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।'

ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন বলেছেন—'বর্তমান সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে সেক্ষেত্রে ২২ দল ও জামাতে ইসলামীর লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ঐক্য থাকলেও অবস্থান ভিন্ন। এই ভিন্ন অবস্থান ঐতিহাসিক কারণেই। যার ফলে ২২ দল ও জামাতে ইসলামী সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে একই সময় অংশগ্রহণ করলেও, দুই ধারার কোন মিল হচ্ছে না। এবং জামাতে ইসলামীর যদি তার মূলগত অবস্থান পরিবর্তন না করে তবে এই মিল হওয়ার সম্ভবনাও কম।

'একথা সুস্পষ্ট যে ২২ দল, বিশেষ করে ১৫ দলের সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোন অবকাশ নাই। সেক্ষেত্রে জামাতে ইসলাম এখনও পর্যন্ত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী আদর্শগত অবস্থান পরিবর্তন করেনি। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবী ও জামাত সমর্থক ইসলামী ছাত্র শিবিরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্রনেতার সামরিক কোর্টে দণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের বিরোধিতা জামাতের উক্ত অবস্থানেরই প্রমাণ দেয়। তবে জামাত সামরিক শাসনের বিরোধী অংশগ্রহণ করায় ২২ দলের আন্দোলন কিছু সুবিধা পেয়েছে। তবে এই সুবিধার কারণে মৌল বিষয়কে বিসর্জন দেয়া যায় না।'

ইউপিপি'র নেতা কাজী জাফর আহমেদ বলেছেন—'৭ দলীয় ঐক্যজোট ও ১৫ দল যুগপৎভাবে জাতীয় দাবী ৫ দফার ভিত্তিতে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে তাতে জামাতে ইসলামী সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।'

সিপিবি (বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি)-র নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ বলেছেন—'জামাতে ইসলামীর সর্বশেষ রাজনৈতিক ভূমিকা অর্থাৎ বিবৃতির মাধ্যমে

অধ্যাপক গোলাম আযমের রাজনৈতিক অঙ্গনে পদচারণা, জামাতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির কর্তৃক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্র নেতার দণ্ডাদেশ মওকুফ সম্পর্কিত উক্তি সম্পর্কে দলগত মূল্যায়নের সময় এখনো পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। তবে এব্যাপারে আন্দোলনের আংশিক বিজয় হিসেবেই ছাত্র নেতাদের দণ্ডাদেশ মওকুফ হয়েছে। এব্যাপারে শিবির-এর বক্তব্য আন্দোলনের বিজয় এর বিরুদ্ধে গেছে। তবে এও স্বীকার্য ১৫ দল ও ৭ দলের সামরিক শাসনের বিরোধী আন্দোলনে জামাত কিছু ইতিবাচক উপাদান রেখেছে। কিন্তু সার্বিক বিচারে মনে হয় সাম্প্রতিক সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে তারা শুধু তাদের অতীত ভূমিকার স্খলন করে চলতি ধারায় আসতে চেয়েছে। অধ্যাপক গোলাম আযমকে রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তারা সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে শরীক হয়ে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছে। সুতরাং জামাতের এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ কতটা জাতির জন্য আর কতটা গোলাম আযম-এর স্বার্থে সঙ্গত কারণেই সে সন্দেহের উদ্রেক হয়।'

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সম্পর্কে নেতারা কি ভাবছেন?

'৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক-হানাদার বাহিনীর অন্যতম দোসর এবং ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যার নেপথ্য নায়ক জামাতে ইসলামীর নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম পাকিস্তানী নাগরিক হয়েও দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বসবাস করছেন এবং সময় সুযোগ বুঝে তাঁর দলের লোকজন তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবী উত্থাপন করছে। এ সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃবৃন্দকে প্রশ্ন করেছিলাম—'অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি?'

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—'অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সে তো পাকিস্তানী নাগরিক। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছে। তারপর কিভাবে সে এতদিন যাবৎ বাংলাদেশে আছে সে ব্যাপারটি রহস্যজনক। তাছাড়া সে বাংলাদেশে থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাক গলাচ্ছে। বিবৃতি দিচ্ছে। সংবাদপত্রে তা ছাপাও হচ্ছে। এসবই হচ্ছে সরকারের দুর্বলতার কারণে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এব্যাপারে সরকারের দুর্বলতা কোথায়?'

জাসদ নেতা শাহজাহান সিরাজ এ সম্পর্কে বলেছেন—'অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ, অতীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তার যে ভূমিকা তা ক্ষমাহীন এবং ন্যাক্কারজনক। পরবর্তী পর্যায়ে এসে তার অতীত ভূমিকা ব্যাখ্যা করে জাতির কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করেননি। সেই গোলাম আযম কিভাবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আশা করেন?'

ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেননের বক্তব্য—'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা ও একাত্তরে গণহত্যার সাথে জড়িত থাকার কারণেই অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারিয়েছেন। তিনি যদি অনুতপ্ত

হন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধিতার জন্য তার দোষ স্বীকার করেন, তবে তার নাগরিকত্ব পুনঃপ্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। এবং সে ক্ষেত্রে তার কৃত অপরাধের দায়ও তাকে বহন করতে হবে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে বিগত সরকার ও বর্তমান সরকার বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং একে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছেন। এর অবসান হওয়া প্রয়োজন।'

সিপিবি নেতা মোহাম্মদ ফরহাদের বক্তব্য—'অধ্যাপক গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেয়ার প্রশ্নে ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা এর প্রতিবাদ করেছে। ১৫ দল এবং ৭ দল '৭১-এর স্বাধীনতার ধারা এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে প্রগতিশীল পথে দেশের গণমানুষের সমস্যার সমাধানের লক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময় অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবী সমর্থন দেয়া আমাদের জন্য কঠিন ব্যাপার।'

ইউপিপির নেতা কাজী জাফর আহমেদ বলেছেন—'অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদানের প্রশ্নে সরাসরি বক্তব্য রাখা কঠিন এ কারণে যে, স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের ভূমিকার জন্য তিনি জনগণ কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিলেন একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে তাঁর অবস্থানের প্রেক্ষিত ও ভিত্তি' সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা নেই। এ সম্পর্কে সরকারের ভূমিকাও সম্পূর্ণ রহস্যজনক। বাংলাদেশের নাগরিক না হয়ে কিভাবে তিনি সংবাদপত্রে রাজনৈতিক বিবৃতি দিচ্ছেন এবং কিভাবে তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে আমরা মনে করি নাগরিকত্ব যে কোন মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা কতটুকু সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত তা গভীরভাবে চিন্তা না করে শুধু ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হওয়া সঠিক নাও হতে পারে। আমরা মনে করি যে, অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে দেশের আইন অনুযায়ী তার বিচার ও কঠোর শাস্তি বিধান করা যেতে পারে। সুতরাং নাগরিকত্ব বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে বরং মূল বিষয়টিকেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা তাও গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।'

বাসদ নেতা খালেকুজ্জামানের বক্তব্য—'সামরিক স্বৈরশাসন বিরোধী ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে যা এখনও পরিণত রূপ লাভ করতে পারেনি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এমন কোন বির্তকমূলক বিষয় উপস্থাপন করা উচিত হবে না যা আন্দোলনকারী শক্তিসমূহের মধ্যে বিভেদ, বিভক্তি বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং স্বৈরাচারের হাতকে শক্তিশালী করতে পারে এবং জনতার দৃষ্টিকে মূল সমস্যা থেকে ভিন্ন দিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত একটি সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক পরিবেশেই যে কোন রাজনৈতিক বিতর্কের নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।'

গণতান্ত্রিক পার্টির নেতা সিরাজুল হোসেন খানের বক্তব্য—'যে কারণে অধ্যাপক গোলাম আজম-এর নাগরিকত্ব গেছে অথবা যে কারণে তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই হবে তার নাগরিকত্ব প্রদানের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত।'

মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের আহবায়ক ও বাকশাল নেতা কর্ণেল (অবঃ)

শওকত আলীর বক্তব্য—'অধ্যাপক গোলাম আযম-এর মতো জন ও জাতিদ্রোহী ব্যক্তিকে কিছুতেই বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেয়া উচিত হবে না। নাগরিকত্ব ছাড়া দীর্ঘ বছর যাবৎ সে কিভাবে বাংলাদেশে আছে তা রহস্যজনক। তাছাড় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তার যে তৎপরতা তাও যথেষ্ট দূরভিসন্ধিমূলক।'

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

জামাতে ইসলামীর বর্তমান রাজনৈতিক ভূমিকা ও অধ্যাপক গোলাম আযম-এর নাগরিকত্ব প্রদানের দাবীর প্রশ্নে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-এর বর্তমান কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, সংসদের চেয়ারম্যান জাকির খান চৌধুরী ও এর সেক্রেটারী জেনারেল মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন (বীর প্রতীক) বিচিত্রার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।আমরা তা নিম্নে পত্রস্থ করলাম ঃ

প্রশ্ন ঃ ২২ দল বর্তমানে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে জামাতের ইসলামের ভূমিকাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন?

উত্তর ঃ গণতন্ত্র উত্তরণের আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে জামাত অত্যন্ত সুকৌশলে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিদের পুনঃসংগঠিত করছে এবং ঘোলা জলে মাছ শিকার-এর অভিপ্রায় নিয়ে নিজেদেরকে রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এবং এটা জাতির জন্য নেহাৎ দুর্ভাগ্যজনক।

প্রশ্ন ঃ অধ্যাপক গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ বাংলার মাটিতে এ দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা এটাকে কোন মতেই মেনে নেবে না। বিদেশী নাগরিক গোলাম আযম এ দেশে থেকে তার ভারপ্রাপ্ত আমীর-এর মাধ্যমে নিজেকে এবং তার দলকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা যে কোন মূল্যে তার এ অপচেষ্টা প্রতিহত করব। সে সঙ্গে দেশের যে রাজনৈতিক দলগুলো বর্তমানে দেশে গণতন্ত্র উত্তরণের আন্দোলন চালাচ্ছে তাদের প্রতি আমাদের আবেদন স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিরা যেন কোনভাবেই এ আন্দোলনের সুযোগ না নিতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। এবং তারা যেন কিছুতেই সে সুযোগ না দেয়।

প্রশ্ন ঃ '৮১ সালে আপনারা জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি কেন?

উত্তর ঃ সে সময়ে তৎকালীন সরকার আমাদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে এ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করেন। সে জাতীয় কমিটির 'টার্মস-অব-রেফারেন্স'-এর ওপর বর্তমান রাষ্ট্রপতি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-এর প্রধান উপদেষ্টা লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ তার ব্যক্তিগত মতামত উক্ত কমিটির নিকট ব্যক্ত করেন। এর পর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শহীদ হয়ে যান। সে কারণেই পরবর্তী পরিস্থিতির কারণে সে কমিটির কাজ স্থগিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান অবস্থায় আপনাদের সে আন্দোলন পুনরায় শুরু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তর ঃ দেশের সার্বিক অবস্থা মূল্যায়ন সাপেক্ষে অচিরেই আমরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য অধ্যাপক গোলাম আযমসহ স্বাধীনতা বিরোধী সকল শক্তিকে—স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যে কোন মূল্যে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করবই। এ ছাড়া আমাদের গত '৮৩ সালে ২ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনৈতিক অবস্থান (ষ্টেটাস) নির্ধারণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। কারণ আমরা মনে করি স্বাধীনতার বিরোধী শক্তির রাজনৈতিক অবস্থান এবং স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তির রাজনৈতিক অবস্থান বা মর্যাদা কোন মতেই এক হতে পারে না। আমরা মনে করি এটা শুধু আমাদেরই দাবী নয় এটা বাংলাদেশের সকল মুক্তিকামী জনতার দাবী। আমরা ভবিষ্যতে এ আন্দোলনের ডাক দেবো। সেই আন্দোলনে স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তি এগিয়ে আসবে এবং বাংলার মাটি থেকে গোলাম আযম সহ স্বাধীনতা বিরোধী সকল শক্তি উৎখাত হবেই।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নুর-উজ্জামান গত ১৮-৪-৮৪ তারিখে এ বিষয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন—'আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি যে, গত ১৭ই এপ্রিল সংলাপ চলাকালে জামাতে ইসলামের দাবীর প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পাকিস্তানী নাগকির গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। সম্প্রতি গোলাম আযম কর্তৃক বাংলাদেশ সম্পর্কে অবাঞ্ছিতভাবে বক্তৃতা বিবৃতি দেয়া সত্ত্বেও সরকার এবং রাজনৈতিক মহলের নিশ্চুপ ভূমিকা আমাকে মর্মাহত করেছে। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তখন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে সেই শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। সেই আন্দোলন যখন বিশেষ স্তরে উপনীত হয় তখন প্রেসিডেন্ট জিয়া মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নেতৃবৃন্দকে আলোচনার জন্য ডাকেন। উভয়পক্ষের মধ্যে মোট তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উপদেষ্টা হিসাবে জেনারেল এরশাদ, সংসদের বর্তমানে চেয়ারম্যান জাকির খান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রেসিডেন্ট জিয়া স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির রহস্যময় উত্থান সম্পর্কে জানার জন্য এবং এই শক্তিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে একট কমিটি গঠন করেন। ১৯৮১ সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত শেষ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট জিয়া স্বীকার করেন যে, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ দিয়ে তিনি ভুল করেছেন। এই রাজনৈতিক ভুল রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার জন্য তিনি আমার হাত ধরে আমার কাছে সময় চান এবং আন্দোলন কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখতে অনুরোধ জানান। এবং জামাতে ইসলামীকে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষিদ্ধকরণ ও গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিষ্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। জেনারেল এরশাদ মুক্তিযোদ্ধাদের সেই দাবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এই বৈঠকের মাত্র দশদিন পর তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রস্তুতিকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর পর স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আরো সংগঠিত হয় এবং পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযম বাংলাদেশে আরও পোক্ত হয়ে বসে বক্তৃতা

বিবৃতি দিতে থাকে।

'আমি মনে করি যে, গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব প্রদান জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার একটি প্রধান অংশ এবং জিয়ার স্মৃতির প্রতি চরম অপমানজনক। গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব প্রদানের সরকারী আশ্বাস বাস্তবায়নকে প্রতিহত করার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাচ্ছি।'

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবীর প্রেক্ষিতে রাকসুর সহসভাপতি ছাত্রনেতা ফজলে হোসেন বাদশার বক্তব্য—'এব্যাপারে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মতামত ব্যক্ত করেছে। নতুন করে আমার বক্তব্যের কিছু নেই। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দেয়া হলে নতুন করে বির্তক সৃষ্টি হবে। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানের নাগরিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতিপক্ষ এবং ৩০ লক্ষ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী হত্যার নেতৃত্বদানকারী গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্ন একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের বিচারের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া একজন বিদেশী নাগরিকের দেশের জাতীয় প্রশ্নে মতামত ব্যক্ত করা বাংলাদেশে আবার নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার শামিল। সরকারের কোন দূর্বলতার ফাঁকে ও কোন স্বার্থে একজন স্বাধীনতার শত্রু জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, তা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তার ইঙ্গিতেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক অরাজকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে গোলাম আজমের নাগরিকত্ব প্রদান করা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মীরজাফর ও বিশ্ব মানবের কাছে হিটলারকে শ্রদ্ধা করার শামিল। গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেয়া হলে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাকে হেয়-প্রতিপন্ন করা হবে বলে আমি মনে করি।'

বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'গোলাম আযম কি কখনো বলেছেন তিনি '৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে ভুল করেছেন? যে ব্যক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না তিনি কিভাবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দাবী করেন? আমি মনে করি গোলাম আযমকে নাগরিক অধিকার দেয়া হলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। একই সঙ্গে ৩০ লক্ষ শহীদেরও অবমাননা হবে।'

বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক শামসুর রাহমান বলেছেন, 'আমি অবশ্যই গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব প্রদানের বিপক্ষে। আমি মনে করি তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবমাননা হবে।'

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ আহমদ শরীফ বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত গোলাম আযম এবং তার দল '৭১ সালে তাদের কৃতকর্মের জন্য শর্তহীনভাবে দেশবাসীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত হবে বলে আমি মনে করি না।'

বিশিষ্ট সাংবাদিক নির্মল সেন বলেন, 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে হাজার হাজার মানুষ হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলো। তারা সাধারণ

মানুষ, না বুঝে বা বিপদে পড়ে করেছে। কিন্তু কিছু লোক তো ছিলো যারা গণহত্যার নীল নকশা একেঁছিলো, যারা সচেতন এবং সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তাদের বিচার হওয়া উচিত ছিলো অথচ হয়নি। আওয়ামী লীগ আমলেও বহু কুখ্যাত দালালকে ক্ষমা করা হয়েছে। গোলাম আযমের অপরাধের জন্য বহু আগেই বিচার হওয়া উচিত ছিলো। এটাকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখার মানে হয় না। আর নাগরিকত্ব প্রদানের তো প্রশ্নই ওঠে না।'

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিচালক ডাঃ জাফরউল্লাহ চৌধুরী বলেছেন—'গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বিবেচনার অর্থ হলো '৭১ সালে ফিরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, শত-সহস্র বুদ্ধিজীবী, তরুণ মুক্তিযোদ্ধা এবং ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মাহুতি অস্বীকার করা। এই ৩০ লক্ষ শহীদই এই হত্যার নায়ক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিতে পারে—কোন রাজনীতিবিদ, জেনারেল এরশাদ বা আমরা কেউ দিতে পারি না। মানুষকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত কাউকে উন্মুক্তভাবে চলাফেলা করতে দেয়া যায় না। যার জন্যে গোলাম আযমকে হয় তার দেশে ফেরত পাঠানো যেতে পারে অথবা কঠিন নিরাপত্তাসহ চিরকালের জন্যে পাগলাগারদে আটক রাখতে হবে। এধরনের হত্যাকারী জনপদের জন্য আবারো ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

উপসংহার

'৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত এদেশে যত সফল আন্দোলন হয়েছে, হোক তা গণতন্ত্রের জন্যে কিংবা জাতিগত পীড়নের বিরুদ্ধে—সবসময় সাম্প্রদায়িকতা ছিলো আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের দেশে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতর সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন জয়যুক্ত হতে পারে না। আমাদের দেশেই এটা সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধকে একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত করা। কারণ সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশে শুধু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রু নয়, স্বাধীনতার শত্রুও বটে। এই সাম্প্রদায়িকতার জঘন্য ও নৃশংসতম বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি জামাতে ইসলামী নামক রাজনৈতিক দলটির ভেতর।

জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের সূচনা করেছিলো ১৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১০ দফা দাবী ঘোষণার মাধ্যমে। পরবর্তকালে ১৫টি রাজনৈতিক দল এবং আরো পরে ৭টি রাজনৈতিক দলের জোট সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ৫ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করে। ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের ৫ দফার চেয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১০ দফার ভেতর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপাদান বেশী ছিলো বলে ছাত্রদের আন্দোলন স্বাধীনতার চিহ্নিত ও ধিকৃত শত্রুদের সঙ্গে 'আন্দোলন' বা 'বৃহত্তর ঐক্যের' দোহাই দিয়ে হাত মেলায়নি। যে কারণে ছাত্ররা বার বার জামাতপন্থীদের হামলার শিকার হচ্ছেন।

এর বিপরীতে ২২ দলের ৫ দফার আন্দোলনে গণতান্ত্রিক উপাদানের

অভাব থাকায় জামাত তাদের মিত্র হতে পেরেছে এবং সামরিক সরকারের সঙ্গে সংলাপের পথও এর দ্বারা প্রশস্ত হয়েছে। সুযোগ বুঝে জামাত ২২ দলের কাঁধে বন্দুকটি তুলে তাক করেছে ছাত্র এবং গণতন্ত্রকামী জনতার দিকে। আগেই বলেছি আন্দোলনের ঘোলাপানিতে মাছ ধরার জন্যই তারা ২২ দলের আন্দোলনকে সমর্থন করছে। জামাতীরা গণতন্ত্র বলতে কি বোঝে এটা কি কারো অজানা? জামাত বুঝে নিয়েছে ২২ দলের দিক থেকে এ মুহূর্তে কোন হামলা আসবে না। তাই তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মুলাও দিয়েছে। আর ২২ দলের কয়েক শরীক একান্ত নির্বোধের মতো জামাতী ফর্মুলার টোপটি বেমালুম গিলে বসে আছে। জামাতীদের অনেক সুহৃদই ২২ দলের ভেতর রয়েছে যেমনটি রয়েছে প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

২২ দলের অনেকে বলেছেন যে—এটা একাত্তর সাল নয়। রাজনীতির প্রেক্ষিত পাল্টায়। রাজনীতিতে চিরস্থায়ী শত্রু-মিত্র বলে কিছু নেই। এগুলো সবই যে নির্লজ্জ সুবিধাবাদ এবং ঘোরতরভাবে জনগণের স্বার্থবিরোধী এতে কি সন্দেহের কোন অবকাশ আছে? রক্তলোলুপ হায়না হিংসা ভুলে কি কখনো তৃণভোজী হতে পারে? বাঘে ছাগলে একঘাটে পানি খেতে পারে বটে—তাতে লাভ হয় বাঘেরই, ছাগলের নয়। জামাতের সঙ্গে সহ-অবস্থানের তত্ত্ব তাই কোন অবস্থাতেই অনুমোদনযোগ্য নয়।

২২ দলের ভেতর জামাতের মিত্র কারা? বলা বাহুল্য তারাই যারা জামাতের গুরু ভাই। যাদের আন্তর্জাতিক প্রভু এক। খুঁটি যাদের বাঁধা পেট্রো-ডলারের সাম্রাজ্যে। কিন্তু যারা জামাতের গুরুভাই নয়, তারা কেন জামাতকে এ মুহূর্তে মিত্র ভাবছে? এর জবাবও খুব স্পষ্ট। ২২ দলের ভেতর অনেক মুরুব্বী স্থানীয় দল রয়েছে যারা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে ভয় পায়। ভয় পায় ছাত্রদের সীমিত পরিসরের ১০ দফার আন্দোলনকেও। তারা চায় যেন-তেন প্রকারে ক্ষমতার একটা আপোষ ভাগ-বাটোয়ারা, জামাতকে একটা অংশ দিতেও তারা আপত্তি করবে না যদি নিরাপত্তার সন্ধান পাওয়া যায়।

যারা প্রকৃত অর্থে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী তারা যদি গণতন্ত্রের আন্দোলনের সঙ্গে জামাত তথা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনকে যুক্ত করতে না পারেন তাহলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনও সফল হবে না। আর জামাত তো সব সময়ের মতো সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে নির্মূল করার জন্য। যেভাবে তারা ছুরিতে শান দিয়েছিলো '৭১-এ, সেই ছুরি এখনো তারা শানাচ্ছে। কবির ভাষায় অভিশাপ বা বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় ক্ষোভ কিংবা রাজনীতিবিদদের বিবৃতির ভাষায় নিন্দাজ্ঞাপন এই হায়নাদের প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা, প্রয়োজন এদেশের রাজনীতির এই বিষাক্ত ক্ষতকে চিরতরে নির্মূল করা। এটা শুধু ছাত্রদের দায়িত্ব নয়, একা মুক্তিযোদ্ধাদেরও নয়, এ দায়িত্ব সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে কাঁধে তুলে নিতে হবে।

২৭ এপ্রিল ১৯৮৪

৭

জামাতে ইসলামীর সাম্প্রতিক তৎপরতা (১)

মোবাশ্বের মোনেম/সেলিম ওমরাও খান

সংখ্যায় কম হলেও জামাতে ইসলামীর রয়েছে একটি শক্তিশালী কেডার বাহিনী, একাত্তরের গণহত্যার রক্ত যাদের হাত রঞ্জিত। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের কিছু তরুণ, যাদের আকৃষ্ট করা হয়েছে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে কোটি কোটি টাকা পাচ্ছে এ দলটি, যা দিয়ে তারা এই কেডার বাহিনী লালন করে। বিচিত্রায় প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে মধ্যপ্রাচ্য থেকে অর্থসংগ্রহের একটি গোপন দলিল প্রকাশ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ দলিলটি পরিশিষ্ট হিসেবে গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন রাণিজ্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশ করে কিভাবে জামাতীরা তাদের সংগঠনের জাল বিস্তার করছে তারও আংশিক বিবরণ এতে পাওয়া যাবে।

জামাতে ইসলামীকে নিয়ে এদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে প্রচুর। জামাতে ইসলামীর রাজনীতি, এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরোধীতা, ধর্মের নামে ধোঁকাবাজী প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক লেখালেখি একাধিকবার কেবল মাত্র 'বিচিত্রা'র মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী এই চক্রটির রহস্যময় রাজনীতি মুহূর্তের জন্য ক্ষান্ত হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে নিষিদ্ধ ছিল ধর্মীয় রাজনীতি। কিন্তু '৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অল্পকিছুকাল পরেই রহস্যজনক কারণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নামে এদেশে পুনরুজ্জীবিত হলো সেই ধর্মব্যবসায়ী, স্বাধীনতা বিরোধী কালো শক্তি জামাতে ইসলামী। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা নতুন বোতলে পুরাতন মদ পরিবেশনের প্রক্রিয়া কিনা ! আমরা আমাদের এই প্রতিবেদনে জামাত রাজনীতির অনুদঘাটিত কিছু বিষয়কে তুলে ধরছি।

'জামাত' শ্লোগানের রাজনীতি

রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্লোগান কোন অপরিচিত বিষয় নয়। একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী, আদর্শ প্রভৃতি প্রকাশের চিরায়ত মাধ্যম তার শ্লোগান। তবে

রাজনীতি মানেই শ্লোগান নয়। কোন দল যদি অতিমাত্রায় শ্লোগান নির্ভর হয়ে পড়ে তবে তা ঐ দলের অন্তঃসারশূন্যতাকেই নির্দেশ করে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে জামাতে ইসলামীই একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা তাদের ৪৬ বছরের ইতিহাসে প্রতি দশ বছর অন্তর রাজনৈতিক 'বোল' বা শ্লোগান পাল্টিয়েছে অতি সুকৌশলে। এটা নিঃসন্দেহে যুগপৎ ভাবে তাদের শ্লোগান নির্ভরশীলতা এবং অন্তঃসারশূন্যতার বহিঃপ্রকাশ। তারা এই বোল বা ভোল পাল্টাচ্ছে কখনও বা ধর্মের নামে, কখনও বা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গনে জামাতের—'রাম যে দিকে আমিও সেই দিকে'—গোছের রাজনীতি এবং পরিবর্তিত ও সংশোধিত শ্লোগান এদেশে তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার মরণপণ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মওদুদী ও জামাত

অখণ্ড ভারতে জামাত রাজনীতির সূচনা হয়েছিলো ১৯৪১ সালের গোড়ার দিকে। যার অগ্রনায়ক ছিলেন মওলানা আবুল আলা মওদুদী। বিভিন্ন মহল থেকে মওলানা মওদুদীকে ইসলাম বিকৃত করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। 'তর্জমানুল কোরান' (পূর্ব পাকিস্তান জামাতের একমাত্র মুখপাত্র) পত্রিকায় মওলানা সাহেব নিজেদের মিথ্যাকে বৈধ ও ফরজ হিসাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্যে হাস্যকর এবং অযৌক্তিকভাবে কোরানের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। একসময় মওলানা মওদুদী ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারত মুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মওলানা সাহেবের—'মুসলমান আওর মওজুদা কাশমাকাশ'—পুস্তকের ৭৭ পৃষ্ঠায় তাঁর একটি বক্তব্য উল্লেখ করার মতো। তিনি বলেছিলেন—'একজন মুসলমান হিসেবে ব্রিটিশের কবল থেকে মুসলমানদের মুক্ত করার নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই।' ঠিক একইভাবে মওলানা বিভিন্ন সময়ে জবান এবং নীতি পরিবর্তনের এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এই মওলানা সাহেবের প্রকাশ্য বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে যখন ভারত বিভক্ত হয় তখন তিনি তাঁর পাকিস্তান বিরোধীসহ অসংখ্য বক্তব্যকে অস্বীকার করেছিলেন। একথা অনস্বীকার্য রাজনৈতিক স্বার্থেই মওলানা সাহেবকে মাঝে মাঝে সত্য-মিথ্যার ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়েছে। পাকিস্তানকে তিনি 'নাপাকিস্তান' বা অপবিত্র লোকদের আবাসভূমি বলে ঘোষণা করেছিলেন। এভাবে সত্য-মিথ্যার পারস্পরিক ধারায় মওলানা সাহেব তাঁর 'তর্জমানুল কোরান' পত্রিকায় জামাতে ইসলাম ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়—বক্তব্যের পাশাপাশি তাঁর 'হকিকতে জেহাদ; গ্রন্থের ১২—১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করলেন—'জামাতের হাতে ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমেই পাকিস্তানকে পূর্ণ ধার্মিকতার রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে সন্ত্রাসমূলক এবং ধ্বংসাত্মক পথ গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন।' ১৯৪০ সালে প্রকাশিত মওলানা সাহেবের 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসি কাশমাকাশ'—গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় মওদুদী এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন—'বৃটিশ শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে নিয়ে যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয় তাবে সেই সরকার হয়ে দাঁড়াবে কাফিরানা।' ঠিক এভাবে মওলানা মওদুদীর সদা পরিবর্তি

সংকীর্ণ এবং ধর্মীয় ভাঁওতার আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশে মওদুদীর দোসররা ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এদেশের সহজ সরল ধর্মপরায়ণ মানুষকে প্রতারণার মারপ্যাঁচে ফেলবার চেষ্টা করছে। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত 'সিয়াসি কাশমাকাশ' (তৃতীয় খণ্ড)-এ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে মওদুদী সাহেব লিখেছিলেন 'জব্ ম্যাঁই মুসলিম লীগ কি উস রিজিলিউশন কো দেখতা হে তো মেরী রুহমে-ইখতিয়ার মাতম করনে লাগতি হ্যায়'—(এর বাংলা তর্জমা এই রকম—যখনই মুসলিম লীগের এই প্রস্তাবের প্রতি আমার নজর পড়ে, তখনই আমার আত্মা অধীরভাবে মাতম শুরু করে দেয়)। পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর মওদুদীসহ জামাতীরা এই বক্তব্যকে অস্বীকার করেছিলেন এবং নিজেদের খাঁটি পাকিস্তান প্রেমিক বলে দাবী করেছিলেন। আজ বাংলাদেশের জামাতীদের চরিত্রও সেই আদি জামাতের ভণ্ডামির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

স্বাধীনতাযুদ্ধ ও জামাত

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় জামাতের ভূমিকা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন এদেশে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডে ব্যস্ত তখন জামাতে ইসলাম ছিল তাদের সক্রিয় সহযোগী, পাকিস্তানী বাহিনী সকল অপরাধের সমান অংশীদার। জামাতের চক্রান্তে ১৯৭১-এ প্রাণ হারাতে হয়েছিল এদেশের অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে। প্রাণ হারাতে হয়েছিল এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের।

অথচ ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পর গোলাম আযম বলেছিলেন—'নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন গণতন্ত্রের প্রতি আমার এবং জামাতের দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য গণতন্ত্রই একমাত্র উপায়…সকল অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনের ফলাফলকে মানিয়া নিতেছি।' (দৈনিক ইত্তেফাক, জানুয়ারী—৫, ১৯৭১।) আবার এই গোলাম আযমরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাক-সেনাদের নির্যাতন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই '৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালী বিজয়কে শরিয়ত বিরোধী বলে ঘোষণা করলেন। এর পর পর ১৯৭১ সালের ১৫ জুলাই তৎকালীন পাকিস্তানের জামাতের বিশিষ্ট নেতা এবং বর্তমানে পাকিস্তান জামাতের আমীর মিয়া তোফায়েল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে পরিচিত কুখ্যাত লেঃ জেঃ টিক্কা খানের সঙ্গে গভর্নর হাউসে সাক্ষাৎ করেন। তার সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জামাতে আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। সেদিন গোলাম আযম 'সমাজ বিরোধী' অর্থাৎ মুক্তিকামী জনগণকে দমন করার ব্যাপারে পাকসেনাদের রণকৌশলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ক'দিন আগে গোলাম আজম তল্পিতল্পা নিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন সকল সঙ্গীকে ছেড়ে এবং পাকিস্তান গিয়েই তিনি ইয়াহিয়া খানকে ভারত আক্রমণের আহ্বান জানান এবং 'পূর্ব পাকিস্তান উদ্ধার' পরিকল্পনাকে সংগঠিত করেন। অন্যদিকে মওলানা ইউসুফ, বর্তমানে জামাতের সেক্রেটারী জেনারেল, খুলনায় পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে বাঙালী অসহায় মেয়েদের

সরবরাহ করার ক্ষেত্রে আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন বলে লোকমুখে প্রচারিত এবং এই মওলানা ইউসুফই ১৯৭১ সালে মে মাসে খুলনার খানজাহান আলী রোডে অবস্থিত আনসার ক্যাম্পে ৯৬ জন জামাত কর্মীর সমন্বয়ে প্রথম রাজাকার বাহিনী গঠন করেছিলেন। রাজাকার নামকরণের কৃতিত্বও এই মওলানা সাহেবের একক। ১০ নভেম্বর ইউসুফ সাহেব সাতক্ষীরায় রাজাকারদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং তাদের কাজের উচ্চ প্রশংসা করে তাদেরকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সে সময়ই তিনি বলেছিলেন পাকিস্তান টিকতে এসেছে, অতএব আবার জোড়া লাগবে। তাই '৮৬ সালে এসে জামাতীরা 'এক পাকিস্তান' না 'স্বাধীন বাংলাদেশ' বিশ্বাস করেন তা নিয়ে দেশের মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ সন্দিহান।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি ও জামাত

১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজনে গঠিত হয়েছে ১৫ ও ৭ দলীয় রাজনৈতিক জোট। পাঁচ দফা দাবীর ভিত্তিতে ঐকমত্য স্থাপন করে ১৫ ও ৭ দল ২২ দলীয় ঐক্যজোট গঠন করেছে। এ অবস্থায় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধূয়া তুলে সুযোগ বুঝে মাঠে নেমেছে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর তথা ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার নেপথ্য সহযোগী স্বাধীনতা বিরোধী চক্র জামাতে ইসলামী। মাঠে তারা আগেও ছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জিয়াউর রহমান গদিতে বসে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা মুছে ফেলেন এবং রাজনৈতিক দলবিধি জারী করেন। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে জামাতে ইসলামী রাজনীতি করার প্রকাশ্য ও অবাধ সুযোগ পেল। সুবর্ণ সুযোগ দেখে পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমও বাংলাদেশে এসে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসলেন।

জামাত এবার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিস্থিতি বুঝে খোল এবং ভোল দুই-ই পাল্টেছে। ১৯৭১ সালে তারা যে দেশের অস্তিত্বই স্বীকার করেনি আজ তারাই কিনা সে দেশের গণতন্ত্রের জন্যে লড়াইয়ে হন্যে হয়ে উঠেছে। তারা তাদের হিংস্র নখর লুকিয়ে রেখে সামরিক শাসনে গণতন্ত্র বিপন্ন বলে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাদের মায়া কান্নায় কিছু কাজ হয়েছে বৈকি। ২২ দলের ঐক্যজোটের অনেক নেতা তাদের অতীত কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে এখন তাদের দোসর ভাবতেই শুরু করেছেন। জামাতের আসল চেহারা এবং তাদের মাঠে নামার মূল উদ্দেশ্য অনুধাবনে ২২ দল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। জামাতের প্রতি তাদের এই 'আয়ে থাক' জাতীয় নমনীয়তা এবং ভুল সিদ্ধান্তের সুযোগে জামাত প্রকাশ্যেই অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এদিকে জামাতে ইসলামীর সঙ্গে সংলাপে বসেছিলেন জেনারেল এরশাদ। জামাতের উত্থানের প্রতি রাজনৈতিক মহলের নমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ তিনি সংলাপে বসে জামাতীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন গোলাম আজমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি তিনি নাকি বিবেচনা করবেন। অথচ মাত্র বছর পাঁচেক আগে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তিনি গোলাম আজম ও জামাতের পুনরুত্থানের প্রতিরোধ করার জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের গড়ে তোলা দুর্বার গণআন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন।

৯

জামতে ইসলামীর প্রধান অঙ্গদল ইসলামী ছাত্র শিবিরের স্বরূপ

সেলিম ওমরাও খান/নিমাই সরকার/সৈয়দ শামীম

ইসলামী ছাত্র শিবির হচ্ছে জামাতে ইসলামীর প্রধান ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। '৭১ সালে জামাতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ যেভাবে আল বদর বাহিনী গঠন করে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীর নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলো গত কয়েক বছর ধরে শিবিরও অবতীর্ণ হয়েছে ঘাতকের ভূমিকায়। এই প্রতিবেদনের লেখকরা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছাত্র শিবিরের তৎপরতা ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ তাঁদের আছে। তা সত্ত্বেও তাঁরা জরিপ চালিয়েছেন শিবিরের সাংগঠনিক ক্ষমতা জানার জন্য। উদঘাটন করেছেন শিবিরের সদস্যদের নৈতিক অধঃপতনের এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের ছাত্রদের হত্যা পরিকল্পনার বহু গোপন দলিল। ইসলামী ছাত্র শিবিরের কার্যকলাপ সম্পর্কিত এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক বাহিনীর সহযোগী শক্তি ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন জামাতে ইসলামী এবং তার অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় রয়েছে। একদিকে এই স্বাধীনতা বিরোধী অশুভশক্তি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করছে। অন্যদিকে এরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। এদের সামগ্রীক কর্মতৎপরতার পরিকল্পনার চিত্র থেকে অনুমান করা যায় জামাতে ইসলামী এবং তার অঙ্গ সংগঠনগুলো ব্যাপক ভিত্তিতে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা চালাচ্ছে যা বাংলাদেশের অন্য যেকোন রাজনৈতিক সংগঠনের তৎপরতার চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক। জামাতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাম্প্রতিককালের কিছু দলিলপত্র থেকে দেখা যায় প্রতিমাসেই তাদের সমর্থক, কর্মী এবং সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে জামাতীরা প্রধানতঃ স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টার্গেট করে অগ্রসর হয়। এক পর্যায়ে এই সকল স্কুলকলেজের পবিত্র ইসলাম এবং অন্যান্য দর্শন সম্পর্কে বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে তাদের ভেতর জামাতী রাজনীতির অন্ধ ধারণাগুলোকে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং সংগঠনভুক্ত করে।

এই পর্যায়ে দলে ছাত্রদের ভেতর তৎপরতা পরিচালনার ক্ষেত্রে জামাত রাজনীতির কিছু কৌশলগত দিক, তাদের পরিকল্পনা, রাজনৈতিক পরিচালন

খতিয়ান, কার্য পর্যালোচনাসহ বেশ কিছু অনুদঘাটিত দিক তুলে ধরা হলো। প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ ভাবে জামাতে ইসলামী এবং তার অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের নিজস্ব দলিলপত্রের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ছাত্র সংঘ থেকে ছাত্র শিবির

১৯৭৭ সনের ৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকার সিদ্দিক বাজার কমিউনিটি সেন্টারে একাত্তরের আল-বদর বাহিনীর হাইকমাণ্ডের নেতৃত্বে প্রাক্তন আল-বদরদের নিয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠার সময় কৌশলগত কারণে ইসলামী ছাত্র সংঘ নামের শেষ শব্দটি বাদ এবং পাকিস্তান আমলে শাহীন শিবির নামে জামাতের কিশোর সংগঠনের শিবির শব্দটি এর সাথে জুড়ে দিয়ে নামকরণ হয় ইসলামী ছাত্র শিবির। এ ছাড়া দলীয় পতাকা, মনোগ্রাম ইত্যাদি সমস্তই ছিলো অবিকল ইসলামী ছাত্র সংঘের। এমনকি শিবিরের কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দানের যে পাঠক্রম রয়েছে তাও ছাত্র সংঘের। এ ক্ষেত্রে সংঘের স্থলে শিবির ছাড়া অন্য কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি। ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠালগ্নে এর কেন্দ্র থেকে জেলা নেতৃত্বের প্রত্যেকেই ছিলো আগেকার ছাত্র সংঘের নেতা ও খুনী আলবদর বাহিনীর কমাণ্ডার সদস্য। মোটকথা—ছাত্র সংঘ থেকে ছাত্র শিবির এই হলো এদের রূপান্তরের ধারা।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন '৮৭

১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত ৪৮টি কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জরীপে দেখা যায়, ৮০৪টি আসনের মধ্যে ছাত্রলীগ (সু-র) পেয়েছে ২৮২টি, ছাত্র শিবির ১৭২টি এবং ছাত্র ইউনিয়ন ১২৬টি। একইভাবে ঐ সমস্ত কলেজে ছাত্রলীগ (মু-না) লাভ করেছে ১৪টি এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ১৮টি। বাকীগুলো পেয়েছে অন্যান্য সংগঠন। আসন পেয়েছে এমন কলেজের সংখ্যা ছাত্রলীগ (সু-র) ২৪, ছাত্র ইউনিয়ন ১৫, ছাত্রশিবির ১২, ছাত্রলীগ (মু-না) ১ এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ১।

৮টি সাংগঠনিক জেলার ৪৮টি কলেজের মধ্যে ছাত্র শিবির ১২টিতে প্রাপ্ত আসন সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দল হিসেবে জয়লাভ করে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, যে সমস্ত কলেজে শিবির নির্বাচন করেছে এবং আসন পেয়েছে শুধুমাত্র সেই সমস্ত কলেজকে হিসেবে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া যেখানে অন্যান্য সংগঠন জয়ী হয়েছে কিন্তু শিবির জিতেনি এমন কলেজের ফলাফল বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

দেখা যায় ৬টি কলেজের নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যার ভিত্তিতে শিবির প্রথম হয়েছে। অন্যদিকে ১৮টি কলেজে ছাত্রলীগ (সু-র) এবং ৪টি কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম স্থান অধিকার করেছে। নির্বাচনী ফলাফলে আরো দেখা যায় ২টি কলেজে শিবির, ৭টি কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন, ৫টি কলেজে ছাত্রলীগ (সু-র) এবং ১টি কলেজে ছাত্রদল দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করে। শিবির তৃতীয় স্থানে থাকে ৪টি কলেজে, ছাত্র ইউনিয়ন ৪টি কলেজে, ছাত্রলীগ (সু-র) ১টি কলেজে এবং ছাত্রলীগ

১৯৭৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সম্মুখে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য 'অপরাজেয় বাংলা' যখন অর্ধনির্মিত তখন জামাত সমর্থিত ইসলামী ছাত্র শিবির এটাকে ভাঙ্গার স্বপক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য স্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। সাধারণ ছাত্র এতে ক্ষুব্দ হয়ে ওঠে। কিন্তু ছাত্র শিবির ক্ষান্ত হয়নি। তারা রাতের অন্ধকারে ভাস্কর্যটি ভাঙ্গার প্রচেষ্টা নেয় এবং ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিতও হয়। এরপর জয়দেবপুরে একই সাম্প্রদায়িক শক্তি মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ভাঙ্গতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের '৮৬—'৮৭ সনের ক্যালেন্ডার 'অপারাজেয় বাংলা'র ছবি ছাপানোকে কেন্দ্র করে ইসলামী ছাত্র শিবির বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলো। একই গোষ্ঠী এর আগে কুড়িগ্রামে রাতের অন্ধকারে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলে। তারা ইসলামের নামে বাতিল করে দিতে চায় ক্রীড়াঙ্গনে মানবজাতির সাধারণ ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে মশাল প্রজ্বলনকে অগ্নিপূজার অভিযোগ এনে।

১৯৮৭ সনের ৮ ফেব্রুয়ারী সিলেটের মাদ্রাসায় বার্ষিক খেলা-ধূলা অনুষ্ঠানে ড্রাম বাজানো এবং খেলাধুলায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণকে নিয়ে জামাত শিবির একটি বিতর্কের সৃষ্টি করে। তারা অনুষ্ঠান পরিচালনায় বাধা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় পতাকা পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয় (সংবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারী '৮৮)। তারা কবি সুফিয়া কামালের নারী মুক্তি আন্দোলনকে পদহীনতার প্রশ্ন তুলে তার প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

১৯৮৭ সনের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে ছাত্র শিবির কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কার্যালয়ে দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখে। তারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করে, যশোরে কিং ফয়সল বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা দান করে (সংবাদ, ২৭ মার্চ, '৮৭)। '৮৭ সনের ফেব্রুয়ারীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এ সময় ডি, সি মমতাজউদ্দীন (শিবির প্রশাসন) ধর্মের হুজুগ তুলে একাধিকবার সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে মিনার নির্মাণে বাধা দেয়ার সংকল্প গ্রহণ এবং পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেন (বিচিত্রা, ১৩ সেপ্টেম্বর, '৮৭)। যদিও ভাষা সৈনিক গাজীউল হক কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সহায়তায় স্থানীয় জনগণ ও ছাত্রবৃন্দ ৮ ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মিনার নির্মাণ করেন, তবু শহীদ মিনার নির্মাণে জড়িত থাকার কারণে মূল ভূমিকা পালনকারী

২০ জনকে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অজুহাত দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় (বিচিত্রা, ঐ)। শামীম শিকদার নির্মিত নজরুলের ভাস্কর্য ঐ একই শক্তি রাতের আঁধারে ভেঙ্গে ফেলে।

শুধুমাত্র এ করেই তারা ক্ষান্ত নয়। জামাত শিবির কিংবা এই চক্র কখনো সরাসরি আবার ছদ্মবেশে নানা কায়দায় বাঙালীর শিল্প সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে এবং এখনো তা চালাচ্ছে।

সন্ত্রাস, ট্রেনিং সেন্টার এবং নীল নকশা

একাত্তরের বর্বরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে শিবিরের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী তৎপরতায়। সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে শিবির দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস পরিচালনা করছে বলে বিভিন্ন মহলেব অভিযোগে প্রকাশ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ কিছু অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে তাদের এই 'অপারেশন'। হেদায়েত-বাবুলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত বাহিনী পরপর দুটি হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চাপাইনবাবগঞ্জে। দেশের বেশ ক'টি অঞ্চলে 'মোমেনুল সালেহীনের' সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে এবং তা ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পাবনা, চাপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিবিরের সশস্ত্র বাহিনী ও তাদের পরিচালিত বেশ কয়েকটি ক্যাম্পের কথা প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, এসব ক্যাম্পে শিবির কর্মীদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া হয়। কক্সবাজারের উখিরা ও রামু উপজেলায় এদের যে ট্রেনিং সেন্টার আছে সে সম্পর্কে সম্প্রতি একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে জাতীয় একটি দৈনিকে। (ইত্তেফাক, ১৯ অক্টোবর, '৮৮)

শিবির বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ সমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তোলার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে তাদের কয়েকটি সন্ত্রাসী পরিকল্পনা রয়েছে। এ ধরনের পরিকল্পনার আওতায় রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর কলেজ, বি, এল, কলেজসহ আরো কয়েকটি কলেজ। যতদূর জানা যায় তাদের এই সন্ত্রাসী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে রয়েছে আরো কিছু গোপন শক্তির যোগসূত্রিতা যা কখনো কখনো দু'-একটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জোন ভিত্তিক শিবিরের সদস্য সংখ্যা

সমর্থক, কর্মী, সাথী, সদস্য—এ বিন্যাসের ভিত্তিতে একজন শিবির কর্মীর দলীয় গুরুত্ব নির্ভর করে। এই নিরীখে সদস্য হচ্ছে সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় কর্মী। ১৯৮৭—৮৮ সনে ছাত্র শিবির প্রকাশিত সংগঠনের একটি গোপন দলিল থেকে অঞ্চল ভিত্তিক সদস্যের একটি চিত্র পাওয়া যায়। তালিকায় মোট সদস্য সংখ্যা ৪৮২।

তালিকায় দেখা যায় বিভাগ হিসেবে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সদস্য সংখ্যা প্রায় সমান। দুটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে সদস্যের সংখ্যা দেড়শোর বেশী। তালিকা থেকে হিসেব করে দেখা যায় ঢাকা বিভাগের সদস্য সংখ্যা ১৫১ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের বেলায় তা ১৪৭ জন। রাজশাহী বিভাগে সদস্য সংখ্যা ৮৪ এবং খুলনা বিভাগে এই সংখ্যা ৫৩। তালিকায় আরো দেখা যায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য সংখ্যা ১৩।

বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিতে হিসেব করলে দেখা যায় দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির সদস্যের সংখ্যা ৮১। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ২৫, ২১, ২১, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সদস্য যথাক্রমে ৫, ২, ৭ জন। এ ছাড়া আরো দেখা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জড়িত এমন শিবির সদস্যের সংখ্যা ৬৪। কলেজ পর্যায়ে পড়াশুনা করছেন এবং কলেজের লেখাপড়া শেষ করছেন ৭৯ জন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কিংবা সমমানের পড়া শেষ করেছেন ৩৩৯ জন। যারা শিক্ষা জীবন শেষ করেছেন এবং শিবিরের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এমন সদস্য ৯২ জন।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থানের নাম এবং এর সাথে শিবিরের সদস্য সংখ্যার একটি খতিয়ান তুলে ধরা যেতে পারে। চট্টগ্রাম মহানগরী ৪৯, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ১১, চট্টগ্রাম উত্তর সাংগঠনিক জেলা ১৬, কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাংগঠনিক জেলা ১০, চট্টগ্রাম দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা ৭, ঢাকা মহানগরী ৭২, ঢাকা সাংগঠনিক জেলা ৫, টাঙ্গাইল জেলা ৪, মোমেনশাহী শহর ৭, মোমেনশাহী-কিশোরগঞ্জ সাংগঠনিক জেলা ৪, রাজশাহী মহানগরী ১৫, রংপুর শহর ১৭, রংপুর পূর্ব সাংগঠনিক জেলা ৮, রংপুর পশ্চিম সাংগঠনিক জেলা ৭, নবাবগঞ্জ জেলা ৪, খুলনা-সাতক্ষীরা সাংগঠনিক জেলা ৯, খুলনা মহানগরী ১১, সিলেট শহর ৬, কুমিল্লা শহর ১১।

শিবিরের অর্থের উৎস

১৯৮১ সালে ইসলামী ছাত্র শিবিরের একটি চাঞ্চল্যকর দলিল থেকে তাদের টাকা খরচের একটি ফিরিস্তি পাওয়া যায়। এর মধ্য দিয়ে টাকা যোগানোর বিদেশী উৎসের বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে যায়। ছাত্র শিবিরের দলিলে দেখা যায়, গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রিয়াদের একটি গোপন উৎসের কাছে টাকা চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। পাঁচটি পরিকল্পনার জন্য প্রাক্কলিত খরচে দেখানো হয়েছে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫ শত তেত্রিশ মার্কিন ডলার। হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশী মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় দেড় কোটি টাকার মতো।

প্রকল্পের প্রচার ও প্রকাশনা খাতে টাকার অংক হচ্ছে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। বুকলেট, লিফলেট, ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত বই, গঠনতন্ত্র এবং কার্যক্রমসূচী, স্মরণিকা, ইসলামী সেমিনার, রমজানের ক্যালেণ্ডার, ঈদকার্ড ইত্যাদি এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছাপাখানা নির্মাণের হিসেবও এই খাতের আওতায় ধরা হয়েছে। জামাতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন ফুলকুড়ি ও শিশু

সংগঠনের খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে আছে অফিস ভাড়ার ২ লক্ষ ৫০ হাজার, উৎসবে ৩০ হাজার টাকাসহ অফিস খরচ, ক্রীড়া সামগ্রী, সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম, মাসিক পত্রিকা ফুলকুড়ি ইত্যাদি। পত্র মাধ্যম ইসলামী শিক্ষা— এই খাতের ব্যয় ৬ লক্ষ টাকা। ৩০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে ছাত্র কল্যাণ ও বৃত্তিমূলক খাতে। ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড-স্কলারশীপ বাদেও নিবেদিত শিবির কর্মীর অসুখ-বিসুখ, উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানোর সুবিধাদিও এর মধ্যদিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়। ক্যাসেট, পেরিওডিক্যালস, পুরুষ্কার, টেপ রেকর্ডার, প্রোগাম, প্রোডাকশন ইত্যাদি সাহিত্য খাতে যে হিসেব পাওয়া যায় তাতে এর টাকার মান দাঁড়ায় ১৮ লক্ষ টাকার সমান।*

ইবনে সিনা ক্লিনিক, ইসলামী ব্যাংক, আল-বারাকা ব্যাংক, আল রাবাতা কখনো প্রত্যক্ষ বা কখনো পরোক্ষভাবে সাহায্য দিয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ শিবির প্রকাশিত ভর্তি গাইডে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞাপন প্রতিনিয়ত ছাপা হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। পাশ করার পর শিবির কর্মীদের জামাত শিবির প্রভাবাধীন বিভিন্ন মাদ্রাসা, কিণ্ডার গার্টেন, ব্যাংকসহ নানা প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

শিবির মনোরম ক্যালেণ্ডার, গাইড ইত্যাদিতে খরচ করছে লক্ষ লক্ষ টাকা। ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা খরচ করে এরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি গাইড বের করে। এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কলেজ পর্যন্ত এরা অনুরূপ অংকের টাকা বিনিয়োগ করতে পারে যেখানে অন্য কোনো সংগঠনই এতো টাকা দিয়ে আজ পর্যন্ত একটা গাইড বের করতে পারেনি। সাম্প্রতিক বছর গুলোতে ইসলামী ছাত্র শিবিরের নতুন নতুন অফিস ভাড়া নেওয়া, হোণ্ডা ক্রয়, নামে-বেনামে নানাবিধ প্রকাশনা, লোভনীয় বেতনে সার্বক্ষণিক কর্মী এই বিপুল টাকা ব্যয়ে সংগঠন পরিচালনা করতে দেখে ছাত্র সাধারণের মধ্যে দারুন সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

রিক্রুটমেন্টের কৌশল

ইসলামী ছাত্র শিবির ইসলামী ছাত্রী সংস্থা নামে ছাত্রীদের মধ্যে কাজ করে থাকে। জামাতের কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যরাই এই ফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

স্কুল, মাদ্রাসা, কিণ্ডার গার্টেনকে ভিত্তিমূল ধরে ছাত্র শিবির তার সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। এ কাজটি তারা সুকৌশলে করে যাচ্ছে ফুলকুড়ি আসর নামের একটি সংগঠনের নামে। ইসলামী পুস্তক-পুস্তিকা পড়িয়ে, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এনে, পাঠাগার গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে কোমলমতি শিশুদেরকে তারা সংগঠনে টেনে আনছে। শিবিরের এ সংগঠনটি গড়ে ওঠে ১৯৭৮ সনের ১৭ই ডিসেম্বর। ফুলকুড়ি আসরের ২০টি জেলায় ৩৪টি শাখা। জানা যায়, এর সদস্য সংখ্যা ৫ হাজারেরও অধিক। প্রতিবছরই এই আসরের জন্য একটি বিরাট অংকের টাকা ব্যয় করা হয়। শুধুমাত্র ১৯৭৯—৮০ সনে ফুলকুড়ি আসরের ব্যয় ধরা হয়েছিলো ১৮ লাখ টাকা। উল্লেখ্য যে, ফুলকুড়ি আসরকে গড়ে তোলার পেছনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক ঘোষণায় বলা হয়— 'এদেশে অনেক

* পরিশিষ্ট ক' দ্রষ্টব্য

শিশু সংগঠন আছে যারা ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দেয়। এদের হাত থেকে রক্ষার জন্য শিশুদের বিভিন্ন যুক্তি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তিতেই গড়ে তোলা হয়েছে এ শিশু সংগঠন।' এক দলিলে দেখা যায়, এর পরিচালনায় রয়েছেন একজন পত্রিকার সম্পাদকসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা বেশ কিছু ছাত্র— যাদের উচ্চহারে বেতন দেয়া হয়। একজন পরিচালকসহ তিনজন সহযোগী ও এর পরিচালনায় রয়েছেন। ফুলকুড়ি আসরের প্রচারের দিকেও রয়েছে তাদের নানা কৌশল। 'ফুলকুড়ি' এই নামে একটি মনোরম মাসিক শিশু-কিশোর পত্রিকা বের করা হয় যার প্রচার সংখ্যা ১০ হাজারের মতো। উল্লেখ্য ফুলকুড়ি ছাড়াও 'সবুজ সেনা' নামে শিবিরের আরও একটি শিশু সংগঠন রয়েছে।

জামাতের পাঠচক্র ঃ বিকৃত জ্ঞানচর্চার খতিয়ান

জামাতে ইসলামী কর্মী সংঘের জন্য প্রধানতঃ স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের টার্গেট করে থাকে। এর প্রথম পর্যায়ে জামাতীরা 'দাওয়াতী সপ্তাহ'র আয়োজন করে। এই 'দাওয়াতী সপ্তাহ' পালনের মাধ্যমে তারা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধি করে এবং সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এক পর্যায়ে পাঠচক্রে আসার আমন্ত্রণ জানায়। এই সকল পাঠ চক্রে যারা আলোচনা করে থাকেন তারা সাধারণত জামাতের উচ্চ পর্যায়ের নেতা কিংবা জামাতের কার্যকরী পরিষদ অর্থাৎ 'মজলিসে শুরা'-র সদস্য। আবার কখনো কখনো গোলাম আযম কিংবা আব্বাস আলী খানও জেলা ভিত্তিক পাঠচক্রে বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকেন। জামাতী নেতারা এই সকল পাঠচক্রে প্রধানতঃ দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জামাতী করণ করে থাকে। যদিও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদেকে 'ইসলামী সান্ধ্য বৈঠক'-নামে একটি পাঠচক্রের কথা বলে তাদের জড়ো করা হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে জামাতীরা এই সকল সহজ সরল ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় অনুভূতির সুযোগ গ্রহণ করে এবং তাদেরকে জামাতীরা তাদের ঘৃণ্য রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এই রকম একটি পাঠচক্রে আলোচনার নেতৃত্ব দিয়েছেন একজন উচ্চ পর্যায়ের জামাতী নেতা জনৈক মওলানা সেরাজুল ইসলাম। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪-তে আয়োজিত পাঠচক্রে সে মওলানা উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সেক্যুলারিজম সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'সেক্যুলারিজম মানে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়; এর অর্থ হচ্ছে ধর্মহীন রাষ্ট্র'।

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় সেক্যুলারিজম রাষ্ট্র বলতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বুঝানো হয়ে থাকে যে রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক একত্রে বসবাস করে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজস্ব উদ্যোগে কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে না। এই ভাবে জামাতের তথাকথিত তাত্ত্বিকরা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিরায়ত সংজ্ঞাকে পরিবর্তন করে নিজেদের বিকৃত ধারণাগুলোকেই এই সকল পাঠচক্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক অপকৌশলের পথ গ্রহণ করছে।

'পুঁজিবাদ যোগ সমাজতন্ত্র সমান ইসলাম'

এই সকল পাঠচক্রে যে সমস্ত বিষয়ের ওপর জামাত নেতারা আলোচনা করে থাকেন উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী কিংবা জামাত-শিবিরের সমর্থক পর্যায়ের লোকেরা সেই সকল বক্তব্যকে ডায়েরীতে লিখে রাখেন, পরবর্তীতে এই সকল বিষয়ের ওপর কর্মীদেরকে মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। পরে এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে জামাত-শিবিরের প্রাথমিক সমর্থকরা পর্যায়ক্রমে কর্মী, সাথী, এবং সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই ধরনের একটি পাঠচক্রে ছাত্র হিসেবে অংশ নিয়েছেন শিবিরের একজন কর্মী ময়মনসিংহের জনৈক মুজিবর রহমান চৌধুরী। মুজিবর রহমান চৌধুরী এই পাঠচক্র থেকে জামাত নেতা মওলানা সেরাজুল ইসলামের আলোচনাকে তার ব্যক্তিগত ডায়েরীতে লিখে রেখেছেন। মওলানা সাহেব পাঠচক্রে বস্তুবাদ, দ্বন্দ্ব, পুঁজিবাদ, বস্তুবাদী সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি ছেলে-মেয়েদের বুঝিয়েছেন 'থিসিস যোগ এন্টিথিসিস সমান সিনাথিসিস'। সুতরাং এর আলোকে তিনি সিদ্ধান্ত টেনে ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন— ''পুঁজিবাদ যোগ সমাজতন্ত্র সমান ইসলাম''। এর পর সেরাজুল ইসলাম সাহেব বস্তুবাদী সভ্যতার পতনের কারণের ওপর বিস্তর আলোচনা করেছেন। বস্তুবাদী সভ্যতার পতনের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি সতর্কভাবে বলেছেন— ''অভ্যন্তরীণ সংহতি এবং ঐতিহাসিক চাপের ফলেই বস্তুবাদী সভ্যতার পতন হবে।'' এই আলোচনার শেষে মওলানা সাহেব সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণের কথাও উল্লেখ করেছেন। সেরাজুল ইসলাম সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার দুটি কারণ তার কর্মীদের বুঝিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— ''চোরাগোপ্তায় ক্ষমতা দখল এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লুপ্তই সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার প্রধান কারণ।'' আলোচনায় তিনি আরো বলেছেন— ''সমাজতন্ত্র একটি ধর্মহীন প্রথা যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মপালনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।'' কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমাজতন্ত্র একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মপালনের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর রাষ্ট্র কখনই কোন নিয়মনীতি চাপিয়ে দেয় না। বরঞ্চ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই কিংবা কোন ব্যক্তি বাণিজ্যিক স্টাইলে কোন ধর্মকে ব্যবহার করতে পারেনা।

'পর্দা লংঘনে জিহবর স্বাদ নষ্ট হয়'

বর্তমান মানব সভ্যতায় নারীর ভূমিকা যেখানে স্বীকৃত সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত সেখানে জামাতীরা নারীর এই ভূমিকাকে অস্বীকার করছে এবং পর্দাপ্রথা সম্পর্কে এক ধরনের উদ্ভট জামাতী ব্যাখ্যা প্রদান করছে। ১৯৮৫ সালের ১ ডিসেম্বর— এ জামাতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র শিবির তাদের সাধারণ কর্মীদের জন্য একটি পাঠচক্রের আয়োজন করে। এই পাঠচক্রে একজন জামাতী নেতা জনৈক ময়েজউদ্দিন পর্দাপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি পর্দা প্রথা

সম্পর্কিত বক্তব্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তীতে তিনি পর্দা সম্পর্কে উদ্ভট জামাতী ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ময়েজউদ্দিন পদহীনতার প্রধান তিনটি ফলাফলের উল্লেখ করেছেন। এই ফলাফল তিনটি হলো তার ভাষায়— ''ক) বেশ্যাবৃত্তি প্রচলন হয়। খ) যৌনরোগ বৃদ্ধি পায় এবং গ) বংশের মূলোৎপাট হয়।'' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বেশ্যাবৃত্তির কারণ পদহীনতা নয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে আর্থিক অনটন। যুগে যুগে পুরুষশাসিত সমাজে অসহায় মেয়েরা নিদারুন আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে শুধুমাত্র জীবনযাপনের জন্য সবশেষে এই বেশ্যাবৃত্তির পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়েছে। এরপর ময়েজউদ্দিন সাহেব পাঠচক্রে পদহীনতার আরো চারটি উপফলাফলের উল্লেখ করেছেন। সেইগুলো হলো তার ভাষায়— ''ক) মনের চোর বৃদ্ধি পায়, খ) দৃষ্টি নম্র হয়, গ) জিহ্বার স্বাদ নষ্ট হয় এবং ঘ) সুগন্ধির ব্যবহার বেড়ে যায়।'' এখানে আরো উল্লেখ করা যায় ময়েজউদ্দিন সাহেব পদহীনতার যে সকল ফলগুলোর কথা বলেছেন এই ফলাফল গুলোর সঙ্গে পদহীনতার কার্যকারণের কোন সম্পর্ক নেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এইভাবেই জামাতীরা তথাকথিত পাঠচক্রের মাধ্যমে বিকৃত জ্ঞান চর্চা করে থাকে এবং ইসলামসহ অন্যান্য দর্শনের অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করে অসংখ্য ছেলে-মেয়েদেরকে জামাত রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে তাদের বিপথগামী করছে।

ক্রীজ বাহিনী

জামাতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র শিবির তাদের বিরুদ্ধমতের অন্য যে কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আগে এলাকা ভিত্তিক জামাত-শিবির নেতারা একত্রে বসে আক্রমণ পরিচালনার পূর্বপরিকল্পনা প্রস্তুত করে। পরবর্তীতে আক্রমণ পরিচালনার জন্যে 'ক্রীজ বাহিনী'কে জানানো হয়। 'ক্রীজ বাহিনী' জামাত-শিবিরের একটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দাঙ্গাকারী গ্রুপ। যাদেরকে শুধুমাত্র দাঙ্গা পরিচালনার জন্য তলব করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরের একটি গোপনীয় দলিল থেকে দেখা যায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিবিরের এই 'ক্রীজ বাহিনী' রয়েছে। গ্রুপের সদস্যরা প্রধানতঃ ক্যারাটে, ছুরি নিক্ষেপ, লাঠিচালনাসহ অস্ত্র চালাতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। বিশেষ করে বড় ধরনের অপারেশন পরিচালনার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন হল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উক্ত 'অপারেশন স্পট'-এ আনা হয়। ১৯৮৪ সালের ২১ এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, রহমান হলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা ইসলামী ছাত্র শিবির কর্তৃক আক্রান্ত হন। শিবিরের এই গোপন দলিল থেকে দেখা যায় ২১ এপ্রিলের ঘটনার পূর্ব প্রস্তুতি শিবিরের 'ক্রীজ বাহিনী' এপ্রিলের প্রথম দিকেই গ্রহণ করেছিলো। কতজন 'ক্রীজ বাহিনী'র সদস্য কিভাবে কখন এই আক্রমণ কার্য পরিচালনা করবে এই দলিলে তার উল্লেখ রয়েছে।

শিবিরের এই সংঘবদ্ধ দাঙ্গাকারী দলের সদস্যরা সাধারণত সংগঠনের প্রকাশ্য মিটিং কিংবা মিছিলে অংশগ্রহণ করে না। শুধু মাত্র ''অপারেশন''

পরিচালনার সময়ই এদেরকে তৎপর দেখা যায়।

অপারেশন পর্যালোচনা

'ক্রীজ বাহিনী'র কমাণ্ডো অভিযানের পর জামাত-শিবিরের নেতারা একত্রে অপারেশনের পর্যালোচনা করে থাকেন। এবং এই পর্যালোচনা থেকে তারা তাদের ক্রীজ বাহিনীর আক্রমণের সফলতা, ধরন এবং আক্রমণের দুর্বলতার দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং গোপন দলিলে এই আলোচনার সিদ্ধান্তগুলো লিখে রাখেন। শিবিরের এই গোপন বৈঠক সাধারণত ভোররাতের দিকে অনুষ্ঠিত হয় যাতে করে বৈঠকের গোপনীয়তা পুরোমাত্রায় রক্ষা করা যায়। শিবিরের একটি গোপন দলিলে ১৯৮৪ সালের ২১ এপ্রিল-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, রহমান হলে 'ক্রীজ বাহিনী'র আক্রমণ পরিচালনার একটি পর্যালোচনা উল্লেখ রয়েছে। ১৯৮৪ সালের ৩ মে-তে লিখিত শিবিরের এই গোপন দলিলে ২১ এপ্রিলের ঘটনা ক্রীজ বাহিনীর আক্রমণের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে—''ঘটনা চলাকালে এফ, রমহান হলে তথ্য সংগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত ছিল। ৪র্থ তলায় পশ্চিম সিঁড়ি থেকে সিরাজ ভাইসহ সরে আসার চেষ্টা করাটা মারাত্মক ভুল ছিল। পূর্বদিকের সিঁড়ি থেকে যে সকল ভাইদেরকে লোক আনয়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিলো তাদের দেরীতে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। আলমকে উপরে উঠতে দেওয়া ঠিক হয়নি।...মোছাদ্দেক ভাইকে অপরিচিত হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো...।''

এই ভাবে জামাত-শিবিরের ক্রীজ বাহিনী দাঙ্গা পরিচালনা করে এবং আক্রমণ শেষে ঘটনা পর্যালোচনা করে থাকে। বিশেষতঃ জামাতীদের এই ধরনের আক্রমণ প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এবং সবশেষে পর্যালোচনার পদ্ধতি বাংলাদেশে আর কোন রাজনৈতিক সংগঠনের নেই। বরঞ্চ জামাত-শিবিরই একমাত্র সংগঠন যারা তাদের বিরুদ্ধ মতের রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে সশস্ত্র আক্রমণ করার ব্যাপারে সাংগঠনিক নির্দেশ প্রদান করে থাকে।

জিম্মি ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের যে কোন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই জামাতে ইসলামী এবং তার শাখা ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মতৎপরতা সবচেয়ে বেশী। এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং উপশহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই জামাত-শিবির সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সমর্থক, কর্মী এবং সদস্য সংগ্রহ করে। বিশেষ করে শিবিরের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত 'ক্রীজ বাহিনী'র সশস্ত্র তৎপরতা এখানে ব্যাপক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ক্রীজ বাহিনী'র এইসব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যরা সাধারণ ছেলে-মেয়েদেরকে জোরপূর্বক সংগঠনভুক্ত করে থাকে। এই বাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতার কাছে অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন সহ কখনো কখনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেও নীরব ভূমিকায় থাকতে হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির তার সমর্থক সংগ্রহ এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। এই পরিকল্পনায় সমর্থক সংগ্রহের জন্য

প্রধানত তারা স্কুলের ছাত্র, মসজিদে আগত নতুন ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টার্গেট করে কর্মী সংগ্রহের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন করে। এছাড়াও এই পরিকল্পনায় একবছরে কতজন অন্য সংগঠনের নেতা-কর্মীকে শিবিরভুক্ত করা হবে, কতজন মুসলমান নয় এমন ব্যক্তিকে সমর্থক বানানোর জন্য টার্গেট করা হবে, কতটি চা চক্র, আলোচনা চক্র ও বক্তৃতা চক্র গ্রুপ ভিত্তিক অনুষ্ঠিত হবে, বাৎসরিক কতটি বনভোজন এবং শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হবে ইত্যাদি সার্বিক কর্মকাণ্ডের নমুনা এই বাৎসরিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের ১৯৮৪-৮৫ সালের একটি বাৎসরিক পরিকল্পনা থেকে দেখা যায় শিবির এই '৮৪-'৮৫ সালে ব্যাপক কর্মতৎপরতা চালিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলমান নয় এমন ৫৫ জনকে এবং চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সমর্থক হিসেবে সংগ্রহ করেছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০টি উপশাখা রয়েছে যেখানে এই সালে ৪৮০টি সাংগঠনিক সভা, ১০টি চা চক্র, ২টি সুধী সমাবেশ এবং ১০০টি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত ছাড়াও মসজিদ ভিত্তিক সমর্থক সংগ্রহের বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছে ১৫টি। ১৯৮৫-৮৬ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দেখা যায় এই সালে শিবির মুসলমান নয় এমন ৫৭ জন এবং শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫৭৫ সাধারণ ছেলে-মেয়েকে সমর্থক এবং কর্মী হিসেবে সংগ্রহ করেছে। এছাড়া শিবির ৩০ জনকে ''সুধী জামাত সমর্থক'' হিসেবেও সংগ্রহ করেছে।

শিবিরের এই বার্ষিক পরিকল্পনার চিত্র থেকে সহজেই অনুমান করা যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং উপশহরগুলোতে স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠন জামাত শিবিরের তৎপরতা কত ভয়াবহ এবং ব্যাপক। বিশেষ করে এই এলাকায় তাদের সাংগঠনিক কর্মকৌশল এবং এর পাশাপাশি সশস্ত্র তৎপরতার ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখন অশুভ শক্তি জামাত-শিবিরের হাতে বন্দী।

জিহাদী জোশ এবং সেল গঠন

জামাতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন বর্তমানে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের স্বাধীনতাপূর্ব নাম ইসলামী ছাত্র সংঘ। ১৯৭১ সালে এই সংঘের নেতা কর্মীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে এবং পাক সেনাদের সহযোগী শক্তি আল-বদর সেজে এরা অসংখ্য নিরপরাধ বাঙালীকে হত্যাসহ নারী নির্যাতন করেছে। পরবর্তীতে এই সংগঠনটি তার ঘৃণ্য ইতিহাসকে আড়াল করার জন্য স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নাম ধারণ করেছে ইসলামী ছাত্র শিবির। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে সকল আল-বদর পাকসেনাদের সঙ্গে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে বর্তমান ইসলামী ছাত্র শিবির সেই সকল রাজাকার আল-বদরদের ''স্মরণীয় স্মৃতি'কে ধরে রাখার জন্য ওদের নাম অনুসারে অসংখ্য ''সেল'' গঠন করেছে। এই সকল সেলের মাধ্যমে জামাত শিবির তার সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনাসহ বিভিন্ন ধরনের গোপন তৎপরতা চালিয়ে থাকে কখনো কখনো। সম্প্রতিক কালে বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে

উপসংহার

শিবির হাত পায়ের রগ কেটে দেয়, বাঁশীর হুইসেলে আক্রমণ করে, হাতের পাঞ্জা কাটে, চক্ষু উপড়ায়। একজন শিবির কর্মী মনে করে এভাবে 'কাফের জবাই' করে বেহেশতে যাবার পথ সুগম হয়ে উঠবে। শিবিরের আপ্ত বাক্য—'বাচঁলে গাজী, মরলে শহীদ।' ওরা হতাহত করে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন কর্মী থেকে শুরু করে শ্রমিক নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক পর্যন্ত।

জামাতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র শিবির মৌলবাদী এই দু'টো সংগঠনই একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদের কর্মতৎপরতা, প্রশিক্ষণ এবং পাঠচক্রের নমুনা দেখে বোঝা যায় আসলে এদের দর্শনগত কোন ভিত্তি নেই। মুখে পবিত্র ইসলামের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে এরা ইসলামিক আদর্শ থেকে পুরোপুরি খারিজ হয়ে গিয়েছে। বরঞ্চ বিকৃত জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে এরা এদেশের ভবিষ্যত বংশধরদের বিপথগামী করছে এবং এর পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও মানুষকে ভেতর খারাপ ধারণা জন্ম দিচ্ছে। সুতরাং অনেক দিন পেরিয়ে গেলেও এখনই সময়ই এই অশুভ শক্তিকে নির্মূল করার। তা'নাহলে জামাতীদের এই বিকৃত দর্শন চর্চায় এদেশের যুব সমাজ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা হবে বিপন্ন।

জুন '৮৮—জানুয়ারী ১৯৮৯

১০

জামাতে ইসলামীর ধর্মব্যবসা
আলেমদের অভিমত

মওলানা আব্দুল আউয়াল/আসিফ নজরুল

জামাতে ইসলামী রাজনীতি করে ধর্মের দোহাই দিয়ে। তারা দাবি করে শুধুমাত্র জামাতের কর্মী ও অনুসারীরাই খাঁটি মুসলমান। এই দাবিকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে তারা ৭১ সালে শত সহস্র, লক্ষ মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত করেছে নিজেদের হাত। অথচ জামাতের জন্মলগ্ন থেকে উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেম ও ধর্মীয় নেতারা জামাতের ধর্ম ব্যবসার স্বরূপ উন্মোচন করে সরলপ্রাণ ধার্মিক ব্যক্তিদের আহবান জানিয়েছেন এই দলটির সংস্রব পরিত্যাগের জন্য। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জামাত কিভাবে ইসলাম সম্পর্কে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছে সে বিষয়ে আলেম ও পীরদের রচনা উদ্বৃত করেছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল। বিচিত্রায় প্রকাশিত তাঁর এই প্রতিবেদনের সূত্র ধরে তরুণ সাংবাদিক আসিফ নজরুল বর্তমান আলেমদের অভিমত সংগ্রহ করেছেন, যাঁদের সকলেই ধর্ম নিয়ে জামাত নেতাদের নাফরমানির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁরা জামাতে ইসলামীর মতবাদকে 'ইসলাম বিরোধী মতবাদ' বলেছেন এবং আরো বলেছেন মওদুদী 'এমন একটি ভ্রান্ত মতবাদ পেশ করেছেন যা ইসলামের মূল ভিত্তিতে কুঠারাঘাত করেছে।'

জামাত দাবী করছে তাদের সব কর্মকাণ্ডই নাকি ইসলাম রক্ষার জন্য। ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠাই তাদের চরম ও পরম লক্ষ্য। তারা সব কিছুই ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকে। কিন্তু আমরা মনে করি, জামাত ইসলামের মুখোশধারী একটি ফ্যাসিস্ট চক্র। চল্লিশের দশকের শুরুতে মওদুদী সাহেবের উদ্ভট ধ্যান-ধারণার ফলশ্রুতি হচ্ছে জামাতের অভ্যুদয়। একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে মওদুদী সাহেব তাঁর দলের নামে পবিত্র ইসলাম শব্দটি সংযোজন করেছেন। উপমহাদেশের ধর্মপরায়ণ মুসলমানদের জামাতের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এই কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছে। তাছাড়া যারা জামাতের বিরোধিতা করবে তাদেরকে সহজে 'ইসলাম বিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। সর্বোপরি তাতে পবিত্র ইসলামকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা সহজ হবে। বস্তুতঃ বিগত পঞ্চাশ বছরব্যাপী জনাব মওদুদী ও তার অনুসারীরা তাই করেছেন। বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে পবিত্র ইসলাম রক্ষার নামে বৃটিশের প্রচ্ছন্ন দালালী করা হয়েছে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে ইসলাম বিরোধী আন্দোলন বলে অপপ্রচার

করা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে পাকিস্তান আমলে পবিত্র ইসলামকে সামন্ত শ্রেণী ও পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পবিত্র ধর্মের নামে জামাতের এই উন্মাদনা আরো উলঙ্গ রূপ ধারণ করে। জামাত পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা করে। রাজাকার-আল-বদর বাহিনী গঠন করে বাঙ্গালী নিধনে নামিয়ে দেয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে, বিশেষ করে গত ক'বছর থেকে জামাতের সহিংসতা আরো নগ্নরূপ ধারণ করেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে যেকোন সচেতন লোকের মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, জামাতের এ সব কর্মকাণ্ড এবং জামাতের স্থপতি ও তাত্ত্বিক গুরু জনাব মওদুদীর তথাকথিত ইসলামিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে উপ-মহাদেশের আলেম সমাজ কিরূপ দৃষ্টিতে দেখেন। তারা কি সমর্থন করেন? আমরা যতটুকু জানি, দলমত নির্বিশেষে উপমহাদেশের কোন খাঁটি আলেমই জামাতের এসব কর্মকাণ্ড সমর্থন করেন না। শুধু সমর্থন করেন না বললে ঠিক হবে না, তাঁরা এসবের চরম বিরোধিতা করে থাকেন। বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকী ও বই পুস্তকের মাধ্যমে তাঁরা জামাত ও মওদুদী সম্পর্কে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। এখানে জামাত ও মওদুদী সম্পর্কে উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় ও সর্বজনবরেণ্য কয়েকজন আলেমের অভিমত সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

মওদুদী ও মওদুদী জামাত সম্পর্কে দারুল-উলুম দেওবন্দ থেকে বিভিন্ন সময়ে একাধিক ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। সেখানকার শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ ব্যক্তিগতভাবেও তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। একটি ফতোয়ার শিরোনাম হচ্ছে 'সাহারানপুর থেকে মওদুদী ফেতনা নির্মূল করে দাও। মওদুদী আন্দোলন ধ্বংসসাধনকারী ও জীবন সংহারক বিষ। মওদুদীর অনুসারীরা পথভ্রষ্ট। তাদের পিছনে নামাজ পড়বে না।[১]

দেওবন্দের ওলামা কেরামের অপর একটি ফতোয়ায় বলা হয়েছে 'মওদুদী জামাত ও তাদের বই পুস্তক সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইমামদের অনুসরণ থেকে মানুষকে সম্পর্কহীন করে ফেলে। এটা জনসাধারণের জন্য ধ্বংস ও পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মের সাথে সঠিক সম্পৃক্ততা রাখার জন্য সাহাবা কেরাম ও ইমাম-মুজতাহিদদের সাথে যে সম্পর্ক থাকা দরকার জামাতের বই পুস্তক তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আর এটা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর ব্যাপার। এ জন্য মওদুদীর বই পুস্তক ও সেসবের উপর ভিত্তি করে গঠিত আন্দোলনকে (জামাতকে) আমরা ভ্রান্ত এবং মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে করি। এ জন্য আমরা এসবের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি।'[২]

অপর একটি ফতোয়ায় মওদুদীর বই পুস্তক ও তাঁর সংগঠন জামাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মওদুদী জামাত ও এই দলের বই পুস্তকের দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ইমামদের অনুসরণের প্রতি অনীহা ও সম্পর্কহীনতার সৃষ্টি হয়। আর এটা সাধারণ মানুষের ধ্বংস ও পথ ভ্রষ্টতা ডেকে আনে।' স্বাক্ষর মওলানা মুফতি কেফায়েত উল্লাহ্, মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, মোহাম্মদ তৈয়ব, মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ, মওলানা আবদুল লতিফ, মুহতামিম, মাজাহেরুল উলুম

১। মাকতুবাতে শেখুল ইসলাম, প্রথম খণ্ড, ৪৫৬ পৃঃ।
২। দু'মাসআলে, ১৬ পৃঃ, দারুল উলুম দেওবন্দ।

সাহারানপুর, প্রমুখ।'[৩] এই ফতোয়াটিতে ভারতের সমকালীন অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় আলেম স্বাক্ষর করেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতি হযরত মওলানা সৈয়দ মাহদী হাসান প্রদত্ত অপর একটি ফতোয়ায় মওদুদী জামাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এই আন্দোলনে মুসলমানদের শরীক হওয়া কখনো উচিত হবে না। এটা তাদের জন্য জীবন সংহারক বিষ। মানুষকে এই আন্দোলনে শরীক হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। নতুবা তারা গোমরাহ হয়ে যাবে। এটা তাদের জন্য কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতিকর। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ মোটেও জায়েজ নয়। যে ব্যক্তি এই জামাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচার প্রসার করে সে কল্যাণের পরিবর্তে পাপ কাজ করে। সে এ ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে না এবং মানুষকে পাপের দিকে আহবান জানিয়ে থাকে। যদি কোন মসজিদের ইমাম মওদুদী সাহেবের সমমনা হয়, তাহলে তার পিছনে নামাজ পড়া মকরূহ।'[৪]

বেরেলীর 'আল-ফোরকান' পত্রিকার সম্পাদক এবং জামাতের প্রাক্তন আমীর মওলানা মনজুর নোমানী হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবীকে (রঃ) একখানা পত্র লিখেন। তাতে তিনি মওদুদী জামাত সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য থানবী সাহেবের খেদমতে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। থানবী সাহেব উক্ত পত্রের জবাব দান প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমার অন্তর এই আন্দোলনকে গ্রহণ করে না। আপনি এখানে আসলেও এই দল সম্পর্কে আমি আপনাকে এই জবাবই দেব। সুতরাং শুধু একথা শোনার জন্য সফরের কষ্ট স্বীকার করা অনাবশ্যক।'[৫]

আহলে হাদীস জামাতের নেতা ও বিশিষ্ট আলেম হযরত মওলানা আবদুল মজিদ বলেছেন, ''আমি যতদূর পর্যন্ত মওলানা মওদুদীর বই পুস্তক পড়েছি এবং তার ধ্যান-ধারণার অনুসন্ধান করেছি. তাতে তাকে পথভ্রষ্ট পেয়েছি। আমি দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা তাকে তার ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ ও তওবা করার সামর্থ্য দান করুন।'[৬]

তবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মওলানা ইলিয়াস সাহেবের উত্তরসূরী তাঁর পুত্র হযরত মওলানা মোঃ ইউসুফ সাহেব মওদুদী জামাতের কয়েকজন সদস্যের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''মওদুদী জামাত একটি রাজনৈতিক ও ক্ষমতালোভী দল। তারা এমন জিনিসের প্রত্যাশী যা শরিয়তের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য।'[৭] বেরেলবী চিন্তাধারার বিশিষ্ট আলেম হযরত মওলানা মোস্তফা খান সাহেব বেরেলবী ও মওলানা সাইয়েদ আফজাল হোসাইন, মুফতি, দারুল উলুম মানজারুল ইসলাম বেরেলবী মওদুদী জামাত ও তার ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে একটি ফতোয়া প্রদান করেন। তাতে তাঁরা বলেন— ''কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি মওদুদীর ভাষণের প্রথম খণ্ডটি আমাদের নিকট নিয়ে আসে। আমরা তা গভীরভাবে

৩। দৈনিক আল-জমিয়ত, ৩০শে আগষ্ট ১৯৫১।
৪। জামাতে ইসলামী কা রুখে কেরদার, ১৬৮ পৃঃ।
৫। খাতেমাতুস সাওয়ানেহ, ২৪ পৃঃ।
৬। মওদুদিয়াতকা পোষ্ট মরটাম, ৪১-৪২ পৃঃ।
৭। জামাতে ইসলামী কা রুখে কেরদার, ১৭৪ পৃঃ।

দেখি। তাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, তিনি ইসলামের প্রচার প্রসার ও উন্নতি বিধানের দাবী করে থাকেন। কিন্তু মূলতঃ তার আন্দোলন ইসলামে ছিদ্র-অন্বেষণ, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও কুফরী ও কাফেরী ছাড়া কিছু নয়। তিনি ইসলামের ভিন্ন অর্থ করে থাকেন। সাধারণ মুসলমাদের তিনি মুসলমান মনে করেন না। তিনি জন্মগত মুসলিম সন্তান-সন্ততিকে বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মুসলমান স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ইসলাম প্রকৃতিগত ধর্ম নয়। অজ্ঞ মুসলমানেরা তাঁর মতে মুসলমান নয়। শুধু তাই নয়, তিনি বলেন, অজ্ঞদের মুসলমান হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।.....মোট কথা, মওদুদী সাহেবের আন্দোলন মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত বিপদজনক। তাঁর এই আন্দোলন কোন নতুন আন্দোলন নয়। পুরনো খারেজী ধ্যান-ধারণাই নতুন রূপ ধারণ করেছে।'৮

বেরেলবী চিন্তাধারার অপর একজন বিশিষ্ট আলেম মওলানা সাইয়েদ মোঃ রেজওয়ান মওদুদী সম্পর্কে বলেছেন, ''মওলবী মওদুদী সাহেবের বিভিন্ন উদ্ধৃতি পাঠ করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তাঁর মস্তিষ্ক সর্বজনমান্য মনীষীবৃন্দ ও আম্বিয়া কেরামের প্রতি বেআদবী ও ধৃষ্টতায় পরিপূর্ণ। বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আমার অনুরোধ তার বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা থেকে সতর্ক থাকুন। তাঁকে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও গোলাম আহমদ পারভেজদের মত ইসলামের চরম শত্রু গণ্য করুন। কেউ তাঁর প্রতারণার শিকার হবেন না। নবী করিম (সঃ) বলেছেন, 'আসল দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের আগে তার পথ পরিষ্কার করার জন্য আরো তিরিশ জন দাজ্জাল আসবে।' আমার মতে মওদুদী তাদের একজন।''৯

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মওলানা সাইয়েদ আহমদ কাজেমী মওদুদী সাহেবের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন। এই আলোচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। জনাব কাজেমী মওদুদী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অভিমত দান প্রসঙ্গে বলেছেন, ''মওদুদী সাহেব নিজেকে একজন পূর্ণাঙ্গ মুজাদ্দিদ ও মহেদী মনে করেন। কিন্তু কৌশলগত কারণে তা প্রকাশ করছেন না। সময়মত তা প্রকাশ পাবে। তাতে করে মুসলমানদের সামনে আর একটা ফেতনার দ্বার খোলা হবে। সুতরাং এই আন্দোলনে যোগদান বা সাহায্য করা নিজের ধর্ম বিশ্বাসকে বিপদে ঠেলে দেয়ার নামান্তর।''১০

অল-ইণ্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্সের সভাপতি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মওলানা আবদুল ওহাব বলেছেন, ''আমি আহলে হাদীস ভাইদের অনুরোধ করছি তারা যেন নিজেদেরকে এই সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। নতুবা এই ব্যাধি শুধু তাদেরকে নয় পুরো আহলে হাদীস জামাতকে ধ্বংস করে দিবে। শুধু জোরে 'আমিন' বলা 'রাফে ইয়াদাইন' করাই আহলে হাদীসের কাজ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের আকায়েদ বা বিশ্বাস সংশোধন না করবে এবং পূর্ববর্তী মনীষী ও বুজুর্গদের দ্বীনের পথ আকড়ে না ধরবে ততক্ষণ দ্বীন ও নাজাত লাভ করা কঠিন হবে। সুতরাং বীরত্বের সাথে জামাতের ইসলামীর মোকাবিলা করতে হবে এবং তার

৮। ফেতনায়ে মওদুদিয়াত, ৫৮ পৃঃ।
৯। মওদুদিয়াতকা পোষ্ট মরটাম, ৭ পৃঃ।
১০। মোকালেমায়ে কাজেমী ও মওদুদী, ৪৪ পৃঃ।

শক্তি নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।''[১১]

এক সময় শরসিনার মরহুম পীর মওলানা নেসার উদ্দীন আহমদ সাহেবকে মওদুদী সাহেবের একটি প্যাম্ফলেট পড়ে শোনান হচ্ছিলো। কয়েক লাইন শোনার পর পীর সাহেব বললেন, ''আর পড়তে হবে না। তাতে রূহানিয়াতের অভাব রয়েছে।''[১২]

একই গ্রন্থে শরসিনা দারুসসুন্নাহ থেকে একটি দীর্ঘ ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত ফতোয়ায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মওদুদী জামাতের কতকগুলো বাতিল ধ্যান-ধারণার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত ফতোয়ার এক স্থানে বলা হয়েছে, 'জনাব মওদুদী সাহেব তাঁর বাতিল আকিদার প্রচারের উদ্দেশ্যেই জামায়াতে ইসলামী নামে মওদুদী জামায়াত কায়েম করেছেন। তদুপরি এটাও অনস্বীকার্য যে, নেতার আক্বায়েদ ও ধ্যান-ধারণা অজ্ঞ কর্মীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে থাকে। এজন্য কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও মওদুদী জামায়াতে শামিল হওয়া জায়েজ নয়।''[১৩] এই ফতোয়ায় বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পঁচাত্তর জন আলেম স্বাক্ষর করেছেন।

চট্টগ্রাম হাটহাজারী দারুল উলুম মাদ্রাসার মুফতি হযরত মওলানা ফয়জুল্লাহ মওদুদী জামাত সম্পর্কে একটি ফতোয়া প্রদান করেন। তাতে তিনি বলেছেন, ''মওলানা মওদুদী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতি ও মতবাদ বিরোধী বিভ্রান্তিকর ও ত্রুটিপূর্ণ ধ্যান-ধারণা পোষণকারী। তাঁর অধিকাংশ লেখায় বিগত মনীষী, সাহাবা-কেরাম, তাবেয়ীন, ইমাম, মুজতাহিদ ও আওলিয়া কেরামের প্রতি বেআদবী প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ধৃষ্টতামূলক আক্রমণ থেকে মহান নবীরাও রেহাই পাননি। সুতরাং এই দলের সাথে উঠা-বসা, সংশ্রব রাখা মুসলমানদের জন্য কোন অবস্থায় জায়েজ নয়।''[১৪]

তাঁর এই ফতোয়ার প্রতি অভিন্ন মত প্রকাশ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৭ জন শীর্ষস্থানীয় আলেম স্বাক্ষর করেন। এই ফতোয়ায় স্বাক্ষর দান প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হযরত মওলানা তাজুল ইসলাম লিখেছেন, ''আমি মুফতি ফয়জুল্লাহ সাহেবের অভিমত সমর্থন করি। বস্তুতঃ মওদুদী ফেতনা কাদিয়ানী ফেতনার চেয়ে কম নয়।''

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত জাকারিয়া (রঃ) মওদুদী জামাত সম্পর্কে 'ফিতনায়ে মওদুদীয়াত' শীর্ষক একটি তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক লিখেছেন। তিনি তাঁর এই পুস্তকে মওদুদী জামাতে ইসলাম বিরোধী বিষয়গুলো পবিত্র কোরআন হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাঁর বইয়ের এক জায়গায় মওদুদী জামাত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আমি এই ভ্রান্ত দলে যোগদান করা হারাম মনে করি। তাদের বই-পুস্তক পাঠ করা অত্যন্ত ক্ষতিকর।'

বিশিষ্ট আলেম ও লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ার প্রিন্সিপাল হযরত মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন জামাতে ইসলামীর

১১। মওদুদী জামায়াতের স্বরূপ, ৩৬৫ পৃঃ।
১২। ঐ, ৩৪৫ পৃঃ।
১৩। ঐ, ৪১৬ পৃঃ।
১৪। ঐ, ৪০৯ পৃঃ।

সহযোগিতা করেন। তাঁর উপদেশে অনেক লোক পাকিস্তান আমলে জামাতে যোগদান করে। কিন্তু এক পর্যায়ে জামাতের আসল চেহারা তাঁর সামনে বেরিয়ে পড়ে। তিনি 'ভুল সংশোধন' শীর্ষক একখানা পুস্তক লিখে জামাতের ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে দেন। তিনি তাঁর পুস্তকের এক জায়গায় লিখেছেন, 'যাবৎ পর্যন্ত জামাতে ইসলামীর মূল নীতিতে এই ঘোষণা দিয়ে না দিবেন যে আমরা মওদুদী সাহেবের এ ভুলসমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছি, তাবত পর্যন্ত জামাতে যোগদান করা, কাজ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েজ হইবে না। যাহারা সাহাবায়ে কেরামের দোষ চর্চায় লিপ্ত তাহারা যে কেহই হোন না কেন—তাহাদিগকে ইমাম বানাইয়া পিছনে নামাজ পড়া কিছুতেই জায়েজ হইবে না। কারণ যেহেতু তাহারা সাহাবায়ে কেরামের দোষ চর্চার কারণে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে।'

খেলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর মওদুদী জামাত সম্পর্কে 'সতর্ক বাণী' শিরোনামে একটি পুস্তক লেখেন। তাতে তিনি মওদুদীর ভ্রান্ত মতবাদ ও জামাতে ইসলামীকে মুসলমানদের ঈমান ও ধর্ম বিশ্বাস ধ্বংসকারী ফিতনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি মুসলমানদেরকে ইসলামের মুখোশধারী এই দল থেকে দূরে থাকার আহবান জানান। হাফেজ্জী হুজুরের এই পুস্তকে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় চার শতাধিক আলেম অভিন্ন মত প্রকাশ করে স্বাক্ষর করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মওলানা আজিজুল হক, মুহাদ্দেস, লালবাগ জামেয়া, ঢাকা। মওলানা আমিনুল ইসলাম, খতিব, লালবাগ শাহী মসজিদ, ঢাকা। মওলানা শামসুদ্দীন কাশেমী, প্রিন্সিপাল, মিরপুর জামেয়া, ঢাকা। মওলানা আবদুল ওয়াহাব, প্রিন্সিপাল হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম। মওলানা মুফতি মহিউদ্দীন, বড় কাঁটরা মাদ্রাসা, ঢাকা। মওলানা মুফতি আহমাদুল হক, মুফতি হাঁটহাজারি মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম। মওলানা নেসারউদ্দীন, প্রিন্সিপাল, মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল। মওলানা আজিজুর রহমান, প্রিন্সিপ্যাল, নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসা। মওলানা নুরুল ইসলাম প্রিন্সিপ্যাল, জামেয়া আশরাফিয়া মোমেনশাহী। মুফতি মওলানা আবদুস কাদের, প্রিন্সিপাল, শামসুল উলুম ফরিদপুর। মুফতি মওলানা মোঃ ওয়াক্কাস, দারুল উলুম ইসলামিয়া (প্রাক্তন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী) খুলনা প্রমুখ।

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন হেড মওলানা ও বর্তমানে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব হযরত মওলানা ওবায়দুল হক মওদুদী জামাত সম্পর্কে অভিমত দান প্রসঙ্গে বলেছেন, 'একথা সত্য যে, কোন ব্যক্তি বা তার কাজকে সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা ঠিক নয়। বিশেষতঃ যখন তার ব্যক্তিত্ব এক বিশেষ পদ্ধতিতে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তথাপি তার ভ্রান্তিপূর্ণ পুস্তকাদির দ্বারা সাধারণ নব্য শিক্ষিত লোকদের মধ্যে গোমরাহী বিস্তার লাভ করছে, এমন মুহূর্তে হককথা না বলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা আমার নিজের ব্যাপারে এক মারাত্মক অপরাধ মনে করি। বিশেষতঃ যখন এ ব্যাপারে মতামত চাওয়া হয় তখন নীরবতা অবলম্বন করলে কিয়ামতের দিন তার গলায় আগুনের বেড়ী লাগানো হবে'—বর্ণিত এ শাস্তির ভাগী হওয়ার আশংকা রয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ব্যাপারে তো অনেক পুস্তকই লিখা

হয়েছে। আর কি দরকার? জবাব হলো প্রত্যেক পুস্তকেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্যটায় পাওয়া যায় না। তাছাড়া যখন মওদুদীর পুস্তকাবলী সংগঠিত জামাতের মাধ্যমে সদ্য সর্বদা প্রকাশিত হয়ে চলেছে এবং সেগুলিকে কর্মীদের আবশ্যকীয় পাঠ্যসূচীতে বেঁধে দেয়া হয়েছে তখন সাময়িকভাবে কিছু বিবৃতি বা পুস্তক দ্বারা এর মোকাবিলা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কারণ গুটি কয়েক দিনে এগুলো নিঃশেষ হয়ে আস্তে আস্তে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। আর তখন ময়দান খালি থাকবে শুধু মওদুদী পুস্তকাদির জন্য। তাই ক্রমাগত লোকদের সতর্ক করার জন্য ব্যাপক পর্যায়ে কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রত্যেক যুগের হক্কানী ওলামাদের ধর্মীয় দায়িত্ব।'[১৫]

এছাড়াও উপমহাদেশের যেসব শীর্ষস্থানীয় আলেম মওদুদী ও তার জামাতের পবিত্র ধর্মের নামে রাজনৈতিক ব্যবসায় ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা প্রচার সম্পর্কে লিখেছেন কিংবা ফতোয়া প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট তফসীরকার মওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী, জামাতের প্রাক্তন নেতা মওলানা আমীন এসলাহী, হযরত মওলানা গোলাম গাউস হাজারবী, হযরত মওলানা মুফতি মোঃ শফী, হযরত মওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, হযরত মওলানা আতাহার আলী, মওলানা সোলায়মান নদবী প্রমুখ।

উপমহাদেশের সকল মত ও পথের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের উপরে উল্লিখিত ভাষ্যগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। এগুলো ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁরা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় জনাব মওদুদী ও তার ধ্যান-ধারণার বাস্তবরূপ জামাত সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইসলামের মুখোশধারী জামাতের আসল রূপটি এসব দেশবরেণ্য আলেমদের নিকট অস্পষ্ট নয়। তাই তারা জামাতকে মুসলমানদের বাতিল ফেরকা খারেজী ও কাদিয়ানী সম্প্রদায় থেকেও নিকৃষ্টতর এবং মুসলমানদের ঈমান আকিদার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। শুধু উল্লিখিত আলেমগণই নন, উপমহাদেশের খাঁটি আলেমরা সবাই জামাতের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা অনেকে বিভিন্ন ভাষায় জামাতের বিরুদ্ধে পুস্তক লিখেছেন। আমরা মনে করি, জামাত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে যে কোন সত্যসন্ধ মুসলমানের জন্য আমাদের উল্লিখিত ওলামা কেরামের অভিমতই যথেষ্ট।

বর্তমান আলেমদের অভিমত

মওদুদীবাদ এবং জামাত সম্পর্কে আলেম সমাজের বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের সচেতনতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন বর্তমান সমাজের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ। এখানে মওদুদী এবং জামাত সম্পর্কে দেশের কয়েকজন প্রথিতযশা ধর্মবেত্তা এবং গণ্যমান্য আলেমের মূল্যায়নকে তুলে ধরা হল। ইসলাম সম্পর্কে মওদুদীবাদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মালিবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মওলানা কাজি মুতাসিম বিল্লাহ বলেন—'ইসলাম কি তা বুঝলেই মওদুদীবাদ কতটুকু ইসলামবিরোধী তা বোঝা যাবে। কোরআন হাদিসের আলোকে ইসলাম বলতে এক আল্লাহ রাব্বুল

১৫। মওদুদী ফিতনা, ৩৫-৩৬ পৃঃ।

আলামীনের রবুবিয়াত বা প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয়া এবং হযরত (দঃ) নির্দেশিত পথে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করাকে বোঝায়। অথচ মওদুদীর কাছে ইবাদত বন্দেগী বা নামাজ রোজা মুখ্য কিছু নয়, তার কাছে ইসলামের মূল লক্ষ্যই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সে মনে করত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেই ক্ষমতার জোরে শক্তির জোরে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। আর এই ক্ষমতার নেশায়ই মওদুদী এবং তার অনুসারীরা যুগে যুগে ইসলামের মনগড়া এবং কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে আসছে। আল আকিমুদিন বা তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর মানে বলতে যখন সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অলি আল্লাহরা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার কথা বলেন তখন মওদুদীবাদ একে ব্যাখ্যা করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হিসেবে। ইসলামের ব্যাখ্যা সাহেবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীতে আলেমরা যে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে এসেছেন মওদুদী দেখলেন তার মনগড়া ইসলামকে সেগুলোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। ফলে সাহেবায়ে-কেরাম ও আলেম অলিদের বল্গাহীন সমালোচনার ক্ষেত্রে ইসলামকে ব্যক্তিগত এবং দলগত সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন করার প্রচেষ্টা চালায় মওদুদী এবং তার অনুসারীরা। এ কারণেই তাদের ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা শুরু এবং সেটাও ইসলামের নাম দিয়েই। অথচ ইসলামের আলোকেই দেখা যায় সাহাবায়ে-কেরামরা প্রত্যেকেই পরবর্তীদের সমালোচনার উর্ধ্বে। তাদের প্রত্যেকেই রাসুলুল্লাহ সুন্নাতের অনুসরণ করে গেছেন। তাদের সমস্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে অস্বীকার করে মওদুদী এক নুতন ইসলামের প্রবক্তা বনে যান।'

মওলানা মুতাসিম বলেন 'মওদুদী সম্পর্কে যতটুকু জানি তার কোন নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় শিক্ষা বা ধর্মীয় ওস্তাদ ছিল না। মাত্র দ্বিতীয় বিভাগে তিনি মৌলভী ফাজেল ডিগ্রী লাভ করেন যা প্রচলিত শিক্ষায় এস এস সির সমপর্যায়ের। এ সময় তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিকৃত ধারণা পোষণকারী নেয়াজ ফতেপুরী ইত্যাদি ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। সেখান থেকেই ধর্ম সম্পর্কে তার ধারণা বিপথে চালিত হতে থাকে।

'মওদুদী এবং তার দল জামাতে ইসলামের রাজনীতি পর্যালোচনা করলেও এক অদ্ভুত স্ববিরোধিতা দেখা যায়। আরো অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই বিরোধিতাটুকুও তিনি করেছেন ইসলামের নামে— আবার ইসলামেরই বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের জাতীয়তা আন্দোলন ও লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করে তিনি প্রকারান্তরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালী করে যান। পরে আবার সে পাকিস্তানেই আশ্রয় নেয় এবং তাও ইসলামের দোহাই দিয়ে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫০ সাল তার পুস্তকাদিতে গণতন্ত্রকে কুফরী হিসাবে অভিহিত করা হত। মওদুদীর ব্যাখ্যা ছিল গণতন্ত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বদলে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলে কাফেরের কাজ করা হয়েছে। পরে মওদুদী ও তার দল জামায়াত দেখল পাকিস্তানে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করার জন্য প্রচলিত গণতান্ত্রিক সুবিধাগুলো ব্যবহার ছাড়া পথ নেই। তাই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তারা গণতন্ত্রকে ইসলামে সম্পৃক্ত করে ইসলামী গণতন্ত্রের কথা বলতে থাকে। যে নির্বাচনকে তারা ইসলামবিরোধী বলত সেই নির্বাচনেই ১৯৫৪ সনে অংশগ্রহণ করে তারা। অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাফেরে পরিণত হয়।

'৫৪ সনের পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের সময় আমীন আহসান এসলামী প্রমুখ মওদুদীর ঘনিষ্ঠজনরা তার এই বিচ্যুতির বিরোধিতা করলে মওদুদী বলেন— ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে প্রয়োজনে ইসলামের অনেক শিক্ষার পরিবর্তন করতে হয়। তার এই ব্যাখ্যা শুনে তৎকালিন অনেক নেতাই তওবা করে জামাত থেকে বেরিয়ে যান। মওদুদী এবং জামাত সারাজীবন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দালালী করেছিল। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন পুঁজিবাদী শক্তির অর্থ আনুকূল্যেই জামাতের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালানো হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে জামাতের চিন্তাধারা পুঁজিবাদী ধ্যানধারণা দ্বারা আচ্ছন্ন। ইসলাম মানবতার ধর্ম, কৃষক শ্রমিকসহ সকল নির্যাতিত মানুষের মুক্তির লক্ষে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামই সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়েছে। ক্ষমতালোভী জামায়াত সেই পুঁজিবাদের পৃষ্ঠপোষক রাজনীতি করে কৃষক শ্রমিকদের দাবীর প্রতি উদাসীন থেকে এ কোন ইসলামের রাজনীতি করছে? 'মওলানা মুতাসিম বলেন— 'ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে মওদুদী এবং তার অনুসারী জামাত মানুষের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসের জোরে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তারা ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে অশ্রদ্ধার সৃষ্টি করেছে। আলেম সমাজ মনে করে এ দেশে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যক্তিজীবনে ইসলামের মাধুর্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মওদুদী এবং জামাতের ফ্যাসিস্ট রাজনীতিই বড় বাধা। আল্লাহ রাসুলের ইসলাম থেকে সরে তারা এমনভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করছে যাতে মনে হয় ইসলামে ক্ষমতা দখলই মুখ্য ব্যাপার, মানবতা প্রতিষ্ঠা বা গরীব শোষিত মানুষের মুক্তির ব্যাপারে ইসলাম উদাসীন। এভাবে জামাত নিজের যেমন প্রগতিশীল মুক্তমনাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে তেমনি ইসলাম সম্পর্কেও তাদের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করেছে। এ কারণে আমি মনে করি মওদুদীবাদী এবং জামাত রাজনীতি এদেশে ইসলামের জন্য বিরাট বিষফোঁড়া হয়ে আছে।'

'৭১ সালে জামাতে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে মওলানা মুতাসিম বলেন— '৭১-এর যুদ্ধকে জামাত চিত্রিত করেছিল ইসলাম ও কুফরীর লড়াই হিসেবে। কিন্তু সেটা ছিল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগত বিরোধ। সে সময় নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা, নারী নির্যাতন, লুন্ঠনের যেসব ঘটনা ঘটেছে তা মারাত্মক পাপ—ইসলাম এসব কোন যুক্তিতেই সমর্থন করে না। এসব কাজে জামাতের সহযোগী ভূমিকা থাকার অভিযোগ আছে। সে সময় জামাতের কেউ কেউ প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমেও পাক-সামরিক জান্তাকে দমনমূলক কাজে উৎসাহ যোগিয়েছে। চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী জামাত তাদের সে কাজকেও ইসলাম রক্ষার কাজ বলে সাফাই গেয়েছে—যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আমরা মনে করি।'

জনাব মুতাসিম বলেন, 'জামাতের ক্ষমতা দখল রাজনীতির আরেক উপসর্গ হিসেবে তাদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের কথা শোনা যায়। বর্তমানে এই সংক্রান্ত খবরাখবর আরো বেশী করে পাওয়া যাচ্ছে। প্রসঙ্গত পাক কোরানের চতুর্দশ পারার সুরা নাহানের একটি আয়াত উদ্বৃত করা যায়। সেখানে বলা আছে তোমরা যদি আক্রান্ত হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাও তবে যতটুকু আক্রান্ত হয়েছ ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তবে সেটাই উত্তম হবে। জামাতের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে ইসলামের এই নির্দেশের প্রতিফলন দেখা যায় না।

জনাব মুতাসিম বলেন, 'সবকিছু পর্যালোচনা করলে এ কথাই বলতে হয় ভারতীয় উপমহাদেশের দলমত নির্বিশেষে সমস্ত আলেম বুজুর্গানে দীন মওদুদীবাদ ও জামাতের রাজনীতিকে যেমন ইসলাম বিরোধী মনে করেন—আমরাও তেমনি মনে করি মওদুদীবাদ ও জামাত ইসলামের মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।'

মওদুদীবাদ সম্পর্কে লালবাগ জামেয়া কোরানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা ফজলুল হক আমিনী বলেন—'যে মওদুদীবাদের উপর ভিত্তি করে জামায়াতের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত সেই মওদুদী আকীদাকে আমাদের বুজুর্গানে দীন আলি আল্লাহরা ভ্রান্ত মতবাদ বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তাই তাতে রাজনীতির অবকাশ আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জামাতের ব্যাখ্যা ইসলাম সম্মত নয়। জামাতের রাজনীতি অনুযায়ী দীন হচ্ছে রাজনীতির আওতাধীন। এটা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিই দীনের আওতাধীন ইসলামী রাজনীতির সঠিক নাম খেলাফত—অর্থাৎ একামতে দীনের জন্য এমন নেতৃত্ব সৃষ্টি করা যা বিশ্বনবীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। একামতে দীন বলতে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, সর্বক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা, শরীয়তী বিচার বিভাগ, সৎকার্যের আদেশ ইত্যাদিকে বোঝায়। এই ব্যাখ্যার বিপরীত হলে তা ইসলামের রাজনীতি হবে না। জামাত অনেকটা উল্লিখিত বিপরীত ব্যাখ্যার রাজনীতি করে ইসলাম থেকে সরে এসেছে।'

তিনি বলেন, 'ইসলামের নামে সন্ত্রাস করা মোটেও জায়েজ নয়। এতে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা হয়। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের আক্রমণের সময় 'মরলে শহীদ—বাঁচলে গাজী' ধরনের শ্লোগান জামাত রাজনীতিতে রয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই মৃত্যু আদৌ ইসলামের জন্য কি, নাকি রাজনীতির জন্য?'

মাওলানা আমিনী বলেন, 'জামাতের বিরোধিতা মানে ইসলামের বিরোধিতা এটাও ঠিক নয়। কোরান হাদিসের ইসলাম জামাতের ইসলামে সীমবদ্ধ নয়। ৫০/৬০ বছর আগে জামাতে প্রতিষ্ঠার আগেও ইসলাম ছিল, ইসলামের সঠিকতম অনুসারীরা ছিল। আর জামাত যে জেহাদের কথা বলে তা কোরান হাদীস নির্ধারিত পথেই করতে হবে, এক্ষেত্রে নতুন কোন ব্যাখ্যা গ্রহণীয় হবে না।'

স্বাধীনতাযুদ্ধে জামাতের ভূমিকা সম্পর্কে মওলানা আমিনী বলেন— 'এটা ছিল জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের যুদ্ধ—ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। যারা '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলেছিল তারা ভুল বলেছিল।'

জামাতে ইসলামী সম্পর্কে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক বলেন—'জামাত সম্পর্কে '৮৬-র মার্চে একটি পত্রিকায় আমি যা বলেছিলাম বর্তমানেও সে ধারণার পরিবর্তন হয়নি, কাজেই তাদের ব্যাপারে নতুন কোন ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন নেই।' জামাত সম্পর্কে তার পূর্বতন ধারণাটি কি জানতে চাইলে তিনি জানান—'জামাত বস্তুতপক্ষে একটি রাজনৈতিক দল। ইসলামী ছাত্র শিবির উক্ত রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন যারা জামাতের মতাদর্শ প্রচারের জন্য কাজ করে। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকার কারণে তাদের রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে আমার কিছু বলা ঠিক হবে না। তবে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে জামাতে ইসলামীর চিন্তধারা আকিদা এবং কর্মসূচী সম্পর্কে বিভিন্ন

সময়ে মাওলানা হোসেন আহমেদ মাদানী, মুফতী মোঃ শফি, মাওলানা মোঃ ইউসুফ বিন নূরী, মাওলানা আবুল হাসান আলী নাফাযী প্রমুখ বিজ্ঞ ওলামায়ে একরামগণ সমালোচনা করে এসেছেন এবং বিভিন্ন বই-পুস্তকের মাধ্যমে জামাতের মতাদর্শগত আকিদাগত ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় জামাতে ইসলামের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা এসকল বিখ্যাত ওলামায়ে একরামদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও নিজ মত ও পথের কোন পরিবর্তন করতে কখনও রাজী হয়নি। সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে ইসলামী বিষয় প্রচার এবং সাধারণ লোকদের ইসলামে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে জামাতের অবদান রয়েছে এটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণার ওপর অবিচল থাকার মনোভাব এবং বিশেষ করে ইসলামের মতাদর্শগত ব্যাপারে দলীয় একগুঁয়েমীর কারণে জামাতে ইসলামকে সমর্থন করা প্রথিতযশা ওলামায়ে একরামদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। এসব ভ্রান্ত ধারণার ব্যাপারে আমি কোন নতুন মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করি না। বরং উপমহাদেশের বরেণ্য ওলামায়ে একরামগণ যারা ইসলাম সম্পর্কিত জামাতে ইসলামের ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল ব্যাখ্যার সমালোচনা প্রতিবাদ করে আসছেন, তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি।'

বিচিত্রার সঙ্গে আলাপকালে মাওলানা ওবায়দুল হক বলেন যে— 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কোন জেহাদ হতে পারে না। বরং এটা ফেতনা ও ফ্যাসাদ। তিনি আরো বলেন যে কোন সময়ে যে কোন গণহত্যা গুপ্তহত্যা মানবতা বিরোধী কাজ। ইসলাম মানবতা বিরোধী কাজ কখনো সমর্থন করে না।'

গণভবন মসজিদের ইমাম এবং জমিয়েতুল মোদাসসেরিনের প্রাক্তন সভাপতি মওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল আহজারী বলেন—'জামাত সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার '৮৬ সালের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মিসরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স চলাকালীন সময় একটি ঘরোয়া আলোচনাতে আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডাঃ ওমারা জামাতের প্রশংসা করে কিছু বক্তব্য রাখেন। আমি ওমারাকে বললাম মওদুদী ও আমি বহুকাল একই পতাকার নীচে একই দেশে বাস করেছি, তার প্রচুর বই পুস্তক আমি পড়েছি, আমি তার ইসলাম বিরোধী ভ্রান্ত ধারণাগুলোর সঙ্গে প্রথম থেকেই জানি, দেশের সর্বস্তরের আলেমরা তার বিরুদ্ধে বলেছে—আপনি কিভাবে তার প্রশংসা করছেন? ওমারা বললেন—আমি তার রাজনৈতিক প্রশংসা করছি অন্য কিছু জানি না। আমি মওদুদীবাদ রাজনীতির ভ্রান্ত ধারণাগুলো ওমারাকে বুঝিয়ে দেই। সেখানে উপস্থিত সমস্ত বিশ্বের আলেমরা মুক্তকন্ঠে আমাকে সমর্থন জানায়। ওমারা এক পর্যায়ে ভুল বুঝতে পেরে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করেন এবং সবার নিকট ক্ষমা চান।'

মাওলানা জালালাবাদী বলেন— 'প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সম্পর্কে মওদুদীর ব্যাখ্যাতে অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামের বিকৃতকরণ করা হয়েছে। মওদুদীবাদকে বিভিন্ন সময়ে আলেম সমাজ প্রত্যাখ্যান করে এসেছে— মওদুদী নিজেই বলেছেন দেওবন্দী ও বেরলভিরা সবাই একবাক্যে আমাদের বিরুদ্ধে বলে থাকেন। সকল ধর্মীয় অথরিটি প্রত্যাখ্যাত এই মতবাদের যে কোন রাজনৈতিক প্রচার ধর্মের বিকৃত রূপ মাত্র। মওদুদীর কোন একাডেমিক নলেজ নেই—সোর্স অব ইনফর্মেশনে ইন্টিগ্রিটিও

নেই। সে নিজেই বলে আমি দুদিক থেকেই কিছু কিছু কুড়িয়ে নিয়েছি। এতেই বোঝা যায় যে হাতুড়ে ডাক্তারের মতো ইসলাম সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা অজ্ঞানতাপ্রসূত এবং মনগড়া। মওদুদী তার চিন্তাচেতনায় সিয়া সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বড় বড় সাহাবাদের প্রতি সে কটাক্ষ করেছে ইসলাম সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছেন। তার ইগো এত প্রবল ছিল যে নবী রাসুলদের অনেক কিছু পর্যন্ত তিনি ভ্রান্তিকর বলেছেন। তাসাওউফ বা ইসলামের আধ্যাত্মবাদকে তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেন। যার ফলে মাওলানা সৈয়দ আহমেদ বেরলভী ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ বিশ্বনন্দিত অলিআল্লাহ বুজুর্গানে দীনের বিরুদ্ধে তিনি কটাক্ষপাত করেন খোদ তাসাওউফকে তিনি রোগজীবাণু হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

'ইসলাম সম্পর্কে মওদুদীর ব্যাখ্যা যতটুকু ধর্মীয় তার চেয়ে অনেক বেশী রাজনৈতিক। খোদ আল্লাহকেই মওদুদী তার ভ্রান্ত ধারণার মাঝে টেনে এনেছেন। আল্লাহর প্রেমময় রূপের বদলে তিনি আল্লাহকে উগ্র জবরদস্ত প্রশাসক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদভী মাওলানা মঞ্জুরুল নোমানীর মতো তার এক সময়ের ঘনিষ্ঠজনরাই এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন মওদুদীর এই ধারণাতে আধ্যাত্মবাদের অভাব এবং ইসলামের মারাত্মক বিচ্যুতি ফুটে উঠে।'

মাওলানা জালালাবাদী বলেন, 'মওদুদীর এসব ধ্যান-ধারণার ফসল জামাতে ইসলামীর রাজনীতি পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা ইসলামের সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছে। এক সময়ে তারা বলত বর্তমান সিস্টেমে ভোট প্রার্থী হওয়া জায়েজ নয়, বিচার ব্যবস্থার প্রচলিত কাঠামোও অনৈসলামিক। পরবর্তীতে এসব প্রক্রিয়াতেই তারা একীভূত হয়েছে, এসবেরই সমর্থন করেছে। নারী নেতৃত্বের বিরোধিতা করে পরে ফাতেমা জিন্নার পক্ষে সারা পাকিস্তানে ক্যানভাস করেছে, জিন্নাহর ছবি নোটে ছাপানোতে আপত্তি করে পরে নির্বাচনী প্রচারের সময় ভাউচারে জিন্নাহর ছবিই ব্যবহার করেছে।

এরও আগে পাকিস্তানের জন্মে নাপাকিস্তানের সৃষ্টি হবে বলে মওদুদী এবং জামাত রাজনীতির ধারকরা দেশ বিভাগের পর তাদের সেই কথিত নাপাকিস্তানেই আশ্রয় নেয়। '৪৮ সনের দিকে কাশ্মীর যুদ্ধের সময় উপজাতীয়দের পক্ষে মুসলমানরা যখন যুদ্ধ করছিল অখন আল-ইন্ডিয়া রেডিও থেকে মওদুদীর ফতোয়া প্রচারিত হয়—যারা কাশ্মীর যুদ্ধে মারা যাবে তারা কুকুরের মৃত্যুবরণ করবে। এ সম্পর্কে মওদুদীর ব্যাখ্যা ছিল, পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণার আগে সেখানে মুসলমানরা যুদ্ধ করে বেআইনী কাজ করছে, তাই তাদের মৃত্যু কুকুরের মৃত্যু হবে। '৭০ সনে যখন মওদুদী ও তার লোকেরা বলা শুরু করে সমাজতন্ত্রীদের জিহবা কেটে নেয়া হবে তখন আমরা প্রশ্ন করি সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতিরেকে মওদুদীদের এই আক্রমণ কি বেআইনী ইসলাম বিরোধী নয়?

'৭১ সনে জামাতের ভূমিকা সম্পর্কে মওলানা জালালাবাদী বলেন— '৭১ সনে তারা মস্ত ভুল করেছিল। দেশের জনগণের আশা আকাঙ্খাকে তারা বুঝতে পারেনি। তারা পাকিস্তান ও ইসলামকে এক দৃষ্টিতে দেখেছিল। অথচ '৭০ সনের দিকে পাক-সরকারের ইসলামিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আলাউদ্দিন সিদ্দিকী নিজেই পরিস্কারভাবে বলেছিলেন পাকিস্তানকে তত্ত্বগতভাবে ইসলামী রাষ্ট্র বলা চলে না। পাকিস্তান আজ নেই, আমরা

তো ইসলাম নিয়ে টিকে আছি, এদেশে ইসলাম বিপন্ন হয়নি। কাজেই ইসলাম রক্ষার নামে গণহত্যা ধর্ষণের মতো অনৈসলামিক ঠিক হয়নি— এসব কাজ শরীয়তসম্মতও ছিল না।'

জামাতে ইসলামীর বর্তমান রাজনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'জামাত এখন গণতন্ত্রের কথা বলছে। অথচ গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু সৌদি রাজতন্ত্রের পয়সাতে তাদের কাজ চলছে। মওদুদীর লেখা বই মুসলমান আউর মওজুদাসিয়াসী কাশমাকাশ গ্রন্থে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসংখ্য ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই জামাতকে আমি গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করি। জামাতের মতাদর্শ ধ্যান-ধারণাকে সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। ৪০ বছর আগে মাওলানা হোসাইন আহমেদ মাদানী প্রমুখ দূরদর্শী আলেমগণ আশংকা করেছিলেন জামাত মুসলমানদের মধ্যে ফেকরার রূপ পরিগ্রহ করবে—সে আশংকা আজ সত্যি হয়েছে।

বাংলাদেশ হিউম্যানিটেরিয়ান সোসাইটির চেয়ারম্যান মওলানা ইসহাক ওবায়েদী বলেন, 'জামাতে ইসলাম নামকরণটিতেই ভুল রয়েছে। অর্থগতভাবে এতে তাদেরকেই ইসলামের একমাত্র জামায়াত বোঝায় এবং তাদের বিশ্বাসও তাই। অথচ প্রকৃত অবস্থা মোটেও তা নয়। উপমহাদেশে প্রায় পৌনে দু'শ কিতাব গ্রন্থিত রয়েছে জামাতের আদর্শিক ভিত্তি মওদুদীবাদের বিরুদ্ধে। উপমহাদেশের সমস্ত আলেম উলামাদের মতে—আকিদা ইবাদত আখলাক মোয়ামেলাত, মোয়াশেরা ইসলামের এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে আকিদা এবং ইবাদত বিষয়ে মওদুদীর ব্যাখ্য ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। মওদুদীর মতে নামায রোজা পালন না করে শুধু বিশ্বাসের জোরে কেউ মুসলমান হতে পারে না। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ব্যাখ্যা এ ক্ষেত্রে বিপরীত। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নামাজ রোজা না করলেই কেউ অমুসলমান হয়ে যাবে না।

'মওদুদীবাদে সবচেয়ে আপত্তিকর দিকটি হলো এতে বিগত সাহাবায়েকেরাম, আলেম বুযুর্গদের ইসলাম সম্পর্কিত গত ১৪ শত বছরের ব্যাখ্যাকে ইচ্ছামাফিক অবজ্ঞা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মওদুদী ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে এর সঠিক ভাবধারা থেকে সরে এসেছেন। অথচ ইসলামের পরিপূর্ণতাই এসেছে সাহাবায়ে কেরামদের দেয়া রাসুলুল্লাহর (দঃ) কথা এবং কাজের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে। মওদুদী এমনকি কয়েকজন নবীর ভুলত্রুটির কথাও বলেছেন। মওদুদীর ব্যাখ্যানুযায়ী হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত জাকারিয়া (আঃ), হযরত মুসা (আঃ)-র মতো নবীরাও গুনাহের কাজ করেছিলেন। অথচ আহলে সুন্নাতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নবীরা নিষ্পাপ।

'কোরআন শরীফের তফসির করতে গিয়েও মওদুদী অনেক মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কোরআনে আছে বাররাফা আহুল্লাহ অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে সমস্ত আলেমদের ব্যাখ্যা আল্লাহ হযরত ঈসাকে সশরীরে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। অথচ মওদুদী বলেন আল্লাহ হযরত ঈসা (আঃ)-র রুহ উঠিয়ে নিয়ে গেছেন সশরীরে নয়। আল্লাহ তো সকল মানুষেরই রুহ উঠিয়ে নেন। মওদুদীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি রুহই উঠিয়ে নেয়া

হত তাহলে কোরআনে আলাদা করে বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আঃ) রুহ উঠিয়ে নেয়ার কথা বলা কেন? আরেকটি উদাহরণ এখানে টানা যায়। দাড়ি রাখার ব্যাপারে সমস্ত আলেমদের ব্যাখ্যা হল— একমুঠ পরিমাণ দাড়ি রাখা উচিত। মওদুদী বলে দাড়ি রাখলেই চলে তা ফ্রেঞ্চকাট হোক আর যত ছোট আকৃতিরই হোক।'

'ধর্মের এ ধরণের বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে জামাত আসলে গোমরাহ ফেকরাতে পরিণত হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে এমন সময় আসবে যখন মুসলমানরা ৭৩ ভাগে ভাগ হয়ে যাবে— যার মধ্যে ৭২টি হবে গোমরা ফেকরা বা পথভ্রষ্ট। মওদুদীবাদে ধারক জামাতকে আমরা সেই ৭২টি পথভ্রষ্ট অংশের একটি বলেই মনে করি।'

জামাতের রাজনীতি প্রসঙ্গে মওলানা ওবায়েদী বলেন, 'জামাতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও ধর্মের বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যার সম্মিলন দেখা যায়। জামাত ক্ষমতার লড়াইযে বিশ্বাস করে—বিশ্বাস করে ক্ষমতা হলে জোরপূর্বকভাবেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা পাবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা হল প্রথমে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পরিবার-সমাজ এবং আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানুষের মন জয় করার মাধ্যমেই ইসলামের বিস্তৃতি আসবে, ক্ষমতাদখল এখানে মুখ্য ব্যাপার নয়। আল্লাহ পাক তো কোরআন শরীফে বলেই দিয়েছেন— ওয়াদাল্লা হুল্লাযিনা আ-মানুজিনকুম ওয়া আমিলুস সালিহাতি লায়াসতাখলিফান্নাহম। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে ওয়াদা করেছেন যারা ঈমান এনেছেন এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে জামিনের খেলাফত অবশ্যই দেয়া হবে। ইসলামের ইতিহাসে আমরা এর প্রতিফলন দেখি। হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ) তারা ঈমান ও নেক কাজের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করে ক্ষমতায় এসেছেন। অথচ জামাত আকিদাগত এবং আমলগত বিভ্রান্তি দূর না করে কেবল ক্ষমতা ছিনিয়ে আনার জন্যই রাজনীতি করছে। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগও বিভিন্ন সময় শোনা গেছে। এ ক্ষেত্রে তারা যদি প্রথমে আক্রান্ত হয়েও সন্ত্রাস করে থাকে—সীমা লংঘন করা তাদের উচিত হয়নি। তবে অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদেরও জামাতের উপর সন্ত্রাস চালানো উচিত নয়। জামাতকে মোকাবেলা করতে হবে গণতান্ত্রিকভাবে এবং সকলের সম্মিলিত সচেতনতার মাধ্যমে। তাদের বিরুদ্ধে বলে বলে তাদের নেগেটিভ প্রচারণাই করা হচ্ছে কিন্তু মতাদর্শগতভাবে তাদের উচ্ছেদের জন্য কোন মহলই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে না।'

'৭১ সনে জামাতের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মওলানা ওবায়েদী বলেন— '৭১ সনে জামাত সবচেয়ে বড় ভুলটি করে বসে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে তারা ইসলাম এবং কুফরের লড়াই হিসেবে উপস্থাপন করে। আমরা মনে করি রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেই কোন মুসলমানকে সে আওয়ামী লীগ বা কম্যুনিস্ট পার্টির লোকই হোক— কাফের ভাবা ঠিক নয়। '৭১ সালের জামাতের কিছু লোকের বিরুদ্ধে গণহত্যা ধর্ষণের মতো জঘণ্য কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে— ইসলামের দৃষ্টিতে এসব অবশ্যই নাজায়েজ।'

মওলানা ওবায়েদী বলেন— '৭১ সালে জামাত যে অপরাধ করেছে

রাষ্ট্রীয়ভাবে তার বিচার করা যেত কিন্তু সরকার তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিল। এখন আর তাদের বিচারের প্রশ্ন আসে না, তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করার কথা সবাইকে ভাবতে হবে।'

গোলাম আযম প্রসঙ্গে মওলানা ওবায়েদী বলেন— তার নাগরিকত্বের ব্যাপারটি ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। তিনি সত্যিকারের অর্থে দোষী হলে অবশ্যই তার বিচার হওয়া উচিত আর সরকার যদি মনে করে গোলাম আযমের দোষস্খলন হয়ে গেছে তাহলে তার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রহসন করা উচিত নয়, এতে সরকারের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা কমর রেজা বলেন— 'মওদুদীর ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণ ছিল না। শিখ ধর্মাবলম্বী মওদুদী প্রথম জীবনে নিজেও শিখ ছিলেন। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে তার পড়াশোনা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎ ছিল। সেই অস্পষ্ট জ্ঞান দিয়ে তিনি ইসলামের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। ইসলাম সৃষ্টির সময় জামাতে ইসলাম দলটি ছিল না। রাসুলুল্লাহ (দঃ)-র সময় কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়। দ্বীনের সমস্ত কানুনের সমষ্টি এবং উৎস এই পবিত্র কোরআন। পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামগণ ইসলামী কানুনগুলোকে নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আরো বেশী স্পষ্ট করেছেন। চল্লিশ দশকের গোড়ায় এসে জামাত ইসলামের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিতে থাকে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এসব নতুন ব্যাখ্যা কিসের জন্য? জামাতের জন্মের পূর্বেই তো ইসলাম তার মহিমাময় স্বর্ণশিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। এই স্বর্ণশিখরের ধারাগুলোর কোন কোনটিকে অস্বীকার করে জামাত ইসলামের ক্ষতিই করছে কেবল।

'জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী কয়েকজন নবীর বিরুদ্ধে কটাক্ষও করেছেন অথচ সেসব নবীদের কোরআন শরীফের ২৩ পারায় সুরায়ে শাফফাতে আল্লাহতালা নিজে মুমেন বান্দা বলে নিশ্চিত স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুরায়ে শাফফাতের ৭২ নং আয়াতে আছে.....আর আমি (আল্লাহ) তাহাদের মধ্যে হুঁশিয়ার সৃষ্টিকারী রাসুলকে পাঠাইয়াছিলাম। এতে বোঝা যায় নবী রাসুলদের কেউই বেহুশ ছিল না। তাদের কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে জামাত নিজেদেরই দোষী সাব্যস্ত করছে।'

মওলানা কমর রেজা বলেন— 'ইসলামের এ ধরনের বিকৃত ব্যাখ্যাকে বহন করে জামাত, ইসলামের নামে যে রাজনীতি করছে তা কখনও পরিশুদ্ধ হতে পারে না। মুসলামানদের মধ্যে তারা আবার নতুন করে কি ইসলাম প্রচার করবে? ইসলাম রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে জোর জবরদস্তিমূলকভাবে পালন করানোর ধর্ম নয়। ইসলামের দাওয়াততো এদেশের মুসলমানদের মধ্যে পৌঁছে গেছেই—সেটা তাদের বাধ্যতামূলকভাবে পালন করানো কোন ইসলাম নয়।

'কোরআন শরীফে আছে ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। অর্থাৎ রাসুলুল্লার উপর আল্লাহ্‌র হুকুমকে তবলীগ করা ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই। জামাতের যদি ইসলাম তবলীগের দায়িত্ববোধ প্রবল হয়ে ওঠে, আমি তাদের পরামর্শ দেব অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে গিয়ে এ কাজ করতে। এদেশের মুসলমানদের পুনরায় মুসলমান বানানোর দরকার নেই। এবং জামাত যদি বলতে চায় এ ধরনের লক্ষ্য তাদের নেই তাহলে আমি বলব তাদের রাজনৈতিক দলটির নামেও ইসলাম শব্দটি থাকার দরকার নেই—এতে বিভ্রান্তিই বাড়ে কেবল। কারণ যার যার ধর্ম

তার নিজের কাছে, রাজনৈতিক দলগঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় না।'

'৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে মওলানা কমর রেজা বলেন— 'দেশকে স্বাধীন করার বিরুদ্ধে ইসলামে কোথাও কোন আইন নেই। জামাত যে যুক্তিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তা হাস্যকর। দেশ ভাগ হয়ে গেছে ইসলাম ভূলুন্ঠিত হবে তাদের আশংকার অযৌক্তিকতা বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে। ইসলাম এমন এক ধর্ম যা সকল ধর্মের মাঝেও আপন মহিমায় আলোকিত থাকে। অনেক দেশই আছে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় তারা কি তাদের ধর্ম পালন করতে পারছে না? সেক্ষেত্রে শতকরা ৮০ জন মুসলমানের এই দেশটি শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে স্বাধীন হয়ে গেলে এদেশে ইসলাম থাকবে না— তাদের এই আশংকায় যতটা ইসলামের প্রতি মমত্ববোধ ছিল তারচেয়ে অনেকবেশী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল।'

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রধান মওলানা শাহ আহমদুল্লাহ আশরাফ বলেন, 'জামাতে ইসলামের ইসলাম হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের ইসলাম। তারা ইসসলামের নামে যে সব দাওয়াত পেশ করেন সেগুলো ইসলামের নিয়মানুগ নয়। তারা প্রচলিত রাজনৈতিক পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেই সন্ত্রাস হত্যা হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়। অথচ এ বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উদারতা মহত্বের মাধ্যমে—মানুষের মন জয় করে। আর জামাত যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলে তা ইসলামের সঠিক পথ কিনা এ নিয়ে প্রচুর সংশয় আছে। ইসলাম সম্পর্কে জামাতের ব্যাখ্যার সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আইয়াম্মে মুজতাহেদীন (রঃ) পীর মাসায়েল ও আওলিয়ায়ে কেরামগণের ব্যাখ্যার কোন মিল নেই। জামাত সাহাবায়ে কেরামদের সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করে না, কোন কোন নবী সম্পর্কেও তারা কটাক্ষপাত করেছে।

'ওহি বহির্ভূত এবং রাসুলে পাকের (সাঃ) অনুমোদন বিরুদ্ধ দ্বীনের মনগড়া ব্যাখ্যাকে তারা দ্বীনের অঙ্গ মনে করে এটা তাদের অহমিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। জামাতের বিরোধিতা করাকে যারা ইসলামের বিরোধিতা মনে করে তারা আহম্মক ছাড়া আর কিছুই নয়। জামাতে ইসলাম রাসুলে পাকের সময় ছিল না—তাই বলে কি তখন ইসলাম ছিল না? এদেশের আলেম সমাজ মনে করে মুসলমান হওয়ার জন্য জামাতে ইসলামের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মূল ইসলামের ধারক বাহক যারা সেসব বুজুর্গানে দ্বীনের সমালোচনা করে, তাদের বিরোধিতা করে জামাত যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাজনীতি করছে তা কতটুকু ইসলাম সম্মত—আমাদের বোধগম্য নয়, তাদের এই রাজনীতি প্রচারের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য তারা বর্তমান প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাগুলো গ্রহণ করছে। অথচ এক সময় তারাই প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছে। এধরনের প্রচুর স্ববিরোধিতা তাদের বিগত চারযুগের রাজনীতিতে লক্ষ্য করা যায়।'

মওলানা আহমদুল্লাহ বলেন, 'জামাত যে যুক্তিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তাতে ইসলামকে জড়ানো ঠিক হয়নি। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল শোষিত মানুষের লড়াই, ইসলামের সঙ্গে ইসলাম বিরোধীদের লড়াই নয়।

এদেশে এখনও ইসলাম আগের মত পাকিস্তানী কায়দাতেই আছে। ইসলামের কোন উন্নতি হয়নি।'

জামাতে ইসলামীর ধর্মচর্চা সম্পর্কে বাংলাদেশ জাকের সংগঠনের সুপ্রীম কম্যাণ্ড কাউন্সিলের সদস্য পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সল বলেন— 'জামাতে ইসলামের বহু ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছে বলে শোনা যায়। আমরা মনে করি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ অর্থাৎ কলেমা তৈয়বে যারা বিশ্বাস করে তারাই মুসলমান। শুধু বিশ্বাসের জোরে মুসলমান হওয়া যায় না এটা ঠিক নয়। তবে আংশিক আমল চর্চার মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া যায় না। শরীয়ত, তরিকত, হকিকত এবং মারফতের মধ্য দিয়ে আল্লাহতালার পূর্ণ নৈকট্য পাওয়া যায়।

মওদুদীবাদের ব্যাখ্যায় মুসলমান পিতা-মাতার ঘরে জন্ম নিলেই একজন শিশু মুসলমান হয়ে যায় না। এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে পীরজাদা ফয়সল বলেন— 'রাসুলে করীমের হাদিস অনুযায়ী শুধু ইসলাম নয় যে কোন ধর্মের মানব সন্তানই মুসলমান হয়ে জন্ম নেয়। জ্ঞানবোধের পর অন্য ধর্মচর্চার মাধ্যমে তার ধর্ম ভিন্নতা আসতে পারে কিন্তু শিশু থাকাকালীন সময়ে সে মুসলমানই থাকে।'

জন্মলগ্নে পাকিস্তানকে নাপাকিস্তান আখ্যা দেয়া এবং পরবর্তী কালে এই নাপাকিস্তান রক্ষার জন্য ৩০ লক্ষ বাঙ্গালী নিধনে অংশ নেয়ার জামাতী স্ববিরোধিতা প্রসঙ্গে পীরজাদা ফয়সল বলেন, 'তাদের ভূমিকা সম্পর্কে যা শুনি ইতিহাসে যা দেখি তা মোটেও সমর্থন যোগ্য নয়। মুসলমানদের দ্বারা এসব করা উচিত হয়নি। আমরা মুসলমানদের ঐক্যে বিশ্বাসী, হানাহানিতে নয়। ইসলাম মানুষকে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে ভালবাসতে শেখায়। হানাহানিতে হিংসা-দ্বেষ শিক্ষা দেয় না। তাই সত্যিকার ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতিতে হানাহানি হিংসা বা রক্তপাতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলে আল্লাহর রহমত আশা করা যায় না।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকাকালীন সময়ে জামাত শিবির চক্রের 'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী' ধরণের শ্লোগান দেয়া সম্পর্কে পীরজাদা ফয়সাল বলেন, এগুলো রাজনৈতিক শ্লোগান। সত্যিকার ধর্মচর্চা আর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পথকে প্রশস্ত করা এক জিনিস নয়।

১৩ জানুয়ারী ১৯৮৯

১১

আক্রমণাত্মক ভূমিকায় জামাত শিবির সামনে বিভিষিকা

শাহরিয়ার কবির/আসিফ নজরুল

এদেশের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের ঠান্ডা মাথায় হত্যার মাধ্যমে জামাতে ইসলামী তাদের রণকৌশলের অংশ হিসেবে একটির পর একটি ক্যাম্পাস দখলের চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। তাদের রণকৌশল হচ্ছে আগে রাজধানীর বাইরের প্রধান ক্যাম্পাসগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসা, তারপর সর্বশক্তি দিয়ে রাজধানীর উপর হামলা চালানো। প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের ছাত্র ও যুব কর্মীদের উপর জামাতের সুপরিকল্পিত হামলায় বিরোধী দলগুলোর একটি বড় অংশের টনক নড়েছে। বিচিত্রার চার বছর আগের প্রতিবেদনে যে বিরোধী নেতারা জামাতকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে মিত্র ভেবেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই জামাতকে প্রতিরোধ করার কথা বলছেন। এই প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে বিচিত্রায় প্রকাশিত 'জামাত শিবিরের সাম্প্রাতিক নৃশংসতার খতিয়ান' 'পরিশিষ্ট খ'-তে মুদ্রিত হয়েছে।

হত্যার শুরু চট্টগ্রাম থেকে। যে সময় জামাতে ইসলাম ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের সঙ্গে মিলিত হয়ে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচী দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে তখন থেকেই ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে আন্দোলনরত দলগুলোর নেতৃস্থানীয় কর্মীদের হত্যা আরম্ভ করে। চট্টগ্রামের ঘটনাকে অনেকে মনে করেছিলেন বিচ্ছিন্ন ঘটনা, বুঝি দুটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ভেতর স্বাভাবিক সংঘর্ষের জের। কিন্তু না, জামাতের অঙ্গদল ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঘাতকদের এই তৎপরতা চট্টগ্রামে সীমাবদ্ধ রইলো না। চট্টগ্রাম থেকে রংপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে সিলেট, দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দলের তরুণ কর্মীদের একের পর এক নৃশংসভাবে হত্যা করতে লাগলো তারা। কোথাও তাদের এমনভাবে আহত করলো যাতে তারা চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে যায়। ধর্ষকামী লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে একজনের ডান হাত পুরোটাই কেটে দিলো কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র রতনকে প্রকাশ্য দিবালোকে শিক্ষকদের সামনে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ঘাতকরা একে অপরকে জড়িয়ে গালে

চুমো খেয়ে উল্লাস প্রকাশ করলো। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে খুন করলো চাঁপাইনবাবগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা জালালকে। আতঙ্কে ক্ষোভে হতবাক হয়ে গেলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বিচিত্রা অফিসে এসে তাঁরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। সন্তানহারা মা-বাবার ভাইহারা বোনের, স্বামীহারা স্ত্রীর বুকভাঙা হাহাকার আর আহাজারি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে একাত্তরের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর মুখোমুখি। আমরা কোন দেশে বাস করছি? কোন সময়ে বাস করছি? স্বজন হারার কান্নার মাতম শুনে, মুখচেনা ঘাতকদের প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখে মনে হয় না আমরা কোন স্বাধীন দেশে বাস করছি। এ যেন হানাদার বাহিনী কবলিত যুদ্ধকালীন সেই বাংলাদেশ—জামাতের ঘাতক বাহিনী আলবদর আর আলশামসরা রাতের অন্ধকারে এসে নিয়ে যাচ্ছে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মিরপুর, মোহাম্মদপুর আর রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। একাত্তরে তবু কিছু সংকোচ ছিলো ঘাতকদের, আসতো রাতের অন্ধকারে হত্যার আগে চোখ বেঁধে নিতো, সাক্ষী রাখতো না কাউকে, এখন তারা হত্যা করে প্রকাশ্য দিবালোকে, শত শত মানুষের সামনে—দেখে মনে হয় এই ফ্যাসিস্ট বাহিনীর জন্য দেশে কোন আইন নেই।

আক্ষরিক অর্থেই জামাতীরা ফ্যাসিস্ট

এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের বুলি কপচিয়ে, বিরোধী দলের জোটগুলোর ছাতার আড়ালে গুটি গুটি পায়ে যে জামাতীরা এ পর্যন্ত এসেছে, তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মিত্র ভেবে ভুল করেছিলেন ২২ দলের অনেক ঝানু রাজনীতিবিদও। মাত্র ৪ বছর আগে ২২ দলের বড় বড় নেতাদের প্রায় সবাই জামাতকে তাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে মিত্র ভেবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিচিত্রার সাক্ষাৎকারে। এদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের জন্য আশার কথা এই যে, এখন তাঁদের অধিকাংশই জামাতের ঘাতক, ফ্যাসিস্ট চেহারাটি চিনে ফেলেছেন। আর এই চিনে ফেলার কারণে ইদানীং আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে তাদের প্রকৃত চেহারা। আর রাগঢাক নেই; তাদের কথিত স্বৈরাচারী সরকারের কেশাগ্রটি স্পর্শ করতে না পারলেও সেই সরকারের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করছে, মহা উল্লাসে তাদের কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করছে জামাতীরা। ইতিহাসে দেখেছি ফ্যাসিস্টরা ঠিক এভাবেই ক্ষমতায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়।

ইতিহাসের এই শিক্ষাই জামাতীদের দিয়ে গেছেন তাদের মহাগুরু মওলানা মওদুদী। তিনি তার রাজনৈতিক দর্শন ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—'যে সব জামাত কোন শক্তিশালী আদর্শ ও সজীব সামগ্রিক (ইজতেমারী) দর্শন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তারা সব সময়ই সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়। এবং সংখ্যালঘিষ্ঠতা সত্ত্বেও বিরাট বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠকে শাসন করে থাকে।।...মুসলিনির ফ্যাসী পার্টির সদস্য হলো মাত্র চার লাখ এবং রোমে মার্চ করার সময় ছিলো মাত্র তিন লাখ। কিন্তু এই সংখ্যালঘিষ্ঠরা সাড়ে চার কোটি ইটালীয়দের উপর ছেয়ে গেছে। এই অবস্থা জার্মানীর নাজী পার্টিরও।' * আমাদের জামাতী ইসলামীরাও ঠিক এভাবে ক্ষমতায় যেতে চায়।

* উদ্ধৃতি : 'মওদুদী চিন্তাধারা' মওলানা আবদুল আউয়াল, ঢাকা ১৯৬৯

কারণ তাদের গুরু মওদুদীই উপরোক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন 'জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য—এমতাদর্শের আমি সমর্থক নই।' শুধু এই নয় আরেকটি গ্রন্থে আরো স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন '.....এ জন্যই আমি বলি যে সব পরিষদ কিংবা পার্লামেন্ট বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এসবের সদস্য হওয়া হারাম এবং তার জন্য ভোট দেওয়াও হারাম।' অথচ গত পার্লামেন্টেই এই হারামীপনা জামাতের নেতারা করেছেন এবং দেশের সরল মানুষদের কাছে ভোট চেয়ে তাদের কথিত হারাম কাজে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করেছেন। একমাত্র জামাত ও শয়তান ছাড়া আর কেউ এভাবে হারামের প্রতি বনিআদমদের প্রলুব্ধ করতে পারে নি।

বিচিত্রার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিএনপির নেতারা বলেছেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য জামাতকে এখনো তাঁরা মিত্র মনে করেন। বরং এ ক্ষেত্রে তাঁরা শত্রু মনে করেন আওয়ামী লীগকে। বেগম খালেদা জিয়া গত কয়েক মাস যাবৎ সরকারের বিরুদ্ধে যত না বলেছেন তার চেয়ে বেশি বলেছেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। অথচ মাত্র এক বছর আগেও তাঁর সঙ্গে শেখ হাসিনার বৈঠক এবং আন্দোলনের যুগপৎ কর্মসূচী ঘোষণা—সরকার বিরোধী আন্দোলনে নুতন মাত্রা যোগ করেছিলো। আন্দোলনের এই নতুন গতিবেগ স্বাভাবিকভাবেই জামাতীদের হতাশ করেছে। তারা প্রথমে পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করে আওয়ামী লীগকে বেকায়দায় ফেলেছে, তারপর কৌশলে খালেদা জিয়াকে বিচ্ছিন্ন করেছে আন্দোলন থেকে এবং সর্বশেষে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধীদলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক হামলার জন্য আক্রমণাত্মক রণকৌশল নির্ধারণ করেছে। গত কয়েক মাসে সংঘটিত জামাতী ঘাতকদের হত্যাকাণ্ড তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। জামাতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিএনপি শুধু ঘাতকদের হাতকেই শক্তিশালী করেনি, দলের ভেতর আরেকটি বড় রকমের ভাঙ্গনও ডেকে আনছে।

একাত্তরের জন্য জামাত কখনো অনুতপ্ত হয়নি

বিচিত্রার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বি এন পি'র মহাসচিব আব্দুস সালাম তালুকদার বলেছেন—জামাত নাকি স্বীকার করেছে একাত্তরে তারা ভুল করেছিলো। বিএনপির নেতাদের সঙ্গে বিজনে বিশ্রম্ভালাপের মুহূর্তে কোন জামাতী নেতা হয়তো এমন কথা বলতে পারেন কিন্তু এর প্রকাশ্য কোন নমুনা আমরা আজ পর্যন্ত দেখিনি। মাত্র দু'মাস আগে আল-বদর কমাণ্ডার আমিনুল হকের লেখা একটি বই বাজারে বেরিয়েছে। '৭৩ সালে ৪০ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত এই আল-বদর অধিনায়কের বইটির নাম 'আমি আল-বদর বলছি।' নিজের একাত্তরের ভূমিকাটুকু বাদ দিয়ে কারাবাসের স্মৃতির কথা তিনি লিখেছেন এই গ্রন্থে। একাত্তরের কথা না বললেও সাজার মেয়াদ দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান কি ছিলো, যেখানে শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী অপর আল-বদর খালেক মজুমদারের শাস্তি হয়েছিলো মাত্র ৭ বছর। বইটির প্রচ্ছদে স্টেনগান ধরা উদ্ধত হাতের ছবি। স্টেনগানের উপর আরবীতে লেখা 'ওয়াদুলাহম মাস্তাফাতুম মিনকুওয়াতিন।' সরল বাংলা তর্জমা হচ্ছে 'সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে তাদের শত্রুতা

জনতার হাতে লাঞ্ছনা ঃ '৮১-র ১ জানুয়ারী গোলাম আযম বায়তুল মোকাররমে প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে শহীদ দুই বাংলাদেশীর জানাজা পড়তে এলে উপস্থিত নামাজীরা তাঁকে জুতোপেটা করেন।

করে।' এই বইয়ের ৮৫ পৃষ্ঠায় তিনি একাত্তরে তার তৎপরতা সম্পর্কে শুধু এটুকু বলেছেন, 'আমি জেনে শুনে ইমানের দাবিতে এ কাজ করেছি। আমি এ জন্য অনুতপ্তও নই ক্ষমাপ্রার্থীও নই।'

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জামাতীরা পাক-হানাদার বাহনীর দোসর হয়ে সারা দেশে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলো সেই সময়ের প্রতিদিনের খবরের কাগজে তার বিবরণ পাওয়া যাবে। একাত্তরে যা ছাপা যায়নি বাহাত্তরে ছাপা হয়েছে। এই নয় মাস তারা মুক্তিযোদ্ধাদের 'দুষ্কৃতকারী' 'জারজ সন্তান' 'ভারতের চর' বলে আখ্যা দিয়ে নির্মূল করার আহবান জানিয়েছে এবং যেখানে পেরেছে, নির্মূল করেছে। ধর্ষণ ও লুন্ঠনকে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছে। এর জন্য পরে কখনো তাদের লজ্জিত বা অনুতপ্ত হতে দেখা যায়নি। বরং '৮০ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থ ও রাজনৈতিক সমর্থনের জোরে পায়ের নিচে একটু মাটি খুঁজে নিয়ে বলা শুরু করেছে, '৭১-এ আমরা ভুল করিনি।'

এটা ঠিক যে '৮১তে প্রতিরোধও ছিলো প্রবল। '৭৮-এর ১১ জুলাই অসুস্থ মাকে দেখার বাহানায় পাকিস্তানের নাগরিক গোলাম আযম তিন মাসের ভিসা নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। এসেই তিনি পাসপোর্ট ভিসা ফেলে দিয়ে জামাতে ইসলামকে সংগঠিত করার কাজে ঝাঁপ দিলেন। প্রথম দিকে অতিথি হিসাবে জামাতীদের কয়েকটি পুনর্মিলনী সভায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন বটে তবে জনসভা করতে গিয়ে জনতার রুদ্ররোষের শিকার হয়ে তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিলো।

'৮১-র ১ জানুয়ারী বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত প্যালেস্টাইনের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ দু'জন বাংলাদেশী নাগরিকের জানাজায় তিনি ঢুকে পড়েছিলেন এক ফাঁকে, জানাজা শেষ হওয়া মাত্র উপস্থিত নামাজীরা তাঁকে চিনে ফেলেন এবং শুরু হয় জুতোপেটা। সেবারও কোনরকমে পালিয়ে বাঁচেন তিনি।

জনতার হাতে বার বার লাঞ্ছিত হয়ে জামাত নেতা গোলাম আযম তাঁর শ্বাপদ বাহিনীকে লেলিয়ে দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে। জামাতের অস্থায়ী আমীর আব্বাস আলী খান ২৯ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে আবার বললেন, '৭১-এ আমরা ভুল করিনি।' গোলাম আযমও পত্রিকান্তরে সাক্ষাৎকারে বললেন, '৭১-এ যা ঠিক মনে করেছি তাই করেছি, এখনো তাই করবো।'

একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে জামাতের অবদান

একাত্তরের জামাত কোন কাজটিকে ঠিক মনে করেছিলো এ নিয়ে নিশ্চয়ই কারো মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। '৭১-এ তারা ঠিক মনে করেছে, গোটা মানবজাতির ইতিহাসে স্বল্পতম সময়ে সংঘটিত বিশালতম, নৃশংসতম গণহত্যাকে। বাংলাদেশের ৩০ লক্ষ নিরীহ মানুষের হত্যা, কয়েক লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষণ, হাজার হাজার ঘর-বাড়ি জনপদ জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়া, কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুট করার সিংহভাগ কৃতিত্ব জামাতকে দেয়া উচিত। কারণ পাক-হানাদার বাহিনীর সঙ্গে এদেশের মাটির কোন সম্পর্ক ছিলো না, পাক-সামরিক জান্তা এ মাটির সন্তান ছিলো না, তারা সামরিক শক্তি যোগান দিয়েছিলো আর জামাত যোগান দিয়েছিলো নৈতিক ও আদর্শিক শক্তির, যার বলে বলীয়ান হয়ে হানাদার বাহিনী বিশালতম এই ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পেরেছিলো।

মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধের মুখে পাক হানাদার বাহিনীর মনোবল কখনো মুহূর্তের জন্য ভাঙতে দেননি জামাত নেতারা। জামাত নেতা গোলাম আযম '৭১-এর ১৮ জুন লাহোর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের 'পূর্ব পাকিস্তানী পরিস্থিতি' সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সেখানে এখনো কিছু দুস্কৃতকারী বিভেদ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং বিশৃংখলা পরিস্থিতিকে দীর্ঘায়িত করা।....এই সব বিশৃংখলাকারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে নকশালপন্থী ও বামপন্থী শক্তি।.....দুস্কৃতকারীরা শুধু তাদেরই উপর হামলা চালাচ্ছে যারা পাকিস্তানের প্রতি একান্ত অনুগত।' (দৈনিক পাকিস্তান ১৮ জুন ১৯৭১) পাকিস্তানের প্রতি এই একান্ত অনুগতদের সিংহভাগই জামাতী একথাও অধ্যাপক সাহেব পরে বলেছেন।

২২ জুন '৭১-এর দৈনিক পাকিস্তানের একটি সংবাদে বলা হয়েছে, 'পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচেষ্টা নির্মূল করে দেয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর প্রফেসর গোলাম আযম পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীকে গভীর শ্রদ্ধা জানান। গতকাল এখানে জামাতের ফাতেমা জিন্নাহ রোড অফিসে এক কর্মীসভায় তিনি বলেন যে, সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ছাড়া দেশকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া থেকে রক্ষা করার অপর কোনই বিকল্প কিছু ছিলো না।'

৭ আগস্ট কুষ্টিয়ায় এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে গোলাম আযম

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানরা যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করায় তাদের ধন্যবাদ জানান ও আল্লার দরগায় শুকরিয়া আদায় করেন। অধ্যাপক গোলাম আযম দুস্কৃতকারীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার এবং রাষ্ট্রবিরোধীদের দমনের উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটিসমূহ ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।' (দৈনিক পাকিস্তান ৮-১২-'৭১)

২৩ আগস্ট '৭১ তারিখে লাহোরে জামাতের আমীর এক সভায় বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা ভারত ও তার চরদের ষড়যন্ত্রের পরিণতি।'

'জামাতে ইসলামীর প্রাদেশিক আমীর দেশের বর্তমান সংকটের জন্য দায়ী গলাবাজরা যাতে ভবিষ্যতে আর কখনো মাথা তুলতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।.....অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে আমীর সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করেন যে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা ভারত ও তার চরদের ষড়যন্ত্রেরই ফল।

'পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী দৃষ্টিসম্পন্ন সংস্থাগুলোর কর্মীরাই ভারতীয় চরদের প্রধান শিকারে পরিণত হচ্ছে। তিনি বলেন যারা জামাতে ইসলামীকে দেশপ্রেমিক সংস্থা নয় বলে আখ্যায়িত করেছে তারা হয় জানেন না বা স্বীকার করার সাহস পান না যে ইসলামী আদর্শ তুলে ধরা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরোধিতা করার জন্যই কেবল পূর্ব পাকিস্তানে জামাতের বিপুল সংখ্যক কর্মী দুস্কৃতকারীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে।' (দৈনিক পাকিস্তান ২৪-৮-'৭১)

৩১ আগস্ট '৭১ হায়দরাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম আযম বলেন, 'বর্তমান মুহূর্তের আশু প্রয়োজন হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক ও ইসলামপ্রিয় লোকদের হাত শক্তিশালী করা। তিনি আরো বলেন, এসব লোক পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে এবং দুস্কৃতকারীদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ ও বিদ্রোহীদের দমনে সেনাবাহিনী ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেছে।।.....তিনি দেশকে খণ্ড বিখণ্ড হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে, পাকিস্তানের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে।' (দৈনিক পাকিস্তান ১-৯-৭১)

২৬ সেপ্টেম্বর '৭১ দৈনিক পাকিস্তানের এক সংবাদে বলা হয়েছে, 'পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, জামাতে ইসলামীর কর্মীরা মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে রাজী নয়। তিনি বলেন, জামাত কর্মীরা শাহাদৎ বরণ করে পাকিস্তানের দুশমনদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা মরতে রাজী তবুও পাকিস্তানকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে রাজী নয়।.....তিনি বলেন, সারা প্রদেশ সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পরও যে কয়েক হাজার লোক শহীদ হয়েছেন তাদের অধিকাংশ জামাত কর্মী।

'আইন সভার মাধ্যমে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়নি সেই মন্ত্রীসভায় জামাতের যোগদান সম্পর্কে তিনি দলের নীতির ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন বর্তমানে প্রদেশের জনসংখ্যার শতকরা যে ২০ ভাগ লোক সক্রিয় রয়েছে তারা দু'ভাগে বিভক্ত। একদল পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়, আরেক দল পাকিস্তান রক্ষার জন্য

প্রাণ দিতে প্রস্তুত। জামাতে ইসলামী শেষোক্ত দলভুক্ত।

'তিনি বলেন জামাতের যে দু'জন সদস্য মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছেন তাদেরকে দলের পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে।

'অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে জামাতে রাজাকার বাহিনীতে লোক পাঠিয়েছে শান্তি কমিটিতে যোগ দিয়েছে, সেই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রীসভায় লোক পাঠিয়েছেন।' তিনি বলেন, এই মন্ত্রীপদ ভোগের বা সম্মানের বস্তু নয়। আমরা তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি।'

'২৯ সেপ্টেম্বর গভর্নরের নবনিযুক্ত মন্ত্রীসভার সদস্যদের সম্মানে শান্তি কমিটি কর্তৃক আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক গোলাম আযম। জামাত নেতা শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খান এই সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন যে, পাকিস্তান আজ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেশের সকল জনগণের। ইসলামের জন্য অর্জিত পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করার কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহবান জানান।.....

'সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন যে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করা যাবে না। কারণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও জনগণ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে বদ্ধপরিকর। এছাড়া তথাকথিত স্বাধীন বাংলাও কায়েম হবে না। কারণ দুস্কৃতকারীরা সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে পারবে না। আর মিসেস ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন বাংলা কায়েম করে দিতে পারবে না। স্বাধীন বাংলা সম্পর্কে জনমনে নৈরাশ্য সৃষ্টি করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।' (দৈনিক পাকিস্তান ৩০-৯-'৭১)

১৬-১০-'৭১ তারিখে বায়তুল মোকাররমে এক 'গণজমায়েতে তথাকথিত বাংলাদেশের ভূয়া শ্লোগানে কান না দিয়ে পাকিস্তানকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রাদেশিক জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম জনসাধারণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন.....জামাত নেতা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান দুর্দশার জন্য মূলত দায়ী নির্বাচন থেকে পালিয়ে আসা মওলানা ভাসানীর পার্টি সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টরা তাদের ছাত্রদল ও কর্মীবৃন্দ।.....জনসাধারণ শেখ মুজিবকে ভোট দিয়েছিল এবং শেখ মুজিব স্বাধীনতার কথা বলেননি।' (দৈনিক পাকিস্তান ১৭-১০-'৭১)

১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, মুক্তিযোদ্ধারা যখন সমস্ত রণাঙ্গণে পাক-হানাদার বাহিনীর উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে মরণপণ যুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য, সেই সময় জামাতের আমীর সাহেব 'তথাকথিত বাংলাদেশের ভূয়া শ্লোগানে কান না দিয়ে পাকিস্তানকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের কাছে আহবান জানাচ্ছেন।' সরকারের কাছে আহবান জানাচ্ছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের (ওদের ভাষায় 'ভারতীয় চর' দুস্কৃতকারী') বিরুদ্ধে আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। ২৫শে মার্চের নারকীয় ধ্বংসলীলার জন্য পাক-হানাদার বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর পরও গোলাম আযমরা মনে করেছেন আরও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

পাক সামরিক জান্তার এ ধরনের গোলামীর জন্যই বুঝি আমীর সাহেবের মুরুব্বীরা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'গোলাম আযম'। যার আক্ষরিক অর্থ 'শ্রেষ্ঠ গোলাম।' তাঁর মতো সার্থকনামা ব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীদের অভিমত

জামাতের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে দেশের বিরোধী জোটের প্রধান নেতারা এবং শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা বর্তমানে কি ভাবছেন এ বিষয়ে আমরা কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। একমাত্র বিএনপির দুই নেতা ছাড়া অন্য সবাই জামাত শিবিরকে প্রতিহত করার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

জামাত শিবিরের সাম্প্রতিক পুনরুত্থান এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো সম্পর্কে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'এটা নতুন কিছু নয়। জামাতীরা '৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যা এবং হানাদার পাকবাহিনীকে মদদ দিয়ে নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ চালানো, নারী ধর্ষণ গৃহে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি কাজে লিপ্ত ছিলো। মিত্রবাহিনীর সহায়তায় যে মুহূর্তে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলো, তখনই এরা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। জামাত-শিবিরে যাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাদের ঘাতক হিসাবেই তৈরি করা হয়। পবিত্র ইসলামের নাম ভাঙিয়ে এরা রাজনৈতিক ফায়দা লোটে। ইসলাম শান্তির ধর্ম, সাম্যের ধর্ম, ইসলাম কখনো ঘাতকদের ধর্ম হতে পারে না। তারা ধর্মের দোহাই পাড়ে শুধুমাত্র আমাদের ধর্মপ্রাণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। সর্বত্র এরা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে কেউ কেউ এদের আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারছে না। প্রশ্ন দেখা দেয় এরা এত প্রচুর পরিমাণ অর্থ কোত্থেকে পায়? এত অস্ত্র কোত্থেকে আসে? সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী এরা অস্ত্র, এবং ড্রাগ চোরাকারবারীর সাথেও যুক্ত। এরা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাস করে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এরা কখনোই সহায়ক হতে পারে না। বরং এরা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এরা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কর্মী হত্যা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে ফ্রিডম পার্টি ও বিএনপি এদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদেব কর্মীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। চট্টগ্রাম, রংপুর, সিলেট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ বাকশাল, জাসদ ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যান্য সংগঠনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের উপর তারা হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করেছে, ডান হাত কেটে দিয়েছে—সভ্য পৃথিবীতে যার নজির নেই। এরা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় বলে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তির উপর এরা সর্বাত্মক হামলা চালাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক থেকে এরা লক্ষ লক্ষ টাকা পাচ্ছে। বাইরে থেকে টাকা আসছে। অথচ সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব। '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। বঙ্গবন্ধু দালালদের ক্ষমা করেছিলেন এটা সত্যি, কিন্তু যারা হত্যা করেছিলো, ধর্ষণ

করেছিলো, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছিলো বঙ্গবন্ধু তাদের ক্ষমা করেন নি। তাদের ক্ষমা করেছেন জিয়াউর রহমান। তিনি ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে তাদের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে কারণে আমরা আজ এই দুর্ভোগের সম্মুখীন।'

জামাত-শিবিরের এই তৎপরতা প্রতিরোধ করা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, 'এদের স্বরূপ দিনের পর দিন উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। বহু মায়ের কোল খালি হচ্ছে। এদেশের স্বাধীনতার সপক্ষশক্তি ও গণতন্ত্রকামী জনগণ ক্রমশ এদের সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। তাদের প্রতি আমাদের আহবান, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এদের প্রতিহত করি। এরা মসজিদকে নিজেদের রাজনীতি প্রচারের ঘাঁটি বানিয়েছে। মসজিদ কমিটির সদস্যদের আমি আহবান জানাবো এই ঘাতকদের মসজিদের পবিত্রতা কলুষিত করতে দেবেন না। আমাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ এদের ধ্বংসকে অনিবার্য করে তুলবে।

জামাত-শিবিরের সাম্প্রতিক সশস্ত্র তৎপরতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আমীর হোসেন আমু বলেন, 'এটা তাদের মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনার অংশবিশেষ। '৪৭ সনের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের উদ্ভবকে জামাত নেতা মওদুদী 'নাপাকিস্তান' আখ্যায়িত করলেও পাক আমলে জামাত পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির কায়েমী স্বার্থ রক্ষার রাজনীতিতেই ব্যাপৃত ছিল। '৭১-এর এই পরাজিত শক্তির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কবর রচিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট কালো রাতে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে তারা এদেশে পুনরায় রাজনীতি করার সুযোগ পায়। '৭৫-এর আগস্টের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা তাদের পাকিস্তানী ধ্যান-ধারণার রাজনীতির প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হয়। একই প্রক্রিয়ায় আজ তারা গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির ওপর সন্ত্রাসী তৎপরতা জোরদার করার প্রয়াস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক চক্র এবং তাদের এদেশীয় এজেন্টরা '৭৫-এর পর একদিকে বিভিন্ন সরকার গঠন করে অন্যদিকে আন্দোলনে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য জামাতের মতো প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে বিরোধী রাজনীতিতে রেখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। এই বিভ্রান্তিকে চিহ্নিত করার জন্য এবং স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত করার জন্য আমরা সাত দফা দিয়েছি। এই সাত দফার ভিত্তিতে স্বৈরাচারের সঙ্গে সঙ্গে মৌলবাদকে হটানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছেন। এদেশে প্রতিক্রিয়াশীল জামাতচক্রের ক্রমস্ফীত পেশীশক্তির ব্যাপারে সকল দেশপ্রেমী শক্তিকে এখনি সচেতন হতে হবে। জামাতের গণধিকৃত এবং গণবিরোধী চরিত্র উদঘাটনের মাধ্যমে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জামাত-শিবিরকে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্তের ব্যাপারে সকল গনতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে আন্তরিক ঐক্যমতে পৌঁছতে হবে।'

রাজনৈতিক কর্মী এবং ছাত্রদের উপর জামাত-শিবিরের বর্বরোচিত হামলাকে পাঁচদলীয় নেতা রাশেদ খান মেনন জামাত-শিবির চক্রের সামগ্রিক গণবিরোধী পরিকল্পনার একটি অংশ বলে মনে করেন। বিচিত্রার নিকট দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন— 'গত ছ' বছরের আন্দোলনে গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার যে বিকাশ ঘটেছে তাতে প্রতিক্রিয়াশীলরা ভীত হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক মোকাবেলায়

অসমর্থ এসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাই সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রগতিশীলদের পর্যুদস্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কৌশলগতভাবে বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনের গরীব মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক অসচ্ছলতার সুযোগ তারা গ্রহণ করে। এসব ছাত্রদের নানা প্রলোভন দিয়ে এবং তাদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট উসকে দিয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরে ঢোকানো হচ্ছে। সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে শিবিরকে মূলত ফ্রন্ট হিসেবে রেখে হেমায়েত বাহিনী, কেরামত বাহিনীর মতো ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাহিনী দিয়ে জামাত তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে জামেয়া বিল্লিং, নাফ নদীর পাশে উখিয়ায় এবং রাজশাহীর কিছু অঞ্চলে জামাতের এ ধরনের ট্রেনিং সেন্টারগুলো রয়েছে। বিরোধী রাজনীতির অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তারা ঠিক এ সময়টায় বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে। বিগত সরকার বিরোধী আন্দোলনে স্বৈরাচারের সঙ্গে সঙ্গে মৌলবাদকে হটানোর দৃঢ় সংকল্প আমাদের ছিলো। এই আন্দোলনের চূড়ান্ত আঘাত জামাত শিবিরের ওপরেও পড়তো। বর্তমান বিরোধী রাজনীতির অনৈক্যের সুযোগে তাই তারা আমাদের প্রগতিশীল কর্মীদের টার্গেট করে পর্যুদস্ত করার হীন প্রচেষ্টায় নেমেছে। রাষ্ট্রধর্ম বিল পাসের পর তারা তাদের কর্মকাণ্ডের আদর্শগত ভিত্তিও পেয়ে গেছে। এ কারণে গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর বারবার সন্ত্রাসী হামলা চালানো তাদের জন্য সহজতর হয়ে পড়েছে।'

জনাব মেনন মনে করেন মৌলবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া দলগুলোর অস্পষ্ট ভূমিকা এবং মৌলবাদীদের প্রতি সরকার ও বিদেশী শক্তির প্রত্যক্ষ সমর্থনের কারণে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাচ্ছে না। তিনি বলেন 'যদিও আওয়ামী লীগ ঐতিহ্যগতভাবে জামাত বিরোধী তবুও আদর্শগত ভিত্তির দৃঢ়তার অভাবে তারা জামাতকে মোকাবিলা করতে পারছে না। সুচতুরভাবে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট কাজে লাগিয়ে জামাত এক ধরনের আদর্শিক ভিত্তি পেয়ে গেছে। '৮৬-এর সংসদ নির্বাচনের পূর্বে তারা ১৫ দলের সমান্তরাল কর্মসূচী গ্রহণ করে একটি সহনশীল ইমেজ তৈরিরও চেষ্টা চালায়। এ ব্যাপারে আমরা অপোজ করলেও আওয়ামী লীগের অনাগ্রহের কারণে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী কিছু করা যায় নি। আওয়ামী লীগ জামাতের চিহ্নিত ঘাতকদের '৭১-এর পর ক্ষমা করেছিল। '৮৬-এর নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ ও জামাতের একই সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে এক ধরনের সখ্যতা বা মিত্রতা দেখা দেয়। এই মিত্রতা পরবর্তী সময়ে সংসদেও তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। অন্যদিকে '৭৫-এর পর বিএনপি জামাতকে রাজনৈতিকভাবে পূনর্বাসিত করে। ফলে আদর্শগত বা রাজনৈতিকভাবে জামাতকে অপোজ করা পরবর্তীতে তাদের জন্য দুষ্কর হয়ে পড়ে। এই রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার জন্য জামাত-শিবিরের নৃশংসতার বিরুদ্ধে তারা কিছু বলতে চায় না। পরবর্তীতে তিন জোটের যুগপৎ আন্দোলনের সময়ও বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর এসব সীমাবদ্ধতার কারণে জামাতীদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।'

জনাব মেনন বলেন, 'জামাত-শিবিরের আর্থিক ভিত্তি গঠিত হয়েছে পেট্রো-ডলারের সাহায্যে। এক সময় কিছু দুতাবাসের ভিসা ফি-এর একটি নির্দিষ্ট অংশ জামাতের ফাণ্ডে দিয়ে দেয়া হত। বর্তমানে বিদেশী শক্তি বিদেশী দুতাবাসগুলো, ইসলামী ব্যাংক, ইবনে সিনা ট্রাস্টের মতো জামাতী সংগঠনগুলোর সঙ্গে সরাসরি

সম্পর্ক রাখছে। সেসব দেশে ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট চার্জ-এর একটি অংশ জামাতকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই বিদেশী শক্তির আনুকূল্য ছাড়াও সরকারী প্রশাসনের সমর্থন জামাতের সাংগঠনিক ভিত্তিকে পরিপুষ্ট করছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে জাসদ কর্মী আমিরুল ইসলামকে হত্যা এবং এ ঘটনার পর এক ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার সত্ত্বেও একজন বাদে আটককৃত সকল জামাতে কর্মীকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। উপরন্তু জামাতের দায়েরকৃত মিথ্যে মামলায় পাঁচদল কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে সিরাজগঞ্জে সিলেটে। সিলেটে আমাদের তিনজন কর্মীকে জামাত-শিবির হত্যা করে। এ কাজের জন্য তারা মিরপুর থেকে মাথাপিছু ১৫ হাজার টাকা দিয়ে পাঁচজন পেশাদার গুণ্ডাকে ভাড়া করে নিয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে প্রশাসনের নির্লিপ্ততা তাদের আগ্রাসী থাবাকে উৎসাহিত করছে বলে আমি মনে করি।'

জামাত-শিবির প্রতিরোধে দলীয় ভূমিকা গ্রহণ প্রসঙ্গে জনাব মেনন বলেন—'ওয়ার্কার্স পার্টি এবং পাঁচদল গণজমায়েত এবং প্রচারণার মাধ্যমে জামাতকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মবেত্তাদের দিকে মওদুদীবাদের আসল চেহারা উন্মোচনের চেষ্টাও চলছে। তবে আমরা মনে করি এ ব্যাপারে ৮, ৭, ৫ দল বিভিন্ন পেশাজীবী এবং ছাত্র সংগঠন এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের প্রয়োজন রয়েছে। এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ার লক্ষ্যে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন জামাতের আমীর আব্বাস আলী খান কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে বলেছিল '৭১-এর মতো ব্যবস্থা নেয়া হবে। পরবর্তীতে আব্বাস আলী খান এই বক্তব্য অস্বীকার করলেও আজ শিবিরের মুখে শ্লোগান শোনা যাচ্ছে '৭১-এর হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার।' জামাত-শিবিরের এই ক্রমবর্ধমান তৎপরতাকে প্রতিরোধ সকল দেশপ্রেমী মহলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং তা এখনি।'

গোলাম আযমকে জামাতের আমীর ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি বলেন— 'গোলাম আযমকে এ সরকারের পার্লামেন্টেই স্পষ্টভাবে পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পাকিস্তানের নাগরিক বাংলাদেশের একটি দলের আমীর কিভাবে হতে পারে? এ ব্যাপারে আমরা সরকারের সুস্পষ্ট বক্তব্য আশা করছি।'

৮ দলীয় নেতা সিপিবি সম্পাদক সাইফুদ্দিন মানিক বলেন, 'দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তির ওপর জামাত শিবির চক্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, চাঁপাইনবাবগঞ্জে তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতায় আবারো প্রমাণ হয়েছে, মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও তারা আসলে ফ্যাসিস্ট শক্তি। বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে তার আর্মস-গ্যাং নিয়ে দখল প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের মনোভাব হচ্ছে এসব শিক্ষাঙ্গনে অন্য কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না। আগ্রসী থাবা এবং জঙ্গী মনোভাব দ্বারা তারা বোঝাতে চাচ্ছে বাংলাদেশটা তাদেরই—অন্য কেউ এখানে থাকতে পারবে না। সেদিক দিয়ে বিচার করলে এটা গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধ চেতনার জন্য অত্যন্ত বিপদজনক।'

জনাব মানিক বলেন—'স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ পক্ষশক্তির অনৈক্যের কারণে জামাত-শিবিরের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাচ্ছে না। জামাত প্রকাশ্যে

সরকার বিরোধী ভূমিকা নিলেও গোপনে সরকারী যোগসাজশের মাধ্যমে তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর তাদের আঘাত সরকারের হাতকেই শক্তিশালী করছে। যদিও সরকারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই তবু তাদের—ভেরী এ্যাকশান গোজ ইন কেভার অব দ গভর্নমেন্ট। বিদেশী নাগরিক গোলাম আযমের এদেশে অবস্থানের মধ্য দিয়েও সরকারের সঙ্গে জামাতের যোগসাজশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সরকারী নমনীয় নীতির কারণেই গোলাম আযম এদেশে থাকতে পারছে।'

জনাব মানিক বলেন—'জামাত শিবিরকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো যে সামাজিক রাজনৈতিক কারণে গ্রো করেছে সেগুলো চিহ্নিত করে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের প্রতিহত করতে হবে। স্বৈরাচারের সঙ্গে সঙ্গে মৌলবাদী শক্তিকে উৎখাতের তাৎপর্য সবাইকে বুঝতে হবে।'

বিএনপি মহাসচিব সালাম তালুকদার গত আগস্ট মাসে জামাত-শিবির বিরোধী বিবৃতি দিয়ে আলোচিত হয়েছিলেন। জামাতের বিরুদ্ধে তার পূর্বের কঠোর অবস্থানের প্রেক্ষিতে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তার বর্তমান অবস্থানচ্যুতির কথা জানা যায়।

সালাম তালুকদার বলেন, 'ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের জন্য এককভাবে কাউকে দায়ী করা মুশকিল। ছাত্রশিবি যেমন বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে তেমনি ছাত্রলীগের (সু-র) সঙ্গে ছাত্রলীগ (মু-না) ছাত্রমৈত্রীরও সংঘর্ষ হয়েছে। তাই এসব সংঘর্ষের একক দায়দায়িত্ব কোন সংগঠনের উপর বর্তায় না। এর জন্য যারাই দায়ী তারা স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যহত করছে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টির পেছনে অতীতে ছাত্ররা যে ভূমিকা পালন করে ছিল এ ধরনের সংঘর্ষ চলতে থাকলে ছাত্রসমাজ সেই ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন। অন্তত স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের স্বার্থে এই সংঘর্ষ অনতিবিলম্বে পরিহার করা প্রয়োজন।

জনাব তালুকদার বলেন—'৭১ সম্পর্কে জামাত এখন বলছে সে সময় তাদের ভূমিকা সঠিক ছিল না। ৭১-এ ভুল করলেও পরবর্তীতে বাংলাদেশকে তারা মেনে নিয়েছে। তারা ২১ ফেব্রুয়ারী পালনও করছে। এখন আমি যেহেতু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাই মৌলবাদী বা অন্য কোন রাজনীতি প্রতিরোধের কথাই আমি ভাবি না। জনগণ না চাইলে এসব সংগঠন টিকে থাকবে না। সব দলই জনগণের কাছে যায়, জনগণই রাজনীতির মোক্তার। জনগণ যদি ভোট দিয়ে জামাত বা শিবিরকে ক্ষমতায় বসায় তাহলে সেই জনরায়কে মেনে নেয়ার বিকল্প নেই।

গোলাম আযম প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'কোন বিদেশী নাগরিক যতক্ষণ না পর্যন্ত এদেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন না করবে এবং সরকার তা অনুমোদন না করবে ততক্ষণ সে বিদেশী নাগরিকই থাকবে। শুধু গোলাম আযমই নয়, যে কোন বিদেশী নাগরিক ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর এদেশে থাকলে তা ইল্লিগ্যাল স্টে হবে।'

বিএনপি (ওবায়েদ) নেতা কে, এম, ওবায়দুর রহমান বিষয়টিকে বলেন—'বর্তমানে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হানাহানি বৃদ্ধি পেয়েছে। নেতৃত্বের সামগ্রিক ব্যর্থতার কারণেই এই অবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। বিশেষভাবে

জামাতের ছাত্রসংগঠনটির বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়াটা দুঃখজনক। জামাত নেতৃবৃন্দের এ বিষয়টি কন্ট্রোল করা এবং এব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিত।'

জামাত প্রতিরোধ প্রসঙ্গে জনাব ওবায়েদ বলেন— 'আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টার্গেট এ্যানি পার্টি, উই ওয়ান্ট টু ডিথ্রো দিস গভর্নমেন্ট—এটাই এখানকার একমাত্র লক্ষ্য আমাদের। এ মুহূর্তে তাই জামাতের মূল্যায়ন করতে চাই না। তবে এটুকু বলবো এদেশে এক্সট্রিম রাইট বা এক্সট্রিম লেফ্ট কোনটাই গ্রহনযোগ্য নয়। এখন প্রয়োজন ডেমোক্রেটিক ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের। এই লক্ষ্যেই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

বর্তমান পরিস্থিতিতে জামাতের তৎপরতা প্রতিরোধ প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী বদরুদ্দীন উমর বলেন, 'একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে জামাতে ইসলামীর নানা ধরনের তৎপরতা প্রতিরোধের বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে এখন আহবান জানানো হচ্ছে। এই সব আহবান যারা জানাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে পাঁচ দফা ও এক দফা আন্দোলনকারী ১৫ দল ও ৭ দলের শরীকরাও রয়েছেন। জামাতে ইসলামী যে একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং বিগত ৫ দফা ও ১ দফা আন্দোলনের সময় তারা বাহ্যতঃ সামরিক সরকারের এক ধরনের বিরোধিতা করছিলো, এ কারণে তাদেরকে কোন ক্রমেই সামরিক শাসন বিরোধী গণআন্দোলনের সহযোগী ও শরীক হিসেবে দেখা চলে না এবং সেভাবে দেখলে তার পরিনণতি যে বিপদজ্জনক হতে বাধ্য এ কথা আমরা প্রথম থেকেই দৃঢ়ভাবে বলে এসেছি। কিন্তু এ ধরনের কোন যুক্তির তোয়াক্কা না করে সাধারণভাবে ১৫ দল ও ৭ দল এবং বিশেষভাবে তাদের কোন কোন শরীক দল জামাতে ইসলামীকে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। এসবের পরিণতিতে এক দিকে বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলোর একাধিক ঐক্য ফ্রন্টের খোলাখুলি সমর্থন এবং অন্যদিকে পর্দার অন্তরালে সামরিক সরকারের সাহায্য লাভ করে জামাতী ইসলামী এখন তার স্বরূপ রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছে এবং সকল ধরনের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর খোলাখুলি এবং বেপরোয়াভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই হামলা চালানোর মতো শক্তির যোগান একদিকে যেমন তারা পাচ্ছে সরকারী প্রশাসনের একটি শ্রেণির মাধ্যমে, তেমনি অন্যদিকে তারা এই শক্তির যোগান পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্রগুলো আবার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, জামাতে ইসলামীর বর্তমান তৎপরতার ফলে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের মধ্যে তার মর্যাদা মোটেই বৃদ্ধি পাচ্ছে না, উপরন্তু জনগণ তাদেরকে সরকার ও সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট একটি ঠ্যাঙড়ে বাহিনীর সংগঠক হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছেন। ইসলামের নামে যে ধরনের সন্ত্রাসের রাজত্ব তারা বিভিন্ন এলাকায় কায়েম করে চলেছে তাতে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী হিসেবে জনগণের মধ্যে কিছু ত্রাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে তারা পারছে না। জামাতে ইসলামীর বর্তমান গণবিরোধী তৎপরতা কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে তার মূল দিক নির্দেশ পরিস্থিতির এই দিকটির থেকেই পাওয়া যাবে।

'যে সমস্ত রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ইত্যাদি এখন সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং কোন কোন সময় জন সমাবেশে জামাতের তৎপরতা প্রতিরোধের আহবান জানাচ্ছেন তারা প্রায় সকলেই বলছেন যে, স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেই এই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আমরা মনে করি এই ধরনের আহবান এবং কথাবার্তা বিভ্রান্তিকর এবং এক হিসেবে লোক ঠকানো ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ১৯৭১ সালে যারা স্বাধীনতা অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো এবং যারা পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে তার বিরোধিতা করেছিলো সেই সব শক্তির অবস্থান এখন স্বাধীনতার স্বপক্ষ অথবা বিপক্ষ শক্তি হিসেবে নির্দেশ করা চলে না। এর সহজ কারণ এই যে, একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এখন একটি স্বীকৃত ব্যাপার এবং জামাতে ইসলামী যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোন প্রকারে দখল করে তাহলে তাদের অধীনেও এই অর্থে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই থাকবে। ভারত-পাকিস্তান অথবা অন্য কোন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের একত্রিকরণ অথবা কনফেডারেশন ধরনের কোন সম্ভাবনার কথা যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা বাস্তব পরিস্থিতির তোয়াক্কা না করে অবাস্তব চিন্তাই করে থাকেন। অনেকে আবার একাজ করে থাকেন ইচ্ছাকৃতভাবে এবং কৌশলগত কারণে। আসল কথা হলো, বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার স্বপক্ষ বা বিপক্ষ শক্তি বলতে '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন স্বাধীনতার স্বপক্ষ বিপক্ষ শক্তি মোটেই বোঝায় না। এখন স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি বলতে বোঝায় যারা দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সকল প্রকার নাশকতামূলক বৈদেশিক তৎপরতার বিরোধী এবং এই সব সাম্রাজ্যবাদী ও বৈদেশিক শক্তির মূল সহযোগী এবং দেশীয় শ্রমজীবী জনগণের শোষক শ্রেণীগুলোর বিরোধী। এদিক দিয়ে বিচার করলে জামাতে ইসলামী, এরশাদের সামরিক সরকার এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন একই যোগ সূত্রে গ্রথিত। জামাতে ইসলামীর তৎপরতা যদি সত্যি অর্থে এবং সঠিকভাবে প্রতিহত করতে হয় তাহলে এই সমস্ত দেশীয় এবং বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের দেশের সকল ধরনের শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণী সংগ্রাম সঠিকভাবে সংগঠিত এবং দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করেই তা করতে হবে। কারণ জামাতে ইসলামীর এই বর্তমান তৎপরতা মূলতঃ অন্য কোন অমুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়। এ তৎপরতা হল সংখ্যালঘু শোসক-শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী জনগণের উপর এক কৌশলগত আক্রমণ। এ কারণে শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে জনগণের ব্যাপক গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংগঠিত করাই জামাতে ইসলামীর এই তৎপরতা প্রতিরোধের সব থেকে কার্যকর পন্থা। এদিক থেকে বিচার করলে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তির ঐক্যের জিগীর তোলার চেষ্টা যারা করছে তারা জামাতে ইসলামীর বর্তমান তৎপরতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যেমন বাস্তবতঃ কোন অবদান রাখতেই সক্ষম হচ্ছে না, তেমনি অন্যদিকে তারা শোষক শাসক শ্রেণীর পক্ষে দাড়িয়ে জনগণ কর্তৃক জামাতে ইসলামীর তৎপরতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রেই বাধার সৃষ্টি করছে।'

জামাতে ইসলামের তৎপরতা সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের

সভাপতি লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নুর-উজ্জামান বলেন, 'জামাত প্রথমতঃ একটি রাজনৈতিক দলই নয়। সিরাজগঞ্জ জেলা জামাতের সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারেই একথা বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন রাজনৈতিক দলগুলো থেকে জামাত পৃথক বলেই সরকারী কর্মচারী, আমলা, ব্যবসায়ী সকল পেশার লোক জামাত করতে পারে এবং সর্বস্তরে দ্বীন কায়েমের জন্য এটা তাদের ফরজ কাজ। জামাত নেতার এই বক্তব্য থেকে প্রশ্ন আসে জামাত কি ধর্মীয় কোন সংগঠন? আমি মনে করি তাও নয়। বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলে তারা প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী এবং ছাত্র হত্যা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসে সিট দখল নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, উচু পর্যায়ে বিভিন্ন চাকরি লাভের ষড়যন্ত্র করছে, ইসলামী ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসাক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। এসব সন্ত্রাসী এবং বৈষয়িক কার্যকলাপ একটি ধর্মীয় সংগঠনের জন্য কোনভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয় সংগঠন এর একটি চরিত্রও তাদের মাঝে নেই। বরং তাদের কর্মকাণ্ডে এটাই সুস্পষ্ট যে প্রকৃত অর্থে তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সশস্ত্র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশকে রুদ্ধ করার জন্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এই দলটি গঠন করা হয়েছে। প্রগতিশীলদের ওপর তাদের সকল আক্রমণেই তাদের এই উদ্দেশ্যগত দিকটি প্রমাণিত হয়। এক্ষেত্রে আমাদের '৭১-এর কথা ভুললে চলবে না। '৭১-এর এই পরাজিত শত্রুরা প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে গণতান্ত্রিক এবং মুক্তিযুদ্ধপক্ষের শক্তির উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। জনগোষ্ঠীর অধিকতর সচেতন অংশ এবং সকল গনতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ছাত্রসংগঠনগুলোকে তারা তাদের আক্রমণের প্রধান টার্গেট হিসাবে বেছে নিয়েছে। রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেটে তারা তাদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্নস্থানে আঞ্চলিক রাজনীতি স্রোতে গতিবেগ সঞ্চার হলেই, প্রতিবাদী জনতা সোচ্চার হলেই তারা সশস্ত্র হামলায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে।। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মুখে স্বীকার করলেও আজো এরা আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। এদেশে তাদের বর্তমান তৎপরতার চূড়ান্ত লক্ষ্যই হচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠন করা। সেই সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় পতাকা পরিবর্তনের কথাও তারা ভাবছে। জামাতকে আমি মুসলমান সম্প্রদায়ই মনে করি না। এরা ধর্মকে বিকৃত করছে। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের সাথে ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসাবে এরা জেহাদের কথা বলছে। এদের দৃষ্টিতে জেহাদ হচ্ছে শীর্ষ জামাত নেতাদের সকল আদেশ দ্বিধাহীনভাবে মেনে প্রতিপক্ষের হাত-পা কাটা, রগ কাটার মতো নৃশংস কাজ চালিয়ে যাওয়া। না রাজনৈতিক দল না ধর্মীয় সংগঠন না মুসলমান এই সংগঠনটিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে ঘোষণা করার সময় এসেছে আজ।'

জামাত-শিবিরের তৎপরতা প্রতিরোধ প্রসঙ্গে কর্নেল জামান বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে গবেষণা করে আমরা দেখেছি স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বজনহারা এদেশের জনগণ '৭১-এর ঘাতকদের এরা ক্ষমা করেনি। বরং '৭১-এর পর একক ব্যক্তিসিদ্ধান্তে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই ঘাতক চক্রকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলেছেন। এই ক্ষমার সিদ্ধান্তের বৈধতার ব্যাপারে অবিলম্বে গণভোট করে জনমত যাচাই করা হোক। জনগণ যদি বলে

জামাতীদের ক্ষমা করা ঠিক হয়নি তাহলে জামাতীদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যারা তাদের রাজনৈতিক পুনর্বাসন করেছে তাদেরকে এর জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য করতে হবে। আর্থিকভাবে শক্তিশালী এই সংগঠনটির টাকার উৎস চিহ্নিত করতে হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের দায়বদ্ধতা নির্দিষ্ট করতে হবে। তৃতীয়ত আইনের শাসনে বিশ্বাসী প্রতিটি মহলকে তাদের যেই রাজনৈতিক মতবিশ্বাসই থাকুক না কেন জামাতের সন্ত্রাসী তৎপরতাকে রুখে দিতে হবে। রাজনৈতিক পুনর্বাসনের পরও তারা যেসব হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে সেসব ক্ষেত্রে তাদের চিহ্নিত সন্ত্রাসকারীদের বিচারের দাবিতে আইনের অনুশাসনে বিশ্বাসী সকল মহলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির বর্তমান সভাপতি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডঃ আনিসুজ্জামান বলেন—'জামাতের পুনরুত্থান বা সামগ্রিকভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরুভ্যুত্থান বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতিক্ষেত্রের একটি বড় ঘটনা। এটি কেবল রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সহিংস অভিব্যক্তি মানুষের প্রাণও কেড়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মের নামে যারা পাকিস্তানী সামরিক চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন রাজাকার আলবদর আল শামস বাহিনী গঠন করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং পাকিস্তানের ভরাডুবির আগে এদেশের সেরা সন্তানদের সুপরিকল্পিত উপায়ে খুঁজে বের করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন, তারাই আজ জামাতের রাজনীতি করছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এদের অনেকেই দেশ ছেড়ে গিয়ে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব নিয়ে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনেকে আত্মগোপন করেছিলেন, কেউ কেউ গ্রেফতার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এদের ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধীদের প্রাপ্য শাস্তি থেকে রেয়াদ দেন বটে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে আবার ধর্ম নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত ও পাকিস্তানী ভাবাপন্ন করে তোলার সুযোগ দেননি। সেই সুযোগ আসে ১৯৭৫ সালের পর। সংবিধান সংশোধিত করে সেখান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটি বাদ দিয়ে তাদের ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার আইনগত সুবিধা দেয়া হয়। যারা এতদিন আত্মগোপন করেছিলেন, এমনকি পাকিস্তানের নাগরিকরূপে দেশের বাইরে ছিলেন তারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। কেউ কেউ বললেন '৭১-এ তারা ভুল করেননি। বাংলাদেশের মৌলিক আদর্শবিরোধী কাজ তীব্র করে তোলার জন্য নিজেদের সংগঠনকে তারা শক্তিশালী করে গড়ে তুললেন। জনগণের কাছাকাছি আসার জন্য তারা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের ভান করলেন।। আট দল সাত দলের মতো গনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একই ধরণের কর্মসূচী দিতে লাগলেন। সেদিন আট দল সাত দলের অন্তর্ভুক্ত কোন দলই তাদের পুরোনো ভূমিকার কথা তোলেননি—হয়তো সরকার বিরোধী আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণকেই বড় করে দেখা হয়েছিল। কিন্তু এতদিনে এটা স্পষ্ট হয়েছে, জামাতের '৭১-এর রাজনৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন '৮৭ বা '৮৮ সালেও হয়নি। তাদের সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে তারা ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক চরিত্রের অধিকারী, তারা স্বৈরাচারী, তারা ঘাতক। তাদের স্বরূপ আজ প্রকাশ

পাচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষশক্তির বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র অভিযানের মধ্য দিয়ে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ বহুক্ষেত্রেই চোখ কান বুঁজে আছেন কেননা এ সহিংসতা কোনভাবেই সরকারকে স্পর্শ করছে না।

অষ্টম সংশোধনীর পর এদের নৈতিক শক্তি—আসলে তা অনৈতিক শক্তিই, বৃদ্ধি পেয়েছে। এরা বাংলাদেশকে ক্ষুদে পাকিস্তান বানাতে চান—সরকারও যে কখনো কখনো তা-চান না তা নয়। কিন্তু '৭১-এর স্মৃতি যাদের কাছে ঝাপসা হয়ে যায়নি, তারা এই প্রচেষ্টাকে সর্বস্ব দিয়ে প্রতিরোধ করবেন। আজ আমরা ক্ষমতাসীন স্বৈরতন্ত্রকে প্রতিরোধ করতে চাই। সেই সঙ্গে আমরা চাই বাংলাদেশের মূল নীতি অক্ষুন্ন রাখতে, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করতে এবং ধর্মের নামে যারা নুতন করে হত্যাকাণ্ডের সূচনা করছে তাদের প্রতিরোধ করতে। এ জন্য স্বাধীনতা পক্ষের সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।'

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহবায়ক, বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ বলেন, 'বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনৈক্য এবং শাসনক্ষেত্রে অরাজক পরিস্থিতির পরম সুযোগ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বর্তমানে তাদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে গ্রহণ করেছে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির ওপর এ বছর তারা ব্যাপক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। বিদেশী কোন শক্তির বিশেষ চরিত্রের ডলার বা জামাতের এসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত হচ্ছে না তাও বলা যায় না। এদেশে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ বিস্তারের যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে তার একটি অঙ্গ হচ্ছে জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসী উত্থান। কারো কারো ধারণা অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে এদেশের জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে সুচতুরভাবে ব্যবহার করাটাই হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক কৌশল। প্রশ্ন হচ্ছে যে দেশের ১১ কোটির মধ্যে ৯ কোটিই মুসলমান সেখানে ধর্মের নামে রাজনীতির অবকাশ কোথায়? ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিস্তারের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এই একই ব্যক্তিরা কোনদিন পাক আমলে এ জাতীয় ধর্মান্ধতার মাধ্যমে ঠিক এ ধরনের ইসলাম নির্ভর রাজনীতি করেনি, তাহলে কি ধরে নিতে হবে পাকিস্তান আমলে এ দেশে ইসলাম সুরক্ষিত ছিল, এখন নেই? অথচ জনগণতো একই থেকে গেছে। অনেকেই এখন ধারণা করছেন রাজনীতির প্রানকেন্দ্র ঢাকাকে বাদ দিয়ে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে জামাতচক্র যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে তা তাদের পরিক্ষামূলক একটি প্রক্রিয়া। চূড়ান্ত সমরের ক্ষেত্র হিসেবে তারা হয়তো রাজধানীকেই বেছে নিতে পারেন—এই আশংকাই করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'জামাত শিবিরের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসন বহুলাংশে শুধু নির্লিপ্ত ভূমিকাই পালন করেনি তারা অভিযোগকারীদের বক্তব্য শুনতেই রাজী হয়নি। অর্থাৎ সরকার বিরোধী রাজনীতিকে পর্যুদস্ত করার জন্য সরকার এই শক্তির উত্থানকে তাদের জন্য অনুকূল বলে মনে করছে বলেই মনে হচ্ছে। জামাতীদের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হত্যাকাণ্ডের জন্য কেবল

তাদেরই দায়ী করলেই চলবে না, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী শক্তিগুলোর অনৈক্য এবং জামাতের সঙ্গে সরকারের একটি অংশের গোপন যোগসাজশও তাদের সন্ত্রাসী থাবার প্রেক্ষাপট নির্মানে সাহায্য করছে।

জামাত বিরোধীদের লাঞ্ছিত করার একটি জামাতী চক্রান্তের বিবরণ দিতে গিয়ে ফয়েজ আহমদ বলেন, 'গত সেপ্টেম্বরে সিরাজগঞ্জে একজন জামাতীকে কে বা কারা হত্যা করেছে। সেই সময় জাতীয় কবিতা পরিষদের অন্যতম নেতা তরুণ বিপ্লবী কবি মোহন রায়হান ত্রাণসামগ্রী নিয়ে সিরাজগঞ্জে গিয়েছিলেন। ঘটনার দিন শহর থেকে বহু দুরে আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বন্যাদুর্গত মানুষের ভেতর ত্রাণসামগ্রী বিতরণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অথচ জামাতীরা তাদের লোককে হত্যার জন্য মোহন রায়হানকে এক নম্বর আসামী করে থানায় এজাহার দিয়েছে। সিরাজগঞ্জে মোহন রায়হান অতি পরিচিত এবং জনপ্রিয় একটি নাম। এই ঘটনার সঙ্গে তার যে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই, এই মর্মে সিরাজগঞ্জের বিশিষ্ট নাগরিকরা জেলা প্রশাসককে একটি স্মারক লিপি পেশ করেছেন। এই বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে দু'জন জেলা পর্যায়ের জামাত নেতাও আছেন। অথচ জামাতের কেন্দ্রীয় নেতাদের চক্রান্তে মোহন রায়হানকে খুনের মামলার আসামী করা হয়েছে। তাদের এই মিথ্যাচার স্বাভাবিকভাবেই সিরাজগঞ্জের সাধারণ মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।'

জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রতিরোধ সম্পর্কে ফয়েজ আহমদ বলেন, 'আমি মনে করি সমগ্র গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল বিপ্লবী এবং কম্যুনিস্টদের ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে জম্মগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে জোরালো দাবী তুলতে হবে যাতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে সভ্যসমাজের অনুরূপ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে ধর্মভিত্তিক কোন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার বিরুদ্ধে একটি অভিমত মুক্তিযুদ্ধের সময়ই গড়ে উঠেছিল। সকল ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সমরে যোগদান করেছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে ৭১-এর ১১ ডিসেম্বর যশোরের মুক্তাঞ্চলে মুজিবনগরের অস্থায়ী সরকার জনসমক্ষে দেয়া কয়েকটি ঘোষণার দ্বিতীয় ঘোষণাতে বলেছিল মুক্ত বাংলাদেশে কোন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চালু করতে দেয়া হবে না। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা উত্তর প্রথম শাসনতন্ত্রের মূল ধারাগুলোতে একথাই বিধৃত ছিল। এ হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য। এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে জনবিচ্ছিন্ন বিশেষ শক্তিধারী গোষ্ঠী শাসনক্ষমতা দখল করার পর এসব সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পূনর্বাসিত করেছে, মদদ যুগিয়েছে। এর ফলাফল হিসেবে সমগ্র দেশবাসীই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, সেই সঙ্গে এদেশের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের মূল রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক চরিত্রটিও পাল্টে দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে এখনই দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তিকে সচেতন হতে হবে। স্বৈরাচার এবং মৌলবাদকে হটানোর বৃহত্তর আন্দোলন প্রশ্নে তাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী নিতে হবে।'

স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'জামাতের পুনরুত্থানকে বলা যায় বিকৃত পুঁজিবাদ এবং সামাজিক আবিলতা এবং হতাশার

মূর্তিমান ও কুৎসিৎ প্রকাশ। এর সঙ্গে মাস্তানীর কোন তফাৎ দেখি না। একই সামাজিক ব্যাধি দুইভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মৌলবাদ ও মাস্তানীর মতোই প্রগতিবিরোধী, হিংস্র ও ক্ষিপ্ত।

'বাংলাদেশে জামাতের পুনরুত্থান দুঃখজনক বটে তবে অপ্রত্যাশিত নয়। কয়েকটি বাস্তব কারণে এই পুনরুত্থান ঘটেছে। প্রথম কথা এই যে, যে কোন বড় ঘটনারই একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়, বিপ্লবের পরে তাই তৎপরতা চলে প্রতিবিপ্লবের। একাত্তরে বাংলাদেশে বিপ্লব ঘটেনি, তবে বড় ঘটনা ঘটেছে, সেই বড় ঘটনার এক ধরনের বিপরীত প্রতিক্রিয়া জামাতী ক্রিয়াকলাপের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। দ্বিতীয় সত্য এই যে, বাংলাদেশে পুঁজিবাদ শক্তিশালী হচ্ছে। জামাতের মোড়কটা সামন্তবাদী, কিন্তু ভেতরের বস্তু পুঁজিবাদী। বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে এমনকি বাংলাদেশের পক্ষের লোকরাও সবাই এক দৃষ্টিতে দেখেননি। কেউ ভেবেছেন পুঁজিবাদের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হলো; কেউ ভেবেছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি হলো। ঘটনাক্রমে বাংলাদেশে পুঁজিবাদের পক্ষই শক্তিশালী হয়েছে। আদর্শ হিসেবে পুঁজিবাদের যে একটা শক্তি আছে তার নানা প্রমাণ নানা জায়গায় পাই, বাংলাদেশেও পাওয়া যাচ্ছে, জামাতীদের তৎপরতার ভেতর। তবে আদর্শের চেয়েও বড় জোর বস্তুর। কেবল সাম্রাজ্যবাদ নয়, পেট্রোডলারও এসে হাজির হয়েছে। বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে জামাতকে সাহায্য করছে পুঁজির দৌরাত্ম্য ও জামাতের দৌরাত্ম্য অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। তৃতীয়ত, দেশে আজ যে হতাশা বিরাজ করছে তা যেমন সাহায্য করছে মাস্তানীকে তেমনি জামাতকে। ফ্যাসিবাদের বিকাশে হতাশা একটি বড় উপাদান। সর্বোপরি রয়েছে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতা। জামাতের শক্তি অর্জন আপেক্ষিক, সামাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতার পটোভূমি তাকে এতো বড় করে তুলছে।

'জামাতের সঙ্গে উদার বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু সে দ্বন্দ্ব অনেকটা পারিবারিক কলহের মতো। কেননা উভয়েরই ভিত্তিভূমি এক—পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। কেবল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনই পারে জামাতকে পরাভূত করতে। কেননা সে আন্দোলন সম্পূর্ণ ইহলৌকিক ও গণতান্ত্রিক। ইহলৌকিকতা ও গণতান্ত্রিকতা হচ্ছে জামাতের মূল শত্রু। জামাতকে রুখতে হলে তাই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরো জোরদার করতে হবে—সর্বোতভাবে। অর্থাৎ কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, সমাজ ও সংস্কৃতির সকল এলাকায় বিকল্প দেওয়া চাই। সেটা মূল কাজ। আশু কর্তব্য জামাতকে বিচ্ছিন্ন করা; কেবল জামাতপন্থী নয়, জামাতের সঙ্গে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক পর্যায়ে যারা যোগাযোগ রাখে তাদেরকেও ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করা। রাজনৈতিকভাবে যারা জামাতকে পুনর্বাসিত হতে সাহায্য করছে তাদের কাজকে ঘৃণার যোগ্য বলে চিহ্নিত করা অত্যাবশ্যক।'

শীর্ষস্থানীয় কথাশিল্পী সৈয়দ শামসুল হক জামাত-শিবিরের পুনরুত্থান সম্পর্কে বলেন, 'এরা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের ছাই থেকে ফিনিক্স পাখির মতো প্রাণসঞ্চার করে আজকের বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছে এটা মনে করা উচিত হবে না। যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশেও এরা ছিলো। দক্ষ অভিনেতার মতো রাজনৈতিক মঞ্চের উইংসের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো। এদের পুনর্বাসনের সুযোগ করে দিয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রপিতারা। না, আমি বিশেষ একজনকে দায়ী করছি না।

একটি যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশে যারা সরকারের শীর্ষস্থানীয় নীতি নির্ধারক ছিলেন, যারা সমুদয় রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করতেন, তাদের ভুলের জন্য জামাতীরা এদেশে রাজনীতি করতে পারছে। এদের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। তবে এও সত্য যে, এদের সাম্প্রতিক তৎপরতার জন্য বিরোধী দলের নেতারাও কম দায়ী নন, বিশেষ করে আমরা যাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি মনে করি। আমার মনে আছে যখন ১৫ দল ও ৭ দলের জোট বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন করছে তখন জোটের নেতারা আমাদের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। টি এস সি'র প্রাঙ্গনে এমন এক বৈঠকে শেখ হাসিনা, আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ ফরহাদ—এ'রা সব ছিলেন। আমি তাঁদেব সুনির্দিষ্টভাবে জামাত প্রসঙ্গে তাদের দুর্বলতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তাঁরা আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেননি, পাশ কাটিয়ে নানা ধরণের রাজনৈতিক পরিভাষায় এমন সব কথা বলেছিলেন যা তাঁরা সব সময় বলে থাকেন। বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছরের আন্দোলনের ভেতর ইতিবাচক উপাদান আছে বলে অনেকে মনে করেন। বলেন, আন্দোলনের ফলে তাঁরা লাভবান হয়েছেন। আমি মনে করি এই আন্দেলনের ফলে লাভ যদি কারো হয়ে থাকে সে হচ্ছে জামাত। জামাতীরা তাদের পায়ের নিচে শক্ত মাটি খুঁজে পেয়েছে আর স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির অনৈক্যের ফলে তাদের পায়ের নীচের মাটি মাখনের মতো গলে গেছে, তারা সেখানে পা রাখতে পারছে না, বার বার পা পিছলে যাচ্ছে।'

জামাত শিবিরের সশস্ত্র তৎপরতা প্রতিরোধ কিভাবে করা যেতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে সৈয়দ হক বলেন, 'আমি অসুস্থ হওয়ার আগে দেশের সর্বত্র প্রতিনিয়ত ঘুরেছি। দেখেছি সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি এমনভাবে ধারণ করেছে, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা যেভাবে করেছে—মনে হয়েছে এসব যেন গতকাল ঘটেছে। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের কবর দেখতে গিয়েছি রাজশাহীতে। ছোট সোনা মসজিদের সেই ইমাম যিনি তার জানাজা পড়েছেন, যেভাবে সেই রাতের প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা দিলেন শুনে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছি। মনে আছে এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিলাম। গাড়িতে করে পথে টুপি পরা কয়েকজন তরুণ গাড়ি আটকালো। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলো আমি কে, কোথায় যাচ্ছি। ড্রাইভার জানালো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি। তাঁরা বললো চাঁদা দিতে হবে, ঈদে-মিলাদুন্নবী করবে। ড্রাইভার পকেট থেকে পাঁচ টাকা বের করে দিলো। তারা নিলো না আরো বেশী দাবি করলো। ধমক দিলো। আমি আরো কিছু টাকা দিলাম ওদের। গাড়ি চালাতে চালাতে আপন মনে গজ গজ করছিলো ড্রাইভার—দেশটাকে এরা শেষ করে দেবে। আমি জানতে চাইলাম এরা কারা। ড্রাইভার বললো শিবিরের ছেলে। আমি বললাম— ইসলামের জন্য চাঁদা চাইছে, এতে আপত্তি করার কি আছে। ড্রাইভার জবাব দিলো, এদের কাজে ইসলাম কোথায় দেখলেন? ইসলাম কি বলেছে আমার মতো গরীব ড্রাইভারকে জুলুম করে চাঁদা আদায় করতে? দেশের সর্বত্র এ ধরনের বহু মানুষ আমি দেখেছি যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করছেন। এসব সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করার মূল শক্তি হচ্ছে এই সব মানুষ। আমাদের কাজ হচ্ছে তাদের সংগঠিত করা। এ কাজ শুধু রাজনীতিবিদদের হাতে ছেড়ে দিলে চলবে না। একাজে আমাদের সবাইকে এগিয়ে

আসতে হবে। আমাদের আরো সচেতন হতে হবে অতীতে আমরা যে ভুল করেছি, আমাদের রাষ্ট্রপিতারা যা করেছেন তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। কারণ ভুলগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে আবার একই ভুল করবো যেমনটি আমরা আগে করেছি।'

প্রশাসন নীরব ঃ স্থানীয় বিক্ষোভ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জামাত-শিবির চক্রের সাম্প্রতিক তৎপরতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান সেন্টু বলেন—'১০ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধা জালাল হত্যার পর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আটদল পাঁচদল কম্যুনিস্ট লীগ এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একত্রে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। এই সংগ্রাম কমিটি জালালের লাশ নিয়ে মিছিল বের করলে জামাত-শিবির হামলা চালায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই সংঘর্ষের কারণে ৭টি বিভিন্ন মামলায় সংগ্রাম কমিটির ১০৬ জনের বিরুদ্ধে কোন তদন্ত ছাড়াই চার্জশীট দাখিল করা হয়। ৯ জনকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন মেয়াদে ডিটেনশন দিয়ে দেশের বিভিন্ন কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অথচ জালাল হত্যা মামলার প্রকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশীটই দাখিল করা হয় নি। ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত নয় এমন ৭ জন গুরুত্বহীন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। জালাল হত্যার পর জামাত-শিবির চক্রের নিকট হতে পুলিশ এক ট্রাক অস্ত্র, মদ, নাইট্রিক এসিড, বিষাক্ত তীর ধনুক, বেতের তৈরি ঢাল উদ্ধার করে। এ ঘটনার জন্য ৭১ জনকে গ্রেফতার করা হলেও পরে একজন বাদে সবাইকে ছেড়ে দেয়া হয়।'

জনাব সেন্টু অভিযোগ করেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের—পুলিশ এসপি জিয়া ব্যক্তিগতভাবে কর্নেল ফারুকের বন্ধু এবং মৌলবাদী রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে গণতান্ত্রিক কর্মীদের নামে গণহারে চার্জশীট দাখিল এবং জামাত-শিবিরকে রক্ষা করার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে তিনি ঢাকায় বদলি হয়ে যান।'

জনাব সেন্টু বলেন, 'জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ততা এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জামাত-শিবির চক্র তাদের আগ্রাসন বিস্তার করতে পারছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রায় প্রতিদিন ইসলামী জলসার নামে ধর্মপ্রাণদের জামাত-শিবির রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।' তিনি জানান 'চাঁপাইনবাবগঞ্জের রেহাইচর আবেদীনবাড়ি, রাজারামপুর, পাতুমিয়ার বাড়ী, হরিপুরের মিয়াপাড়াতে জামাত-শিবিরের অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে তাদের গোপন বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতারা যোগদান করেন।' তিনি আরো বলেন, 'জামাত-শিবির চক্র চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় যেমন পৌরসভা, রংধনু ক্লাব থিয়েটার, মিশুক স্টোর, খান ইলেক্ট্রোনিক্স, আওয়ামী লীগের জেলা প্রেসিডেন্টের ওষুধের দোকান, আওয়ামী লীগ অফিসে তারা সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। তাদের পোড়ানো জাতীয় পতাকা থানায় এখনো জমা আছে। এই চক্রটি বর্তমানে নিহত জালালের বাবামার ওপর মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকি প্রদান করছে।'

জনাব সেন্টু বলেন, 'স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জামাত-শিবির চক্রের সঙ্গে একযোগে গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হেনে যাচ্ছে। আমাদের শতাধিক কর্মীর বিরুদ্ধে হুলিয়া ক্রোক গ্রেফতারী পরোয়ানা রয়েছে। এধরনের হয়রানি থেকে রক্ষা পাওয়ার বিকল্প উপায় না দেখে ৮ নভেম্বর আমরা সবাই কোর্টে গিয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

রাজশাহী জেলা সদর জাসদ সম্পাদক মুজিবুল হক বকু জানান—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন পর খোলার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে নি। বহিরাগত শিবিরের গুণ্ডারা সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় সশস্ত্র অবস্থান নিচ্ছে। দেড়শতাধিক শিবিরের গুণ্ডা হুমকি দিচ্ছে—সংগ্রাম পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করার মাত্র তাদের প্রতিহত করা হবে।

'রাজশাহীতে রতন হত্যা মামলার আসামীরা হাতেমখাঁ এলাকায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ২১ আগস্ট তিনজন ছাত্রনেতা নওশাদ, বাদল, আইয়ুবকে গুরুতরভাবে জখম করার পর ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া সত্ত্বেও তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

উপসংহার

১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে একাত্তরের হানাদার বাহিনীর দোসর জামাতসহ অন্যান্য ধর্মব্যবসায়ী দলকে কারাদণ্ড থেকে রেহাই দিয়েছিলো। জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক দল করার অধিকার দিয়েছে। এর পর থেকেই তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে, ছুরি শানানো আরম্ভ করেছে। ১৯৮০ সালে জামাতে ইসলামীরা আনুষ্ঠানিকভাবে দল গঠনের ঘোষণা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এর আগেই গোলাম আযম এসে গিয়েছিলেন পাকিস্তান থেকে। গোলাম আযমকে বহিষ্কার এবং জামাতকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী জানিয়ে ৮১ সালের প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলে। যে কারণে জামাতীরা তখন প্রকাশ্যে কোন জনসভা করতে পারে নি। তখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান ছিলেন লেঃ কর্ণেল (অবঃ) কাজী নূর-উজ্জামান, প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দাবী বিবেচনা করার জন্য তৎকালীন মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) মাজেদুল হকের নেতৃত্বে একটি কমিশনও গঠন করেছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর এই কমিশনের কাজ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আন্দোলন দুই-ই বন্ধ হয়ে যায়।

'৮৩ সালে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, সিপিবি, ন্যাপসহ ২২ দলের শরিকরা জামাতের সঙ্গে অলিখিত মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, তাদের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান করে। এই মর্যাদা কিছুটা অর্জন করার পরই জামাত আন্দোলনরত সংগঠনের কর্মীদের উপর সশস্ত্র

হামলা শুরু করেছে। তাদের এই হামলা থেকে আওয়ামী লীগ, বাকশাল, সিপিবি, কম্যুনিষ্ট লীগ প্রভৃতি দল ও তাদের অঙ্গসংগঠনের কর্মীবৃন্দসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ অধ্যাপক, মাদ্রাসা শিক্ষক, ইসলামী ছাত্রসেনা, জামায়াতে তোলাবায়ে আরাবিয়ার কর্মী কেউই রেহাই পাননি। দেশের সমুদয় মসজিদ, মাদ্রাসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করার এক বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জামাত শিবির চক্র। যারাই বাঁধার কারণ হয়ে সামনে দাঁড়াচ্ছে তাদেরই নির্মূল করে দিচ্ছে।

জামাত শিবিরের হামলার কারণে চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাসের পর মাস বন্ধ থেকেছে, যার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোথাও চরম নৈরাজ্য এবং কোথাও যুদ্ধকালীন অবস্থা বিরাজ করছে। মসজিদে মসজিদে তারা ঘাঁটি স্থাপন করছে। ঢাকার বাইরে প্রধান প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর চারপাশে অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছে। গোটা দেশকে তারা ঠেলে দিচ্ছে চরম বিভীষিকার দিকে, নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের দিকে।

গোটা জাতির জন্য এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে সব কিছু জেনেও সরকার জামাতের তৎপরতা সম্পর্কে ভয়ঙ্কর রকম নির্লিপ্ত। সরকারের নির্লিপ্ততার ফলে প্রশাসনের ভিতর ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা জামাতীদের দোসররা তাদের সবরকম মদদ দিচ্ছে। খুনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে সদম্ভে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তাদের হাতে নিহতদের পরিবার পরিজন প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গত এপ্রিলে সরকারের পক্ষ থেকে তারিখ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিলো বিনা পাসপোর্টে বা ভিসার মেয়াদ অতিক্রম করার পরও যে সব বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে অবস্থান করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমাদের জানা দরকার পাকিস্তানের নাগরিক গোলাম আযম এই আইনের উর্ধ্বে কিনা। তা না হলে এখন পর্যন্ত গোলাম আযম কিভাবে এদেশে বাস করছেন, কিভাবেই বা এদেশের স্বাধীনতার চেতনাকে উপহাস করছেন এবং কিভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারছেন দেশের সংবিধানকে?

জামাত শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থ হলে তার দায় দায়িত্বও তাকে বহন করতে হবে। জামাতীদের পরিকল্পিত গৃহযুদ্ধ প্রতিহত করার জন্য সরকারের ভরসায় বসে থাকলে চলবে না; মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও গণসংগঠনসহ সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

১১ নভেম্বর ১৯৮৮

পরিশিষ্ট—(খ)

জামাত—শিবিরের সাম্প্রতিক নৃশংসতার খতিয়ান

ইসলামের মুখোশধারী জামাত-শিবিরের কুকীর্তির ইতিহাস খুবই ব্যাপক যার শতকরা আশিভাগই অপ্রকাশিত। যার কারণে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে কবর দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার ১৫ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের দেশপ্রেমিক শক্তির উদাসীনতার সুযোগে দেশবাসীর ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল প্রকার স্বৈরাচারী শক্তির মদদপুষ্ট হয়ে নতুন জেনারেশনের তরুণ যুব সমাজের একাংশকে নতুনভাবে সুসংগঠিত করে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় ভাবাবেগের স্রোতে খড়-কুটার ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে তারা অর্থাৎ জামাত-শিবির চক্রটি নতুনভাবে ঘাতক আল বদর-আল-শামস বাহিনী গঠন করে দেশকে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মওদুদী জামাতের অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের দ্বারা সুসংগঠিত ঘাতক আল-বদর বাহিনী যেমন জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ বুদ্ধিজীবীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের সেই তথাকথিত বরকন্দাজ জামাত-শিবির চক্রটি স্বৈরাচারী শক্তির মদদপুষ্ট হয়ে স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে নতুনভাবে সুসংগঠিত হয়ে গত কয়েক বছরে দেশব্যাপী রেকর্ড পরিমাণে হত্যার রাজনীতি উপহার দিয়েছে। জামাত-শিবিরের খুনী চক্রটি দেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপর নৃশংস হামলা পরিচালনা করছে। আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি দা-কুড়াল-কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে মধ্যযুগীয় বর্বর পন্থায় এই চক্রটি ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত গত একদশক ব্যাপী বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। লাঞ্ছিত হয়েছেন অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। নিম্নে এর একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান পেশ করা হল।

১) মওলানা আবদুস সোবহান হত্যা

জামাত নেতা গোলাম আযম পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে আসার অব্যবহিত পর আল-বদর বাহিনীকে নতুন ভাবে সুসংগঠিত করতে গিয়ে গত ১৯৭৮ সনে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার ভিন্নমতাবলম্বী ছাত্রনেতা মওলানা আবদুস সোবহানকে শিবির কর্মীরা কোরআন পাঠরত অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করে।

বিশেষ সূত্রে জানা যায়, এই হত্যা অভিযানের নেতৃত্ব দেয় ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘাতক আল-বদর বাহিনী প্রধান আলী আহসান মুজাহিদী (বর্তমান ঢাকা মহানগরী জামাত প্রধান) এবং ছাত্র শিবিরের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি কামরুজ্জামান মাসুম (আল-বদর বাহিনীর হাই কম্যাণ্ড সদস্য)।

২) তবারক হত্যা

গত ১৯৮০ সনে চট্টগ্রাম সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত এ, জি, এস, তবারক হোসেনকে শিবির নেতা ও কর্মীরা প্রকাশ্য দিবালোকে কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তবারক যখন পানি খেতে চেয়েছিলেন, তখন শিবিরের নরপিশাচরা তার মুখে প্রস্রাব করে দিয়েছিল। এই হত্যা মামলার পয়লা নম্বর আসামী আনোয়ার হোসেন এবং দুই নম্বর আসামী জাহাঙ্গীর কাশেম প্রভাবশালী মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

৩) শাহাদৎ হত্যা

মাধ্যমিক পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডের সম্মিলিত গ্রুপের মেধা তালিকায় ৫ম স্থান অধিকারী চট্টগ্রাম কলেজের কৃতি ছাত্র শাহাদৎ হোসেন নৌ-বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনের ছেলে। প্রথমে সে ছাত্র শিবির করত। ছাত্র শিবিরের হঠকারী রাজনীতির দ্বারা বিরক্ত হয়ে পরবর্তীতে সে শিবির ত্যাগ করে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেয়। এজন্যেই তাকে রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করে হত্যা করা হয় (১৯৮৪ সনের ২৭শে মে)। শিবির আততায়ীর জবানবন্দী অনুযায়ী, এই হত্যাকাণ্ডের পূর্বদিন কামারের দোকান হতে ধারালো কিরিচ অর্ডার দিয়ে তৈরি করে আনা হয়।

৪) আবদুল হালিম হত্যা

১৯৮৪ সনের ১০ই জুলাই চন্দ্রঘোনা তৈয়বিয়া ওদুদিয়া ছুনিয়া মাদ্রাসার মাত্র ১১ বছর বয়স্ক ইসলামী ছাত্রসেনা কর্মী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র আবদুল হালিমকে শিবির কর্মীরা ঘুমন্ত অবস্থায় দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।

৫) আবদুর রশীদ হত্যা

১৯৮৬ সনের ১লা জানুয়ারী চট্টগ্রাম নাজিরহাট কলেজের ছাত্রলীগ নেতা আবদুর রশীদকে কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে হত্যার মাধ্যমে ছাত্রশিবির নববর্ষের উদ্বোধন করে। কলেজের দু'জন অধ্যাপকের ভাষ্য অনুযায়ী, আবদুর রশীদ নিয়মিতভাবে মসজিদে নামাজ আদায় করত এবং ভদ্র প্রকৃতির। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে রশীদকে প্রথমে গুলি করা হয়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে রশীদ পুকুরে লাফ দেয়। চারদিক ঘেরাও করে রশীদকে পুকুর থেকে তুলে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

৬) লিয়াকত হত্যা

চট্টগ্রাম কুয়াইশ বুড়িশ্চর কলেজের ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্র লিয়াকত আলী ছিলেন ইসলামী ছাত্রসেনার একজন বিশিষ্ট নেতা। বিধবা জননীর সন্তান লিয়াকত আলী ইসলামের এমন পাবন্দ ছিলেন যে, তিনি কোনদিন তাঁর দাড়িতে খুর স্পর্শ করেননি। তিনি সবসময় ওজু অবস্থায় থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিতভাবে আদায় করতেন। ১৯৮৬ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে ইসলামী ছাত্রসেনার উদ্যোগে আয়োজিত এক নবাগত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার সময় শিবির কর্মীরা তাঁকে কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

৭) দিদারুল আলম হত্যা

১৯৮৫ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড কলেজের ছাত্রলীগ (মু-না) নেতা দিদারুল আলমকে শিবির কর্মীরা প্রকাশ্য দিবালোকে কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দিদারকে হত্যা করা হয়।

৮) হাটহাজারী মাদ্রাসা হত্যাকাণ্ড

১৯৮৬ সনের মধ্যভাগের এই একই সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এ এফ, রহমান হল থেকে শিবির কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় নিকটস্থ হাটহাজারী মাদ্রাসায় কম্যাণ্ডো হামলা চালিয়ে দু'জন ভিন্নমতাবলম্বী মাদ্রাসা ছাত্রকে হত্যা করে। মাদ্রাসার দু'জন প্রবীণ মোহাদ্দেছকেও তারা লাঠিপেটা করে জখম করে।

৯) মওলানা ফখরুল ইসলাম

১৯৮৬ সনে শিবির কর্মীরা চন্দনপুরা দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা

ফখরুল ইসলামকে বেঁধে পিটিয়ে জখম করে এবং বুকে পিস্তল ধরে পলায়নপর তাদের করে।

১০) রফিকুল ইসলাম হত্যা

চট্টগ্রাম ইসলামী ছাত্রসেনা কর্মী রফিকুলকে শিবির কর্মীরা এ বছর হত্যা করে। (এই হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক হচ্ছে চট্টগ্রামের অসংখ্য ফৌজদারী মামলার আসামী পলিটেকনিকের শিবির সেনাপতি রেজাউল বারী)

১১) আবদুল হামিদ ও জসীম

১৯৮৬ সনের ২৬শে নভেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আবদুল হামিদকে শিবির নেতা আমীর হোসেন এবং তার সহকর্মীরা 'আস্সালামালাইকুম' দিয়ে গুলি করে ধরাশায়ী করে। অতঃপর তাঁর হাতটি ইঁটের উপর রেখে কিরিচ দিয়ে কেটে বিচ্ছিন্ন করে এবং ঐ কাটা হাতটি কিরিচের মাথায় গেঁথে নিয়ে বিজয় মিছিল করে। অতঃপর বহিরাগত অসংখ্য সশস্ত্র লড়াকু কর্মীবাহিনীর দ্বারা ষড়যন্ত্রের এক নীল নকশা অনুযায়ী একযোগে সবগুলো ছাত্রাবাসে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের শতাধিক কর্মীকে হতাহত করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সেদিন এমন এক কারবালা ঘটায়, যার ফলে ২৪ জন ছাত্র গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। আবদুল হামিদ এবং জসীমকে বিশেষ বিমানযোগে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে দীর্ঘ এক বছরাধিককাল যাবৎ চিকিৎসা করা হয়। একটি হাত ও একটি চোখ হারিয়ে চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হয় আবদুল হামিদ। জসীম নামক ছাত্রটিও চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর ছাত্রনেতা আবদুল হামিদকে খুনী, ডাকাত ও লুটেরা হিসাবে চিহ্নিত করে ছাত্র শিবিরের পক্ষ থেকে অসংখ্য লিফলেট, বুকলেট ও বুলেটিন প্রকাশ করে তাঁর হাত কেটে নেয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়। আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে যা কিছুই প্রচার করা হোক না কেন শিবির নেতা-কর্মীদের ন্যায় সে তো কোথাও কোন হত্যা, লুঠ কিংবা ফৌজদারী মামলার কোন আসামী নয়। বিধবা জননীর পুত্র আবদুল হামিদ ব্যক্তিজীবনে সচ্চরিত্রবান, ভদ্র, অমায়িক ও নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন। সে আটপারা কোরআনে হাফেজ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ে অভ্যস্ত। শিবির কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হওয়ার কয়েক মাস আগে রমজান মাসের শেষ দশদিন সে মসজিদে এতেকাফ গ্রহণ করেছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তাঁর জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল যে, রাজনৈতিকভাবে তার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েই শিবির নেতারা এই নৃশংসতার আশ্রয় নেয়।

১২) আমিনুল করিম হত্যা

১৯৮৮ সনের এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে শিবির কর্মীরা নাজিরহাট কলেজে হামলা চালিয়ে ষড়যন্ত্রের এক নীল নকশা অনুযায়ী কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি আমিনুল করিমকে প্রকাশ্য দিবালোকে কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিবির নেতা এই অভিযানে নেতৃত্ব দেয়। নাজিরহাট কলেজের এই নিহত ভিপি আমিনুল করিম সম্পর্কে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল এবং অন্যান্য অধ্যাপকেরা রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকলেই এই মর্মে প্রত্যয়ন করেছেন যে, আমিনুল করিম অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল। তাঁর অমায়িক ব্যবহারের কারণেই সে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভোটে ঐ কলেজের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিল। তাঁর পিতা একজন ভালো আলেম। তিনি মাদ্রাসার মোহাদ্দেছ ও মসজিদের ইমাম। এই হতভাগ্য পিতাই তাঁর নিহত পুত্রের জানাজার নামাজের বিশাল জামাতে ইমামতি করেন।

১৩) শাহাদৎ হত্যা

১৯৮৭ সনের জুলাই মাসে চট্টগ্রামের কাতালগঞ্জের শাহাদৎ নামক একজন ছাত্রলীগ কর্মীকে শিবির কর্মীরা রেলস্টেশন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। ছাত্র শিবির নেতা আনোয়ার

হোসেন এবং পলিটেকনিকের রেজাউল বারী এই অভিযানের নেতৃত্ব দেয়।

১৪) সাজ্জাদ হত্যা

১৯৮৮ সনের জানুয়ারী মাসে শিবির কর্মীরা চট্টগ্রাম নাসিরাবাদস্থ ডেবারপাড় এলাকায় সাজ্জাদ নামক অধুনালুপ্ত জাতীয় ছাত্র সমাজের এই কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৫) জাহাঙ্গীর হত্যা

১৯৮৮ সনের ১৮ই মে পবিত্র ইদুল ফেতরের দিন জমিয়াতুল ফালাহ থেকে ঈদের নামাজ আদায় করে বাসায় ফেরা পথে টাইগারপাস কলোনী এলাকায় সকাল সাড়ে নয়টার সময় শিবির কর্মীদের ছুরিকাঘাতে ছাত্রলীগ (সু-র) নেতা জাহাঙ্গীর আলম নিহত হন।

১৬) জামিল আখতার রতন হত্যা

৩১ মে '৮৮ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ৫ম বর্ষের ছাত্র বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর কলেজ শাখার সভাপতি জামিল আক্তার রতনকে জামাত শিবির পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২-১০ মিনিটে হত্যা করে। চায়নীজ কুড়াল, কিরিচ ও ইট দিয়ে রতনকে মাথায় আঘাত করার পর তার মৃত্যু ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শিবির সন্ত্রাসীরা অপেক্ষা করে। এর আগে ২৯ মে রাতে একজন ইন্টার্নী ডাক্তার গৌতম চৌধুরীকে কুড়াল দিয়ে আঘাত করে।

জামিল হত্যার ব্যাপারে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ একাডেমিক কাউন্সিলের বিবৃতি—'৩১ মে বেলা আনুমানিক ১১ টায় কলেজের সাধারণ ছাত্ররা মিছিল করে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এসে আমাদের কাছে অভিযোগ করে যে—ইসলামী ছাত্র শিবিরের ছত্রছায়ায় একদল বহিরাগত অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রধান ছাত্রাবাসের পশ্চিম উত্তর ব্লকে অবস্থান করছে এবং কলেজে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। তখন আমরা একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দসহ অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য ছাত্রাবাসে যাই। ছাত্রাবাসের দুটি ব্লক দেখে আমরা যখন উপরিউল্লিখিত পশ্চিম উত্তর ব্লকের দিকে যাই তখন কিছু ছাত্রদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হই। যাদেরকে সাধারণ ছাত্ররা ইসলামী ছাত্র শিবির বলে চিহ্নিত করে। এবং তারা দাবী করে যে তাদের প্রত্যেকের পাচঁটি করে গেস্ট আছে এবং কোন মতেই এ ব্লক পরিদর্শন করা যাবে না। আমরা তখন এরপরও সেদিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। ঠিক তখনি তারা বাশি বাজিয়ে নারায়ে তাকবির শ্লোগান সহকারে মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এসে নীচে দণ্ডায়মান সাধারণ ছাত্রদের বিনা উস্কানীতে ধাওয়া করে এবং ঐ অবস্থার মধ্যে জামিল আক্তার রতন নামের ৫ম বর্ষের একজন ছাত্রকে মারাত্মকভাবে আহত করে। জামিল আক্তার রতনকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার পরে তাকে আমরা মৃত অবস্থায় দেখতে পাই। এখানে উল্লেখ থাকে যে আমরা হোস্টেল থেকে আসার সময় ঐসব উৎশৃংখল হামলাকারীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হই। আমাদের গাড়ি ভাংচুর করা হয় এবং গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

১৭) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছুরিকাহত

বিশিষ্ট ছাত্রনেতা জামিল আখতার রতনকে হত্যা করার পর ৭ই জুলাই ৮৮ তারিখে চট্টগ্রামের হেদায়েত-শামছু গং-এর নেতৃত্বে সশস্ত্র শিবির কর্মীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করে। ৯ জুলাই রাত্রি বারোটায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোজাহিদ হোসেন শিবির গুণ্ডা বাহিনীর হাতে ছুরিকাহত হন। উল্লেখ্য যে, এই শিক্ষকের কাছে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য একটি লাইসেন্স পিস্তল ছিল। শিবির কর্মীরা তাকে ছুরিকাহত করে তার ঐ আইন সঙ্গত বৈধ পিস্তলটিও ছিনিয়ে নেয় বলে বিশেষ সূত্রে জানা যায়।

১৮) মুক্তিযোদ্ধা জালাল হত্যা

জামাত-শিবির চক্রের থাবার আরেক শিকার চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ৩৬ বছর বয়সের যুবক আমিরুল ইসলাম জালাল। ১০/৭/৮৮ তারিখে জামাত-শিবিরের ঘাতকেরা মুক্তিযোদ্ধা জালালকে তাঁর বাড়ির বাইরে নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কুড়াল দিয়ে হাত-পা কেটে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান বলেছেন, 'গোটা শহর জামাত-শিবির কর্মীদের হাতে জিম্মি। তারা শহরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।' জামাতে ইসলামীর সাবেক এম, পি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে জামাত-শিবির কর্মীরা জালালকে হত্যা করেছে বলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসকও স্বীকার করেছেন

১০ জুলাই নবাবগঞ্জ কলেজের ছাত্র মিলন আক্তিজকে শিবির কর্মীরা ছুরিকাঘাত করে। এরপর জামাত-শিবির ঐক্যবদ্ধভাবে মিস্ত্রি পাড়া আক্রমণ করে। এখানে একজন ছাত্রনেতা মাসুদকে জামাত-শিবির না পেয়ে মাসুদের ভাবী ডলিকে অত্যাচার করে। এরপর তারা আমিরুল ইসলাম জালালের বাড়ি আক্রমণ করে, প্রথমে জালালের ছোট ভাই দীপুকে (ছাত্রলীগ মু-না নেতা) খোঁজে। না পেয়ে জালালকে ঘরের বাইরে টেনে নামিয়ে দা-কুড়াল, কিরিচ, বল্লম যাবতীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জালালকে হত্যা করে। জালালকে রক্ষা করার জন্য তার মা ও বোনেরা এগিয়ে এলে তারাও জামাত-শিবির কর্তৃক নির্যাতিত হন।

১১ই জুলাই মুক্তিযোদ্ধা জালালের লাশ নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জে যে শোক মিছিল বের হয় তার উপরও জামাত-শিবিরের কর্মীরা হামলা চালিয়ে লাশ ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া এই দিনে তারা তাদের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে অর্ধ শতাধিক লোককে আহত করে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ রাজশাহী ইউনিট কম্যাণ্ডের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জামাত শিবির চক্র চট্টগ্রাম হতে পেশাদার খুনী ও সশস্ত্র ক্যাডার নিয়ে রাজশাহী, রংপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের অপারেশনগুলো চালিয়েছে। এই ক্যাডারদের নেতৃত্বে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের নায়ক হেদায়েত। একটি নীল রং-এর মাইক্রোবাস নিয়ে তারা চট্টগ্রাম হতে অপারেশনস্থলে যায়।

চট্টগ্রামের খুনী হেদায়েত বাহিনী এর আগে জামাতের মজলিশে শুরার নির্দেশে রংপুরের ছাত্রনেতা সবুরের হাত কেটে দেয় এবং নারায়ণগঞ্জে স্বাধীনতার স্বপক্ষশক্তির মিছিলে হামলা চালায় বলেও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা জালাল হত্যার প্রতিবাদে ১১ই জুলাই রাতে রংপুরে মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মিছিল বের করলে সেই মিছিলের উপরও শিবির বাহিনী আক্রমণ করে। এদের অস্ত্রের আঘাতে জাসদ ছাত্রলীগের একজন নেতা গুরুতর ভাবে আহত হয়। শিবির কর্মীরা তাঁর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। ১২ই জুলাই রংপুর শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার ফলে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

ইতিপূর্বে শিবিরের ঘাতক আল-বদর বাহিনী কর্তৃক ২৬শে নভেম্বর '৮৬ অপারেশনের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়টি উপর্যুপরি কয়েক দফা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং শিবির সন্ত্রাসের প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতির কর্তৃক তিনমাসব্যাপী লাগাতার কর্মবিরতির কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়টি সুদীর্ঘ ৮ মাস যাবৎ বন্ধ এবং অচল হয়ে থাকে। শিবিরের হটকারী রাজনীতির ফলে সেখানকার হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হয় বিপন্ন।

এ বছরের জুলাই মাসের শেষের দিকে শিবিরের সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী যার মধ্যে চট্টগ্রামের হেদায়েত-শামছু বাহিনী এবং রাজশাহীর স্থানীয় শ্রমিক ও কসাই শ্রেণীর ভাড়াটিয়া গুণ্ডা বাহিনীর সমন্বয়ে শিবির নেতা কর্মীরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সেই ঘাতক আল-বদর, আল-শামস ও রাজাকার বাহিনীর সমন্বিত ষ্টাইলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়টিও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়ে সেখানকার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। এইভাবে জামাত-শিবির চক্রের দ্বারা সৃষ্ট ঘাতক আল-বদর বাহিনীর পুনরুত্থানের ফলে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেই শিক্ষার পরিবেশ আজ বিপর্যস্ত।

সিলেটে জামাতের সন্ত্রাসে তিনজন নিহত

গত ২৪ সেপ্টেম্বর '৮৮ সিলেটে জামাত-শিবিরের প্রত্যক্ষ আক্রমণে মুনির ও তপন নিহত হয়। অপর একজন জুয়েল জামাত-শিবিরের এলোপাথাড়ি আক্রমণের ভয়ে একটি তিনতলা ভবনের ছাদে আশ্রয় নেয়। জামাত-শিবিরের কর্মীরা সেদিকে ধাওয়া শুরু করলে জুয়েল পাশের ছাদে যাওয়ার জন্য লাফ দেয় এবং পা ফসকে পড়ে নিহত হয়। এরা সবাই ছাত্রলীগের (মু-নার) নেতা ও কর্মী।

রেজাউল করিম নতুন হত্যা

কুড়িগ্রামের স্কুল ছাত্র রেজাউল করিম নতুনকে জামাত-শিবিরের মিছিল থেকে আক্রমণ করে। রেজাউল করিম ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী। রেজাউল করিমকে হত্যার সাধারণ কারণ হিসেবে দেখা যায় তার মামা এমদাদুল হক জাসদের নেতা।

ইউসুফ হত্যা

কমিউনিস্ট সংগঠক ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশন নেতা ইউসুফকে জামাত শিবির হত্যা করে ৯ জানুয়ারী ১৯৮৭। রেলওয়ে মিলনায়তনে গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশনের সময় ইউসুফকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে মিলনায়তন সংলগ্ন মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে মাইক বাজানোর অজুহাতে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য তখন কোন মাইক বাজেনি। এদিনের কাউন্সিলে বিরোধী দলের নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসন নিষ্ক্রিয়

গত ১০ই জুলাই ৮৮ তারিখে ঢাকায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জামিল আখতার রতন হত্যার সাথে যুক্ত খাতকদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করে। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষও ইতিপূর্বে এই দুষ্কৃতকারী খাতকদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেছে। রাজশাহী পুলিশ প্রশাসনের কাছে এটা অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এই শিবির-খাতকদেরকে আজও গ্রেফতার করা হয়নি। সরকারী প্রশাসনের এই শিবিরপ্রীতির কারণে জামাত-শিবির চক্রটি একের পর এক তাদের অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে।

জামাত-শিবিরের এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তি যখন সোচ্চার, নরঘাতক আল-বদর, আল-শামস বাহিনীর বিরুদ্ধে যখন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠছে সব মহল থেকে, তখন দেখা যাচ্ছে প্রশাসন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ভূমিকাই পালন করছেন না, বরং প্রশাসনের একটি অংশের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় জামাত-শিবির চক্রটি জনতার উপর চড়াও হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ—'মুক্তিযোদ্ধা জলাল হত্যার প্রতিবাদে ১২ই জুলাই '৮৮ তারিখে রাজশাহীতে গায়েবানা জানাজা ও শোক মিছিল বের হয়। মিছিলের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং মিছিলে নেতৃত্বদানকারী রাকিবুর সাবেক ভি,পি, ফজলে হোসেন বাদশাসহ ও জনকে গ্রেফতার করে।' (সাপ্তাহিক একতা, ১৫-৭-৮৮)

বাংলাদেশে '৭১-এর পরাজিত শত্রুদের সুরক্ষিত ক্যান্টনমেন্ট হিসাবে পরিচিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ছাত্রনেতা হামিদের হাত কেটে নেয়ার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভা কর্তৃক যে দশ জন শিবির নেতাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কারাদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা আজ প্রভাবশালী মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় বহাল তবিয়তে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করে মিছিল মিটিং ও নাশকতা তৎপরতায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। পক্ষান্তরে, শিবির কর্মীরা যে আবদুল হামিদের হাত কেটে ও ছাত্র তুলে নিয়ে স্থিরজীবনের জন্য পঙ্গু করে দিয়েছিল সেই পঙ্গু আবদুল হামিদের বাড়িতে চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের নির্দেশে পুলিশী হামলা চালিয়ে জামাত-শিবির প্রীতির এক অভূতপূর্ব নজীর সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রশাসনের উদাসীনতার এবং কোথাও সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে জামাত-শিবির চক্রের ন্যায় একটি ফ্যাসিবাদী সংগঠনের নৃশংস কর্মকাণ্ড যেভাবে বাড়ছে তাতে যে কারো এটা মনে হতে পারে যে তারা আরেকটি একাত্তর ঘটাবার সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে আরেক কারবালা ঘটানোর। আমাদের প্রশ্ন কতদিন আর স্বাধীনতা বিরোধী এই ফ্যাসীবাদী শক্তির হাতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এভাবে জিম্মি অবস্থায় থাকবে?

মওলানা শামছুদ্দিন আহমেদ ফরিদপুরী

বিচিত্রা ১১ নভেম্বর ১৯৮৮